মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ
২০৩/৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বাঙলার উনবিংশ শতকের সমৃদ্ধিশালী মনীষীদের
সমারোহপূর্ণ জীবনযাত্রার বিশিষ্ট গুণরাজি
বর্তমান যুগের
যে সুপ্রতিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ সুধীর
শিল্প সংস্কৃতি ও কর্মসাধনার পথে
অবিকল প্রতিফলিত দেখে
গৌরব বোধ করে থাকি
সেই স্বনামধন্য কর্মযোগী ও কলাবিদ্যানুরাগী
শ্রীবলাই চন্দ্র বিশ্বাসের
করকমলে
এই নবতম গ্রন্থখানি
লেখকের ৭১তম জন্ম-পর্বের প্রথম বাসরে
আশীর্বাদ স্বরূপ
সমর্পিত হল

৪২, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিঃ
২৬শে শ্রাবণ : ১৩৬৩

গুণমুগ্ধ
গ্রন্থকার

★

বইখানির শেষাংশে নায়িকা দেবীর দীর্ঘ চিঠিখানাকেই প্রাধান্য দিয়ে সমাপ্তির পথে দাঁড়ি টানা হয়েছে। এ থেকেই উপলব্ধি হয় যে, দেবীর জীবনের সঙ্গে আত্মবুদ্ধির যোগ সম্ভব হওয়াতেই সে তার অন্তর্দেবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে অকুতোভয়ে চলার পথে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু তার সেই যাত্রাপথ যথার্থই কুসুমাস্তৃত হয়েছিল কি না, এবং রাণী ও অরুণা 'আধুনিকা'র সংজ্ঞা কি ভাবে গ্রহণ করেছিল, এ প্রশ্ন উত্থাপিত করা অনেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। তবে, লেখক এখানে নায়িকার মাধ্যমে আধুনিকার সংজ্ঞা ও কর্তব্য নির্ণয় করেই খালাস। তথাপি, চলার পথে দুঃখ বিপত্তিও যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে নানা আকারে এবং অতর্কিতে সুযোগ বুঝে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়াও আশ্চর্য নহে। এই অবস্থাই দুঃসাহসিকা যাত্রীর জীবনে আনে অগ্নি পরীক্ষা। তেমন কিছু ঘটাও হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু তার আখ্যায়িকা স্বতন্ত্র।

গ্রামের নাম হরগৌরীপুর। প্রাচীন কাল থেকেই এর প্রতিষ্ঠা।

গ্রামের এক প্রান্তে খরস্রোতা সরস্বতীর তীর ঘেঁসে 'হরগৌরী' শিবের মন্দির—দীর্ঘ শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠে হরগৌরীর মূর্তি উৎকীর্ণ এবং এইটিই এ-মন্দিরের বৈচিত্র্য। হরগৌরীর নামেই যে পুরাকালে গ্রামখানি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিস্তীর্ণ গ্রামখানির মধ্যে বিভিন্ন পল্লীসংস্থান এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য দেখে মনে হয়, সহর অঞ্চলে আদর্শ গ্রাম সম্বন্ধে যে-সব গালভরা কথা শোনা যায়, হরগৌরীপুর গ্রামখানি নানা দিক দিয়ে সেই আদর্শতার দাবী রাখে।

কেন এবং কি সূত্রে?…এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রাম্য পরিবেশ সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনার পরিবর্তে আলোচ্য কাহিনীটিই আরম্ভ করছি; এ থেকেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে। বিশেষতঃ এ-কাহিনীর সূচনা যখন এই গ্রামের মন্দির থেকেই।

চৈত্র মাসের শেষাশেষি। চড়কোৎসব উপলক্ষে শিবের গাজন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এ-অঞ্চলের যেখানে যত গাজুনে দল আছে, হরগৌরী-মন্দির-তলায় এসে তারা নাচের তালে তালে 'হরগৌরীর পায়ে শিব' লাগাবেই—নচেৎ তাদের সন্ন্যাসব্রত সিদ্ধিই হবে না। নীলের উৎসব ও চড়ক পূজার দিন মন্দিরের সামনে বাঁধা বাঁশের মঞ্চ থেকে এরা হরগৌরীর নাম নিয়ে ঝাঁপ খাবে, নাচের নানারূপ কসরৎ দেখাবে, নাচের পর প্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে ভক্তি নিবেদন করবে; অবশেষে—'হরগৌরীর পায়ে শিব লাগে—মহাদেব!'—এই যুক্ত ধ্বনি তুলে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। এই উপলক্ষে মন্দিরতলায় রীতিমত মেলা বসে, বাহিরের লোকজন তো আসেই, পাড়ার ভদ্রঘরের মেয়েরাও বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সারা দিন উপবাসের পর সন্ধ্যার সময় নীলের পূজা দিতে সমবেত হন। পূজার পর তবে তাঁরা জলগ্রহণ করেন।

সরস্বতী নদীর উপকূলে পোস্তা বেঁধে মন্দির-সংলগ্ন আস্তানাটিকে দৃঢ় করা হয়েছে। সেকেলে কাজ, পোস্তা থেকে একখানি পাথরও সরেনি। কত দিন আগে যে পোস্তা বেঁধে তার পর মন্দির তোলা হয়েছে, সে কথা গ্রামের সব চেয়ে বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি সত্য ঘোষালও বলতে পারবেন না। নদীর কিনারাতেই মন্দির থেকে একটু তফাতে—মহাশ্মশান। তার পরই একটা বিশাল বনভূমি—এখান থেকে সুরু হয়ে ক্রোশ দুই তফাতে এই নদীরই একটা বাঁকের কাছে, আর একটা জঙ্গলের সঙ্গে মিশেছে। সরস্বতীর জাঙ্গাল নামে জঙ্গলটি পরিচিত।

সে দিন নীলের উৎসব। মন্দির-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে মেলা বসে গেছে। বালক-বালিকা ও নিম্নশ্রেণীর নারীদের ভীড়ই বেশী। পল্লীর ভদ্রঘরের মেয়েরাও সারা দিন উপবাসী থেকে সায়াহ্নে মন্দিরে পূজা দিতে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গেও বেশীর ভাগ বালিকাদের ভীড়, বালকও আছে—তবে সংখ্যায় কম। পুরোহিত মন্দিরমধ্যে পূজায় বসেছেন। পূজার্থিনীরা স্ব স্ব উপচারাদি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে সামনের চাতালে এসে গল্প-গুজব করছেন। নীচের প্রাঙ্গণে গাজনের সন্ন্যাসীরা সমবেত হচ্ছে।

পূজা শেষ হতেই নীচের প্রাঙ্গণে নাচের উৎসব জেঁকে ওঠে। সন্ন্যাসীদের ভিতর থেকেই শিব, নন্দী, ভৃঙ্গি, ভূত, প্রেত সেজে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দেয়। চাতালের এক পার্শ্বে নিম্নশ্রেণীর সধবাগণ ধূনা পোড়াতে বসে যায় সারি সারি। তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর লতা-পাতা দিয়ে পাকানো বিড়ার উপরে এক-একটি আগুনের মালসা বসানো। পুরোহিত ঘুরে-ফিরে প্রত্যেক মালসার উপর চূর্ণ ধূনা নিক্ষেপ করছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিখা বিস্তার করে আগুন জলে উঠছে।

এমন সময় মন্দিরের দিকে একটা নূতন রকমের ঘটনা সকলকে উল্লসিত করল। ভদ্রপল্লীর কিশোরী মেয়েরা এই আনন্দের দিন পল্লীর দুটি শিশুকে নিভৃতে এতক্ষণ ধরে নিপুণ ভাবে হরগৌরী সাজাচ্ছিল—শিশু হরগৌরী! সজ্জা শেষ হতেই তারা চাতালে দণ্ডায়মানা মহিলাদের উদ্দেশ করে বলল:

জনৈকা কিশোরী: গাজনে সন্ন্যাসীদের রঙ্গভঙ্গ এতক্ষণ তো দেখলেন—এখন দেখুন সাক্ষাৎ হরগৌরী।

মেয়েটির কথায় মহিলারা সচকিত হয়ে দেখলেন—একটি উঁচু চৌতারার উপর সুসজ্জিত "শিশু-হরগৌরী" পাশাপাশি দণ্ডায়মান।...চার বছরের একটি প্রিয়দর্শন ছেলেকে শিব এবং ছ' বছরের এক সুন্দরী মেয়েকে গৌরী সাজানো হয়েছে।

চাতালে উপস্থিত মহিলারা বিভিন্ন কণ্ঠে সোল্লাসে বলে উঠলেন :

মহিলাগণ : বা ! বা !

বাহিরের প্রাঙ্গণ থেকে কতিপয় ছেলে ক্ল্যাপ দিয়ে বলল :

ছেলেরা : হরগৌরীকি জয় !

সন্ন্যাসীরা : হরগৌরীর পায়ে শিব লাগে—মহাদেব !

পুরোহিত : তোমরা বুঝি ওখানে বসে এই কাণ্ড করছিলে ?

যে কয়টি কিশোরী এ কাজে ব্যাপৃতা ছিল, তাদের ভিতর থেকে এক জন বলে উঠল :

জনৈকা কিশোরী : ভালো করিনি ভট্টচাজ মশাই ?

জনৈকা মহিলা : দিব্যি মানিয়েছে—যেন সাক্ষাৎ হরগৌরী।

এই সময় অনুপমা নামে প্রৌঢ়বয়স্কা এক মহিলা ভীড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে গণ্ডে হাত দিয়ে বলে উঠলেন :

অনুপমা : অ-মা, এ কি রে ! ছেলেটাকে করেছিস্ কি ?

জনৈকা তরুণী : আপনারই ছেলে—অনুপমা পিসি।

অনুপমা : তাই ত দেখছি ! এই বয়সে আমার ললিতকে শিব সাজিয়ে দিলি তোরা ?

আর এক তরুণী অন্য দিক দিয়ে অনুপমা দেবীর সমবয়স্কা ও প্রতিবেশিনী এক প্রৌঢ়া মহিলাকে নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন :

২য়া তরুণী : আপনার দেবীকে খুঁজছিলেন সুলোচনা কাকী—দেবী হারায়নি, ঐ দেখুন শিবের পাশে—কে !

সুলোচনা : অ্যা—করেছিস্ কি তোরা ! অমা—সই রে ! দেখছ কাণ্ড ?

অনুপমা : দেখছি। আমার ললিত হয়েছে হর, আর তোমার দেবীকে করেছে গৌরী।

পুরোহিত : এটা সুলক্ষণ। নীলের দিনে গাজনের বাজনার মধ্যে হর-গৌরী মিলন হয়ে গেল।

বাহিরে তখঁন বহুকণ্ঠে কোলাহল উঠেছে—

—আমরা হরগৌরী দেখব।

—আমাদের দেখান ঠাকুর!

মেয়েদের ভীড় দু'পাশে সরে গেল। চৌতারার উপর পাশাপাশি দণ্ডায়মান শিশু হরগৌরীকে বাহিরের লোকজনেরা দেখল। তারা সমস্বরে বলে উঠল :

—হরগৌরী কী জয়!

চারদিক থেকে বাজনা বেজে উঠল। সন্ন্যাসীরা সমস্বরে নৃত্যের তালে তালে মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল :

সন্ন্যাসিগণ : হরগৌরীর পায়ে শিব লাগে—মহাদেব!

২

প্রতি বছরই চৈত্রের শেষে এই ভাবে নীলের উৎসব হয়। উৎসবে মেলা বসে, বহু জনসমাগম হয় এবং মায়েরাও সন্তানের মঙ্গল কামনায় উপবাসী থেকে হরগৌরীর পূজা দিয়ে পুরোহিতের আশীর্বাদ ও দেবতার প্রসাদ নিয়ে যান। কিন্তু এ-বছর পূজার পর দুটি বিশিষ্ট পরিবারের শিশু সন্তানকে হরগৌরী সাজিয়ে চাঞ্চল্য তোলার দৃশ্যটি উভয় শিশুর মায়েদের মনে এমন একটি দাগ দেয় যে, এর পর প্রতি বছরই উৎসবের সময় সেটা যেন নূতন করে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে। ফলে, মায়েদের মনের মধ্যে এই সূত্রে একটা আগ্রহও উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে যে, এরা দুটিতে বড় হ'লে এমনি করেই ওদের মিলন দেখে সেদিনের খেলাটি সার্থক ও বাস্তব করবেন।

কিন্তু মুখে ব্যক্ত না করলেও সে পরিকল্পনাটি যে তাঁদের মনের গহনে তলিয়ে যায়নি, দীর্ঘ চার বছর পরে একদা সেই দুটি বালক-বালিকার

খেলাঘরের খেলার বিচিত্র পরিকল্পনা-সম্পর্কে দুই কর্তার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য আর একথার অনুপমা ও সুলোচনা দেবীকে সচকিত ও উল্লসিত করায়— সহজেই সেটি উপলব্ধি হয়। তখন, চার বছর আগে হরগৌরী মন্দিরের সেই মিলনের দৃশ্যটি স্ব স্ব গৃহিণীর মুখে শুনে উভয় কর্তা—পশুপতি হালদার ও মঙ্গলাপদ সমদ্দার রীতিমত খুশীই হলেন।

সেই কথাই এখন বলছি।

গ্রামের মধ্যে প্রথমেই ব্রাহ্মণপাড়ায় পাশাপাশি কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত পরিবারের বসবাস। পল্লীগ্রামের বাড়ী—বসতবাড়ীর সঙ্গে খোলা জমি, বাগান, বাড়ীর মধ্যে উঠান, ধানের মরাই, ঢেঁকিশালা। বাহিরে রাস্তার গায়ে সাজানো চণ্ডীমণ্ডপ, পিছনে একটা বড়-সড় পুষ্করিণী। সাবেক কর্তাদের আমলের ব্যবস্থা—কাজকর্মে সবাই ব্যবহার করবেন, মেরামতের সময়ও সকলে মিলে-মিশে সাহায্য করবেন। সকালের দিকে ছেলেমেয়েদের পাঠশালা বসে এই চণ্ডীমণ্ডপে। সন্ধ্যার দিকে পাড়ার গৃহস্বামীরা সমবেত হয়ে গল্প-গুজব করেন, কখনো বা তাস-পাশা দাবা-বোড়ে নিয়ে আড্ডা জমান।

চার বছর আগে নীলের উৎসবের দিন যে শিশু দুটিকে হরগৌরী সাজিয়ে আনন্দ উপভোগের একটা নবতম উপাদান রচনা করা হয়েছিল, এখন তারা বালক-বালিকা। ললিত আট বছরে পড়েছে, দেবীর বয়সও পাঁচ উত্তীর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু এই বয়সেই খেলাঘর পেতে খেলা-ধূলার ভিতর দিয়ে ঘর-গৃহস্থালী ও পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা, দরদ ও মান-অভিমান নিয়ে যে সব কথাবার্তা বলে বা কাজকর্ম করে, সমবয়সীরা তাতে যেমন উল্লসিত হয়, অভিভাবকরাও তেমনি বিস্মিত হয়ে আলোচনা করেন—এই বয়সে এমন পাকা কথা আর সংসারের কাজকর্ম এরা শিখল কোথা থেকে!

হরগৌরী-মন্দিরে সেই ঘটনার প্রায় চার বছর পরে একদিন বিকালের দিকে দেখা গেল, বছর আটেকের একটি হৃষ্টপুষ্ট প্রিয়দর্শন ছেলে হরগৌরীর মন্দির থেকে কতকগুলি ফুল-বেলপাতা নিয়ে গ্রামের সোজা ও পরিচিত পথগুলির উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

এই ছেলেটিকেই বছর চারেক আগে হরগৌরী-মন্দিরে শিব সাজানো হয়েছিল। ছেলেটির গায়ে একটা হাতকাটা জামা, পরনে একটু চওড়া-পাড় ধুতি, খালি পা—জুতা নেই। নাম ললিত।

ছেলেটি রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। চারদিকে পাঁচীল দেওয়া একতালা বাড়ী। রাস্তা থেকে নেমে পাঁচীলের পাশ দিয়ে সরু পথ ধরে একটু গেলেই খিড়কীর দরজা। সেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ডাকল: দেবী—দেবী—

বাড়ীর ভিতর থেকে দেবীর মা সুলোচনা দেবী চেঁচিয়ে বললেন: কে—ললিত বুঝি? দেবী তো নেই বাড়ীতে—খেলতে গেছে।

'ও!' বলেই ছেলেটি আবার ফিরল; আগের পথ ধরে সামনের বাঁকটা ঘুরে সেই ভাবে ছুটতে লাগল। এই বাড়ীর মালিক বগলাপদ সমদ্দার। চালানী কাজের ব্যাপার করেন। সুলোচনা দেবী এঁরই স্ত্রী এবং দুই কন্যা দেবী ও রাণী। দেবীকেই সেবার মন্দিরে গৌরীর সাজে দেখা গিয়েছিল, তখন তার বয়স ছিল দেড় কি দুই। রাণী তার কোলের বোন, দেবীর চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। এই বাঁকটার পরেই সেই সাজার জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপ। তার আশে-পাশে অনেকখানি খোলা জমি, স্থানে স্থানে ফুলগাছ, খড়ের গাদা—মরাইয়ের মত বাঁধা। এই জমিতেই পল্লীর ছেলেমেয়েদের খেলা-ধুলা চলে। চণ্ডীমণ্ডপ থেকে কিছু কিছু দেখা যায়।

চণ্ডীমণ্ডপে মাদুর বিছিয়ে তখন গল্প করছিলেন বগলাপদ এবং পশুপতি। উভয়েই সমবয়স্ক—এক এক পরিবারের কর্তা। উভয়েরই বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বগলাপদর মুখ ক্ষৌরিত, বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ, প্রকৃতি একটু গম্ভীর। পশুপতি অপেক্ষাকৃত স্থূলাকৃতি, দোহারা চেহারা, সেজন্য নাকের নীচে পরিপুষ্ট গোঁফ-জোড়াটি মুখের গাম্ভীর্যটুকু আরও পরিস্ফুট করেছে এবং মাথার উপর বিঘতপ্রমাণ স্থূল টিকিটিও দিব্য মানিয়েছে। বগলাপদর গায়ে একটা গেঞ্জি। পশুপতির ও বালাই নেই, আধা-ভিজা একখানা গামছা তাঁর কাঁধে, গল্প করতে করতে মধ্যে মধ্যে গামছা দিয়ে মুখ-চোখ মুছছিলেন।

একই হুঁকায় উভয়ের তাম্রকূট সেবন চলেছে। এ থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে

যে, তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ; এবং বর্ণগত কোন পার্থক্য নেই। বগলার পদবী সমদ্দার ও পশুপতি হালদার হলেও উভয়েই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব— এঁদের পূর্ব-উপাধি যাই থাক, পুরুষানুক্রমে পুরাকাল হতে নবাব-দত্ত উপাধি ব্যবহার করে আসছেন।

পশুপতি সোৎসাহে হুঁকায় জোরে একটি টান দিয়ে, হুঁকার মুখটি নিজের হাতে মুছে বগলার হাতে দিতে দিতে বললেন : সেই একটা কথা আছে না—কারো পোষ মাস, কারো বা সর্বনাশ—এই লড়াইটাও তাই। এর দাপটে কেউ করছে—হায় হায়! কেউ বা খোসমেজাজে বলছে—দিন এলো···বাঁচলাম।

হুঁকায় টান দিয়ে তাম্রকূটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বগলাপদ বললেন : ঠিক কথাই বলেছ! এই দেখ না, কলকাতায় যাদের ফার্মে তিসি-তারা চালান দিয়ে কোন রকমে দিন গুজরাণ করছিলাম, মাঝে তো সে-সব চালান বন্ধ হবার জো হয়েছিল। কিন্তু লড়াই বাঁধতেই মোড় ঘুরতে থাকে; তারপর দেখ না, এই দুটো বছরেই কি কাণ্ড—চালান তিন গুণ বেড়ে গেছে।

পশুপতি : তাই তো বলছিলুম, তোমারও পোষ মাস হে বগলা ভায়া!

কথার সঙ্গে জোরে হেসে উঠলেন পশুপতি। তাঁর বালক পুত্র ললিত ঠিক এই চণ্ডীমণ্ডপের পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে খেলাঘরের দিকে যাচ্ছিল; হাসির শব্দে চমকে উঠে একবার তাকাল, তারপর আরও দ্রুত চলে গেল।

বগলাপদ ললিতকে লক্ষ্য করে বললেন : এবার খেলাঘরের কর্তা এলেন। ওর জন্য দেবীর কি ব্যগ্রতা—

পশুপতি : তাই ত! খেলাঘর থেকে এখানেই খবর নিতে এলো কত বার—ললিতদা কোথায়?

বগলাপদ : ওদের এই ছেলেখেলা আমার ভারি মিষ্টি লাগে—তাই এখানে বসে গল্প করতে করতে ওদিকেও নজর রাখি। ওই দেখ কাণ্ড—

আগেই বলা হয়েছে, গ্রামের এ-দিকটায় পাশাপাশি, বা কাছাকাছি তিনটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারের বসতি এবং এই অঞ্চলটি ব্রাহ্মণ-পল্লীর অন্তর্ভুক্ত। বাঁকটির মুখেই বগলা সমদ্দারের বসতবাড়ী; তার পরেই চণ্ডীমণ্ডপের নিকট

পঞ্চপতি, ও তার পিছনে সত্য ঘোষালের বাসভবন। পল্লী অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের ঘরবাড়ী যেমন হয়, তেমনি সাদামাটা ইটের একতলা ঘর কয়েকখানি; আর মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরগুলির উপর গোলপাতা বা উলুর ছাউনি। ভাঁড়ার, রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়ার কাজ এখানে চলে। উঠানে ধানের মরাই, ঢেঁকিশালা প্রভৃতি, লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থ-পরিবারের পরিচিতি বহন করে। বাড়ীর পিছনে গোশালা, তার পর খোলা জমি—বেড়া দিয়ে সীমানা বন্দোবস্ত করা। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার অভাবে প্রতিবাসীর উপর টেক্কা দিয়ে নিজের ঘরবাড়ীর অকারণ বাহ্যিক সৌষ্ঠব বাড়াবার আগ্রহ নেই কোন পক্ষের।

ললিত চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে এগিয়ে খোলা মাঠে পড়েই তার চলনের গতি হ্রাস করল। সে এখন অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দেবীর খেলাঘর লক্ষ্য করে চলতে লাগল নিঃশব্দে। উদ্দেশ্য, হঠাৎ গিয়ে দেবীকে চমকে দেবে। কিন্তু এ-পাশে কতকগুলো বাহারী ক্রোটন গাছের আড়ালে সত্য ঘোষালের ভাগিনেয়ী রাধা দাঁড়িয়েছিল। এ দিকটা তারই এলাকা—নিকটেই তার খেলাঘর। এই মেয়েটিও সাগ্রহে ললিত ছেলেটির প্রতীক্ষা করছিল, কাছ দিয়ে তাকে যেতে দেখেই তাড়াতাড়ি গাছের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে পিছন থেকে খপ্ করে তার কাপড় চেপে ধরে বলল: ওদিকে নয়—এদিকে। এসো।

এ ভাবে হঠাৎ বাধা পেয়ে চমকে উঠে ললিত বলল: বা-রে! আমি যে দেবীর খেলাঘরে যাচ্ছি—তার সঙ্গেই খেলব।

কচি মুখের একটা মিষ্টি ভঙ্গি করে রাধা বলল: রোজই তো তুমি দেবীর সঙ্গে খেল ললিত দা, একদিন না হয় আমাকে নিয়েই খেললে! এসো—

বিপন্নের মত মুখভঙ্গি করে ললিত বলল: সে ভাই আর একদিন হবে—আজ নয়। দেখছ না—দেবীর খোকার অসুখ করেছে, আমি ঠাকুরের পেরসাদী ফুল আনতে গিয়েছিলুম। দেবী কত ভাবছে—আমি যাই।

কিন্তু রাধা তার কাছার দিকের কাপড়টা এমন শক্ত করে ধরে ছিল যে, ললিতের সাধ্যই ছিল না—সেটা ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। তখন সে মিনতির

ভঙ্গিতে বলল : লক্ষ্মী ভাই রাধা, আমাকে ছেড়ে দে বড্ডো দেরী হয়ে গেছে ফুল আনতে—দেবী ভারি রাগ করবে'খন।

রাধাও কঠিন হয়ে এবং কাপড়টা আরো শক্ত করে টেনে বলল : ও রাগ করল তো বড় বয়ে গেল—তুমি এসো ত ! আমি তাকে বলবো 'খন।

অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছেলে এই ললিত। এই বয়সেই অদ্ভুত ভাবপ্রবণ ! কারও মনে ব্যথা দেওয়া বা কারও সঙ্গে কলহ করা তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মুখখানা ম্লান করে, ছল ছল চোখ দুটি তুলে সে নীরবেই রাধার পানে তাকাল, কিন্তু তথাপি রাধার করুণা হলো না—বিজয়িনীর মত জয়োল্লাসে সে ললিতকে টেনে নিয়ে হাজির হলো তার খেলাঘরে। সেখানে তার পাতা সংসারটি দেখিয়ে বলল : দেখ দেখি—কেমন সাজিয়েছি ঘরখানি, দেবীর চেয়ে ভালো নয় ? ব'স তুমি।···ললিতকে বসতে হয়, কিন্তু তার চোখের উপর তখন ভাসতে থাকে—বিপন্না দেবীর ঘরখানা ! খোকার অসুখ, দেবীর কি ভাবনা ! তাই ত সে গিয়েছিল ঠাকুরের ফুল আনতে ! কিন্তু দেবী কি ভাবছে ?

সত্যই দেবী তখন তার খেলাঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। কি রকম বে-আক্কেলে কর্তা বল ত ! খোকার অসুখ—সে একলাটি তাকে নিয়ে পড়ে আছে, আর কর্তার দেখাই নেই ! আসুক একবার !···একখানা আস্ত ইটের উপর বসে গালে হাত দিয়ে দেবী ভাবতে থাকে।

এমনি সময় দেবীর ছোট বোন রাণী এসে বলল : অ-মা, গালে হাত দিয়ে বসে আছিস যে বড়—রান্না-বান্না কখন করবি দিদিভাই ?

দেবী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল : দেখ না ভাই কর্তার কাণ্ড, খোকা জ্বরে বেহুঁস হয়ে রয়েছে, ওষুধ আনতে গেছেন তিনি—এখনো ফেরবার নাম নেই। কাছে কেউ না বসলে উঠি কি করে ?

রাণী বিস্ময়ের সুরে বলল : কে বললে তোর কর্তা ফেরেনি, আমি তো দেখিছি, ছুটতে ছুটতে এসেছে—দাঁড়া তো···

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই কাঁধের আঁচলটি কোমরে জড়াতে জড়াতে রাণী তীরের বেগে বেরিয়ে গেল। দেবী মেয়েটির স্বভাব যেমন কোমল, রাণীর ঠিক তার বিপরীত। কেউ কোন দোষ-ত্রুটি করলে এবং তা রাণীর চোখে পড়লে

আর রক্ষা নেই—সে তখনি একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। উচিত কথা শোনাতে, কিম্বা ঝগড়া বা মারামারি করতেও এই মেয়েটি কোনদিন পিছপাও নয়।

রাধার খেলাঘরে শান্ত প্রকৃতির ছেলে ললিত তখন খুবই মুশকিলে পড়েছে। তার মন পড়ে রয়েছে দেবীর দিকে, দেবী ছাড়া আর কোন মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে সে খেলতে নারাজ, ভালোও লাগে না তার; অথচ রাধা কি না জোর করে তাকে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছে কিছুতেই উঠতে দেবে না। উপরন্তু আবদার ধরেছে—যে ফুল-বেলপাতা তার সঙ্গে রয়েছে, রাধার ঠাকুরঘরে সেগুলি কাজে লাগাক—ললিত নিজেই পূজা করুক। কিন্তু ললিত গোঁ ধরেছে—এ কেমন করে হবে? হরগৌরীতলা থেকে সে কত কষ্ট করে প্রসাদী ফুলপাতা এনেছে দেবীর ছেলের জন্য। এ-সব ফুল-পাতা সে কিছুতেই দেবে না, এ ছাড়া প্রসাদী ফুল-পাতায় কি ঠাকুরের পূজা হয়? ললিতের বাবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, নিজেই নিত্য ঠাকুরপূজা করেন, ললিত কাছে বসে বসে দেখে, কাজেই পূজার প্রকরণ কিছু কিছু তার জানা আছে।

রাধা ভাবছে, ললিতের এ কথার কি জবাব সে দেবে? এমনি সময় কোমরে আঁচলটি জড়িয়ে মারমুখী হয়ে সেখানে ধেয়ে এলো দেবীর ছোট বোন রাণী। তর্জনী তুলে চোখ দুটো পাকিয়ে মুখখানা বেঁকিয়ে সে ললিতকে উদ্দেশ করে বলল: কি রকম বে-আক্কিলে কর্তা তুমি গা। তোমার গিন্নী ছেলে নিয়ে ঠায় বসে, উঠতে পারছে না, রান্নাঘরে সব পড়ে—আর তুমি এখানে দিব্যি বসে আছ? ওঠ বলছি—

ললিত হকচকিত হয়ে আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল: এই ছাখ না—রাধা আমাকে খালি খালি ধরে রেখেছে।

মুখখানা বিকৃত করে রাণী বলল: আহা গো। কচি খোকা, বলি পা দুটো পঙ্গু হয়েছে না কি, যে উঠতে পারছ না? এখনো বসে আছ।

রাধার দিকে অসহায় ভাবে ললিত তাকায়। রাধা এতক্ষণ মনের সমস্ত ক্রোধ চেপে রাণীর এই অন্যায় ও অনধিকারচর্চা কোন রকমে সহ্য করছিল, এখন ফেটে পড়বার মত হয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল: তোর

বে ভারি আস্পর্দা হয়েছে রে রাণী! আমার ঘর বয়ে তুই ঝগড়া করতে এলি? বলি—ললিতদা কি দেবীর কেনা কর্তা?

রাণীও ততোধিক চড়া গলায় এবং প্রত্যক্ষ যুক্তির সঙ্গে জবাব দিলো: কেনা কি না—ঐ তো বসে রয়েছে কর্তা, জিজ্ঞেস কর না—ও কোথায় যেতে চায়?

রাণীর কথার সঙ্গেই ললিত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েই বলল: আমি দেবীর কাছে যাব।

রাণীও মুখ নাড়া দিয়ে বলল: যাবে তো যাও না—দাঁড়িয়ে কেন? ভ্যালা মেনী-মুখো মানুষ!

আর কথা নেই, কলাপাতায় বাঁধা ফুলের মোড়কটি তুলে নিয়েই দে ছুট রাধা প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিল, ললিতকে তার আয়ত্ত থেকে এ ভাবে পাল ে দেখে সে-ও তার পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে দু' পা এগুতেই, রাণী বাধা দিয়ে ,থমে ক না, থাক্—ঢের হয়েছে, আর টস দেখিয়ে কাজ নেই।

ফুল্লোমুখী হয়ে রাধা বলল: তুই পোড়ারমুখী এসেই তো সব নষ্ট করে দিলি! রাধা, রাণীকে চেনে—ঝগড়ায় বা গায়ের জোরে তাকে এঁটে ওঠা দায়—তারও পরীক্ষা হয়ে গেছে। কাজেই আর বাড়াবাড়ি না করে নিজের ঘরকন্নার দিকেই তাকে মন নিবিষ্ট করতে হলো—মনের দুঃখ সব, মনেই চেপে রেখে।

রাণীও ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসে ললিতকে ধরে ফেলল, তার পর দেবীর সামনে হাজির করে শ্লেষের সুরে বলল: এই তোর কর্তাকে নে—এর পর শক্ত হয়ে শাসন করবি, বুঝলি?

দেবীর অত শত নেই। কর্তাকে দেখেই যেন বর্তে গেল, সচকিত হয়ে বলল: খোকা জ্বরে আনচান করছে, ওকে ফেলে উঠতে পারছি না—তুমি একটু কাছে ব'স; আমি ওদিকে দেখি।

ললিত তাড়াতাড়ি বলল: খোকার জন্যেই তো বেরিয়েছিলুম ঠাকুরের প্রসাদী ফুল আনতে—

দেবী: এনেছ?

ললিত: এই যে—নাও!

কলাপাতায় বাঁধা ফুল-পাতার মোড়কটি দেবীর হাতে দিতেই অমনি তার মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে-ও তৎক্ষণাৎ মোড়কটি খুলে ফুল-পাতাগুলি বের করে শয্যাশায়ী কাঠের পুতুলটির সর্বাঙ্গে দৈবী-পরশ দিতে লাগল একান্ত আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে।

ওদিকে সন্নিহিত চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট আলাপচারী দুই প্রৌঢ় বন্ধু এই সূত্রে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে একটা মিলন-গ্রন্থিও রচনা করতে থাকেন। কথা-প্রসঙ্গে চার বছর আগের হরগৌরী মন্দিরের ঘটনাটিও তাঁদের স্মৃতিপথে উঠে সম্বন্ধটি দৃঢ় করে দেয়।

বগলাপদ বলেন: দেখ ভায়া, ছেলে বড় হলে যেন ভুলে যেয়ো না। তাহলে আমার স্ত্রী একবারে ভেঙে পড়বেন!

পশুপতি বলেন: পাগল হয়েছ! আমাদের যেমন ছাড়াছাড়ি হবে না, টিরও তাই। আমার স্ত্রীর চোখে সেই থেকে মন্দিরের ব্যাপারটি ছবির কি দিন-রাতই ভাসে!

৩

পূর্বোক্ত ঘটনাটির পর এ-পল্লীর বালক-বালিকা মহলে চাঞ্চল্যের একটা সাড়া পড়ে যায়—রাধা মেয়েটিও তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তলে তলে চেষ্টা করতে থাকে। রসরাজ অমৃতলাল বসু বলতেন: ইংরেজদের কাছ থেকে আমাদের স্বরাজ শিখবার কিছুই নেই—আমরা ছেলেবেলা থেকে ছেলেখেলার ভিতর দিয়ে 'স্বরাজ' করে আসছি। ছেলেমেয়ে মানুষ করা, বাঁধা আয়ের মধ্যে সব দিকে দৃষ্টি রেখে মানিয়ে নেওয়া, তার মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি, মামলা-মকর্দমা, লোক-লৌকিকতা রক্ষা—আমরা যে ভাবে চালিয়ে বাহাদুরী নিই—করুক দেখি কোন সিবিলিয়ান ইংরেজ তেমনি নিখুঁত ভাবে? আর,

আমাদের দেখাদেখি, বাচ্চাগুলোও তাদের খেলাঘরে হুবহু আমাদের নিত্যকার কাজের এমনি অনুকরণ করে যে, আড়াল থেকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

কথাগুলো যে রসরাজ অভিজ্ঞতা সূত্রেই বলেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই এবং এই হরগৌরীপুরের শিশুমহলের খেলার ভিতর দিয়েই তার একটা সুস্পষ্ট আভাসও পাওয়া যায়। সে যাই হোক, এখন আমাদের গল্পে আসা যাক। রাধা মেয়েটি মাতুলালয়ে থাকে, খুব শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মায়ের সঙ্গে মাতামহের আশ্রয়ে এসে লালিত-পালিত হচ্ছে। মাতামহ সত্য ঘোষাল গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে বর্ষীয়ান ব্যক্তি, তাঁর অবস্থাও বেশ সচ্ছল, যথেষ্ট জমি-জমা আছে, তার উপর বাড়ী থেকেই তেজারতিও করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে বুদ্ধির সঙ্গে মাথাও চালাতে হয়। কাজেই দাদুর সংস্পর্শে থেকে রাধাও মাথা চালাতে শিখেছে। তাই এর পর সে ললিত ছেলেটির নামে মিথ্যা করে লাগিয়ে ভাঙিয়ে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের মন এমনি বিষিয়ে দিলে যে, দেখতে দেখতে একটা ভাঙন ধরে গেল। ললিত দেখে, তাকে আর কেউ ডাকে না, মিশতেও চায় না তার সঙ্গে। এমন কি, দেবীও একদিন নীরবে তার হাতের বিচ্ছেদসূচক আঙুলটি তুলে দেখিয়ে আড়ি দিয়ে দিল। এ অবস্থায় মান রক্ষার জন্য ললিতকেও তার নিজের সেই নির্দিষ্ট আঙুলটি দেখিয়ে বিপক্ষ ভেবেই দেবীর 'আলটিমেটাম' গ্রহণ করতে হলো।

এর ফলে শিশুমহলে বেশ একটা থমথমে ভাব গাঢ় হয়ে উঠল। খেলা আর জমে না। রাধা ভেবেছিল, এ ভাবে মন-ভাঙানোর ফলে তার খেলাঘরটি দিব্যি জেঁকে উঠবে, কিন্তু দেখা গেল—কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব যেন বিশ্রী করে তুলেছে খেলাঘরের পরিবেশটিকে।

ললিত এখন একঘরে—একা। কিন্তু তার দরদী দৃষ্টি দেবীকে ঘিরে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। নিজের মনে সে ভাবে, তার তো কোন দোষ নেই—তবে কেন দেবীও তাকে ভুল বুঝল? হরগৌরী মন্দিরে খুব শিশুকালে তাদের মিলনের কথা সে শুনেছে; সে-সূত্রে হরগৌরীর উপরে তার ভক্তিও যথেষ্ট। এখন তার কাজ হয়েছে—ঐ ঠাকুরের কাছেই নালিশ করা, তিনি যাতে দেবীর ভুল ভেঙে দেন। নির্জনে নিবিষ্ট মনে ললিতকে প্রায়ই ঠাকুরের উদ্দেশে আর্ত-

প্রার্থনা নিবেদন করতে দেখা যায়। সকাতরে সে জানায়: আমি তো কোন দোষ করিনি ঠাকুর, মিছে কথা বলতেও শিখিনি, তবে কেন মিছিমিছি ওরা আমাকে 'মিথ্যুক' 'দেমাকে' 'মিটমিটে ভান' বলে আড়ি দিয়ে গেল? আমার কথা ওরা বিশ্বাসই করলে না। কিন্তু তুমি তো সব জানো—'তুমি যে অন্তর্যামী ঠাকুর! তবে কেন চুপ করে আছ? আমি যে আর একলা একলা থাকতে পারছি না রেবীকে ছেড়ে? তুমিই আবার আমাদের ভাব করে দাও। মা তো বলেন—তোমাকে মন দিয়ে ডাকলে, মনের কথা শোনালে, সব দুঃখ মোচন করে দাও। তাই তোমাকে ডাকছি ঠাকুর—আমার কথায় তুমি কান দাও।'

ঠাকুরের উদ্দেশে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তার বড় বড় কালো কালো চোখের তারা দুটি জলে ভরে যায়। জলভরা পদ্মফুলের মত সেই সুন্দর মুখখানিও শোভাময় হয়ে ওঠে।

ওদিকে রাধার উদ্যোগে পাড়ার ছেলেমেয়েরা চড়িভাতের আনন্দে মেতে ওঠছে। তাদের নিরানন্দ মনগুলি আবার উল্লাসে ঝলমল করছে। স্থির হয়েছে—সেদিন দুপুরের পর দল বেঁধে তারা সবাই মিলে সরস্বতীর জাঙ্গালে সেঁধুবে, সেইখানেই চড়িভাতি হবে, আর সেই বনের ভিতরে তারা লুকোচুরি খেলবে। রাধা যুক্তি দিয়েছে—ললিতকে বাদ দিয়ে এই চড়িভাতি করলেই, সে যে একঘরে হয়েছে, আমাদের দলের বাইরে—সেটা আরো ভালো করে সকলে জানতে পারবে।

বসন্ত ছেলেটি এখন এ দলের 'চাঁই' হয়েছে—ছেলেগুলো তার হাত ধরা, এরই ইশারায় তারা ফেরে। ললিতের প্রতি তার বরাবরই বিদ্বেষ, কিছুতেই তার সঙ্গে বনে না। সেই তো ললিতের নাম রেখেছে—'মিটমিটে ভান।' রাধার যুক্তি শুনে বসন্ত ক্ল্যাপ দিয়ে বলে: হুররে! রাধা ভারি দামী কথা বলেছে। সত্যিই এবার বাছাধনের দেমাক ভাঙবে।

ছেলেরা স্লোগান তোলে: মার দিয়া কেল্লা। বন্দে মাতরম্।

সবাই আনন্দে উৎফুল্ল; কিন্তু রেবীর মুখখানা সর্বদাই যেন বিমর্ষ, ম্রিয়মান। এ প্রস্তাবে বাধ্য হয়ে তাকেও মত দিতে হয় সমস্ত ব্যথা-বেদনা চেপে রেখে।

হ্যাঁ, সে-ও আনন্দে মেতে উঠত—যদি তার ললিতদা থাকত তার পাশে। কিন্তু সে সম্ভাবনা তো নেই—সে যে এখন দলছাড়া, একঘরে। আবার এ ব্যাপারে রাণীর যে যুক্তি নেবে, তারও উপায় নেই—এই আড়াআড়ির আগে থেকেই রাণী পড়েছে জ্বরে—তাই তাকে সে কোন কথাই বলেনি।

যাই হোক, নির্দিষ্ট সেই ছুটির দিনে বাড়ীতে কোন রকমে খাওয়া দাওয়া সেরেই এ-দলটি, তোড়জোড় সব সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চড়িভাতির উদ্দেশে। ললিত তখন বাইরেই সেই চণ্ডীমণ্ডপে একলাটি একখানি পড়ার বই হাতে করে বসেছিল। কিন্তু পড়ায় কিছুতেই মন নিবিষ্ট করতে পারছিল না, চার পাশ থেকে খেলুড়েদের কথাগুলো কানে বেজে তাকে চঞ্চল করে তুলছিল; অথচ, এখান থেকে উঠে যেতেও তার মন সায় দিচ্ছিল না। আর একটু পরেই যে ওরা দল বেঁধে যাবে, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই দেবী থাকবে—তার এখন একান্ত ইচ্ছা, একবার দেবীকে এই সময় দেখবে—সত্যিই কি সে ওদের মতই হাসতে হাসতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে সঙ্গে যাবে?

আর ভাবা হলো না—পনেরো-ষোলটি ছেলেমেয়ের সেই বড় দলটি চণ্ডীমণ্ডপের কাছে এসে দাঁড়াল। চড়িভাতির সমস্ত উপকরণও এদের সঙ্গে রয়েছে। ললিতকে এ সময় সামনে দেখতে পাবে, কেউ তা ভাবেনি; এখন বসন্তই সর্বাগ্রে তাকে উদ্দেশ করে বলল: এই ছাখ্, আমরা দল বেঁধে পিকনিক করতে চলিছি, আমাদের এখানকার খেলাঘর সব খালি রইল, তুই একলাই আগলে থাকিস্ ললতে!

কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে এ-ভাবে শ্লেষের আঘাত দিল এই ছেলেটি—সে তখন ও-কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে দলের মধ্যে দেবীকে খুঁজছিল তার আগ্রহাত্মক দৃষ্টি দিয়ে। এতক্ষণে তার বহুপ্রতীক্ষ্য ধৈর্য সার্থক হলো। সে দেখল, অত্যন্ত আড়ষ্ট ভাবে বিরস বদনে দেবী রয়েছে তাদের মধ্যে, মুখে নেই হাসি, আর সব ছেলেমেয়েদের মত দেহখানি তার উৎসাহে টলমল করছে না, অমন যে টানা টানা দুটি চোখ—যেন একেবারে নিষ্প্রভ এবং তারই দিকে সম্পূর্ণ নিবদ্ধ।

ললিতকে নিরুত্তর দেখে দল থেকে রাধা বলল; আমাদের চড়িভাতিতে

দেবী বলেছে কাঁচা লঙ্কার দম রাঁধবে—থেকো ব'সে এখানে, তোমার জন্তেও দুটো আনবে।

দেবী ছাড়া দলের সবাই হেসে উঠলো। ললিত লক্ষ্য করল—দেবীর মুখখানা যেন কালো হয়ে গেছে রাধার ঐ কথা শুনে। সে তখন কোন উত্তর না দিয়ে ঝাঁ করে উঠে পড়ে বাড়ীর দিকে ছুটলো, তার পর হাতের বইখানা রেখে খালি গায়ে একটা হাত-কাটা জামা চড়িয়ে ফিতে বাঁধা জুতো জোড়াটি পরে তার ছোট ছাতিটি নিয়ে আবার চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে এলো।

দলটি তখন কলহাস্তে মধ্যাহ্নের জনহীন পথ মুখর করে চলেছে এবং ললিতকে উদ্দেশ করে তাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিদ্রূপ-বাণীর দু'-একটা কণা ইটের টুকরোর মত কানে এসে পড়ায় এরই মধ্যে ললিত স্থির করে ফেলেছে যে,—সে-ও সরস্বতীর জাঙ্গালে যাবে, তার পর ওদের অলক্ষ্যে ওদেরই সঙ্গে বনভ্রমণ করবে। সেখানে বনভোজন করে ওদের মনে যে আনন্দ হবে, তারও চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ সে উপভোগ করবে একাই বনে বনে ভ্রমণ করে। ললিত আরও বুঝল যে শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে হবে, এই ভয়ে ওরা গ্রামের যে পথ ধরে জাঙ্গালে চলেছে, তাতে অনেকটা ঘুর হবে। সে কিন্তু দলে থাকলে, ওদিকের পথ ধরে আগে হরগৌরীর মন্দিরে ঠাকুরদর্শন করে, তার পর শ্মশানের কিনারা দিয়েই জাঙ্গালে ঢুকতো। এখন ওদের এই ভুল নিজেই শুধরে নেবে এই মনে করে ললিত ছাতাটি খুলে মাথায় দিয়ে হরগৌরীর মন্দিরের দিকে ছুট দিল।

৪

বসন্ত-চালিত ছোটদের দলটি স্থির করেছিল যে, গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে হরগৌরী-মন্দির থেকে অনেকখানি তফাতে নতুন জাঙ্গালে তারা চড়ি-ভাতি করবে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে উত্তরমুখী হয়ে নদীর একেবারে কিনারা ঘেঁসে শ্মশানের গণ্ডীর বাইরে থেকেই আবার বাঁধে উঠে পুরানো জাঙ্গালে ঢুকবে লুকোচুরি খেলার উদ্দেশ্যে। শ্মশানের ভয়েই এতখানি ঘুরতে তারা রাজী হয়েছিল। কিছু কাল ধরে নদীর এ পাশে স্থায়ীভাবে পলি পড়ে খানিকটা চর জেগেছিল; দেখতে দেখতে স্থানটা জঙ্গলে ভরে যায়, তার নাম হয় ছোট জাঙ্গাল। জমিদার এই নতুন জাঙ্গালকে খাস করে নেন—এ জঙ্গল থেকে গাছপালা কাটা বা পাতার ঘর বেঁধে হা-ঘরেদের থাকা নিষিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে শ্মশান থেকে এই জাঙ্গাল অনেকটা তফাতে পড়ায় ঘর-গৃহস্থালীর প্রয়োজনে জাঙ্গালের নামকরা লতাপাতার সন্ধানে গ্রামের লোক অসঙ্কোচেই এখানে যাতায়াত করে থাকে। খেলুড়ে দলটিও নিরাপত্তার দিক দিয়ে তাদের ভোজন-পর্বটা এই জাঙ্গালেই সারবার সঙ্কল্প করে। ললিতের মত তাদের অন্তরে তো আর হরগৌরী দর্শনের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়নি!

কল-কণ্ঠের নানারূপ ধ্বনিতে পল্লীপথ মুখরিত করে পিকনিকের দলটি নতুন জাঙ্গালে প্রবেশ করল। আষাঢ় মাস, মাঝে মাঝে বর্ষণ হওয়ায় বনভূমি সিক্ত, যাতায়াতে যে পথ পড়েছে, তাও পিচ্ছিল। দেবী তো চলতে চলতে পা-পিছলে পড়ে গিয়ে 'মা গো'! ব'লে চেঁচিয়ে উঠল—আর্ত কণ্ঠের স্বর, কান্নার মতই শোনালো। ফলে, দলশুদ্ধ সবাই হেসে উঠল, ছেলেরা করতালি দিল; কিন্তু তাকে তুলতে কেউ এগিয়ে এলো না। রাধা মুখের হাসি চেপে যখন তাকে সাহায্য করতে কাছে এলো, দেবী তখন নিজেই উঠে পিছনের দিকে কাপড়খানার অবস্থা দেখছিল; রাধাকে তার দিকে হাত বাড়াতে দেখে ফোঁস করে উঠল, চাপা গলায় বলল: থাক্, ঢের হয়েছে—আর সোহাগ দেখাতে হবে না।

মুচকে হেসে রাধা বলল: আমি তো আর তোর ললিতদা' নই যে, পা পিছলে পড়বি জেনেই তার আগে ছুটে এসে ধরবো!

ঝঙ্কার দিয়ে দেবী বলে উঠল: কে তোকে ধরতে ডেকেছিল?

বসন্ত বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গি করে বলল: দেবীকে ঘাঁটাসনি রাধি, সকাল থেকেই মুখখানা গোঁজ করে আছে—এখনি কামড়ে দেবে।

মুখখানা বিকৃত করে দেবী বলল: আহা, কথার ছিরি দেখ না! আমি কি শ্যাল না কুকুর যে, কামড়ে দেব?

রাধা বলল: তুই শ্যালও নোস, কুকুরও নোস, যে ভাবে ফোঁস করে উঠলি—

রতন নামে দলের আর একটি ছেলে বলল: ফোঁস করে ওঠে তো সাপ, তাহলে দেবী বনে এসে—

বসন্তর সঙ্গে রাধা এবং আরও দু'-তিনটি মেয়ে সহাস্যে সমস্বরে বলে উঠল: সাপ হয়েছে—সাপ!

দেবী বলল: ভালোই ত, আমি সাপই হয়েছি, আমার কাছে কেউ তোরা আসিস্‌নি, তাহলেই ছোবল খাবি।

কথাটা শুনে দলের সকলেই হেসে উঠল, দু'-এক জন করতালি দিয়ে বলল: বা—দেবী, বা! বেশ বলেছিস।

কথার সঙ্গে সঙ্গে দলটি বনের মধ্যে ক্রমশঃই এগুচ্ছিল। হঠাৎ বড় বড় পাখার ঝটাপট শব্দ তুলে কতকগুলো শকুনিকে উড়ে যেতে দেখে সবাই সভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, পরক্ষণে হাওয়ার সঙ্গে একটা বিশ্রী গন্ধ ভেসে এসে তাদের অতিষ্ঠ করে তুলল। মেয়েগুলো নাকে-মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘেন্নায় উস্‌খুস্‌ করতে লাগল, ছেলেরা নাক টিপে চোখ তুলে চার দিকে তাকাতে লাগল—কিসের দুর্গন্ধ, সেটা আবিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে।

ব্যাপারটা তখনি প্রকাশ পেল, সত্যই বীভৎস দৃশ্য! একটা গোরু গায়ের ছাল-ছাড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে, তারই পচা গন্ধ। সেই মাংসের লোভে শকুনির পাল মৃতদেহটা ছেঁকে ধরেছিল। স্থানটা একটু নিরিবিলি আর ফাঁকা থাকায় এখানেই আস্তানা পাতবার উদ্যোগ করবে ভাবছিল দলপতি রূপচাঁদ।

কিন্তু এখন এই বিভ্রাট দেখে এর ত্রিসীমা থেকে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। জলের দিকে চেয়ে বসন্ত বলল: দেবীর শাপেই এটা হলো—যেমন ব্যাধি ওর পিছনে লেগেছিল! এখন পা চালিয়ে এগিয়ে চল সকলে, এঁদেরকে তো দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে এল।

মেয়েদের আর কথা বলবার মত অবস্থা ছিল না, ঘৃণাটা এদেরই বেশী; কেউ আর নাক-মুখ থেকে আঁচলের কাপড় সরায়নি। নীরব ভঙ্গিতেই বসন্তর প্রস্তাব সমর্থন করল প্রত্যেকে। কিন্তু ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে যাওয়াটাও কঠিন—বনপথ এমনি পিচ্ছিল! পাছে পা পিছলে পড়ে গিয়ে দেবীর মত উপহাসের পাত্রী হোতে হয়, এই আশঙ্কায় অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে তারা কোন রকমে এগুচ্ছিল। কিন্তু যতই এগোয়, দুর্গন্ধ আরও তীব্রতর হয়ে তাদের পর্যন্ত যেন বিষিয়ে দিতে থাকে। দেখতে দেখতে তারা নতুন আখালের শেষ প্রান্তে এসে পড়ল, কিন্তু দুর্গন্ধের নিবৃত্তি নেই যেন!

দেবী বলিল: চল ফিরে যাই, আর রান্নাবান্নায় কাজ নেই; এমনি গা-বমি করছে।

আরও দু'-একটি মেয়ে দেবীকেই সমর্থন করল। কিন্তু রাধার মাথা থেকেই যখন ফন্দিটা বেরিয়েছে, সে কি সেটাকে বাতিল করতে পারে? সে বলল: অমনি অমনি ফিরে গেলে সবাই দুয়ো দেবে। আর এ গন্ধটা কি সব জায়গাতেই আছে? চল না, আরও একটু এগিয়ে যাই।

বসন্ত বলল: আর কোথায় এগুব, সামনেই ঘাট, তার পর শ্মশান। যদি বল ত, এইখানেই আস্তানা পাতা যাক্।

কিন্তু মুখের কাপড় খুলে মুক্ত বায়ুর একটা ঝলক সেবন করেই পুনরায় মেয়েগুলি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে আপত্তি জানাল: মা গো! এখানেও সেই গন্ধ!

সুতরাং স্থানটি উপযুক্ত হলেও দুর্গন্ধের জন্য কারও মনে ধরল না। মৃতদেহটি যেখানে পড়েছিল, সেখান থেকে অনেকটা পথ এরা অতিক্রম করে এসেছিল, এত দূরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়া উচিত ছিল না, কিন্তু এদের অদৃষ্টক্রমে বায়ুর গতি উত্তরাভিমুখী হওয়ায়, এখানেও এরা দুর্গন্ধ অনুভব করে আরো এগিয়ে যেতে উদ্গ্রীব।

কিন্তু এর পরেই বিস্তীর্ণ স্নানের ঘাট। সম্ভবতঃ হরগৌরী মন্দির নির্মাণ-কালেই ঘাটটি সন্ন্যাসী, স্নানার্থী ও সন্নিহিত শ্মশানে মৃতের অন্ত্যেষ্টিকারীদের সুবিধার জন্যই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এখন এর জীর্ণ দশা। কতক ভেঙে গেছে, কিয়দংশ এখনও কালের সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্ষত-বিক্ষত দেহে পড়ে আছে—মুমূর্ষুর মত। স্নানার্থীদের এখন এইটিই একমাত্র অবলম্বন; কারণ, এই অঞ্চলের আর কোন স্থানে নদীর গায়ে স্নানের কোন ঘাট নেই। এই ঘাট থেকে উপরে উঠলেই মন্দিরের পথ, তার পর ঘাটের বিপরীত দিকে খানিকটা তফাতে মহাশ্মশান। তার পাশ থেকেই জাঙ্গাল সুরু হয়েছে।

পিকনিকের দলটি এখানে এসেই ঘাটের লম্বা চাতালে বসে পড়ল। অনেকখানি পথ নাকে-মুখে কাপড় গুঁজে, তার উপর পা টিপে টিপে তাড়াতাড়ি আসতে খুবই শ্রান্ত হয়েছিল। ভেবেছিল, এখানে খানিকটা জিরিয়ে নেবে, কিম্বা এখানেই পিকনিকের আয়োজন করবে। কিন্তু সেই বিশ্রী গন্ধ যেন এদের সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করেছিল। দেবী নাক-মুখ সিঁটকে বলল; মাগো! এখানেও গন্ধ! উহু—

শুধু দেবী নয়, দলের সবাই অনুভব করল যে, দুর্গন্ধ তাদের পিছু-পিছু এসেছে। ঘাটের জলেও আশ-পাশের দু'-চার জন লোক অত বেলাতেও স্নান করতে এসেছিল। দল বেঁধে এতগুলি বালক-বালিকাকে ঘাটে এসে বসতে দেখে তারা কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এই সময় এদেরই একজনের মুখ থেকে বিশ্রী গন্ধের কথা শুনে জল থেকেই একজন বলে উঠল: হ্যাঁ তো, ঘাটে এসে অবধি একটা পচা গন্ধ—কোথা থেকে আসছে কে জানে!

বসন্ত বলল: আমরা জানি, দেখেও এসেছি—এখান থেকে খানিকটা তফাতে ছোট জাঙ্গালে একটা গোরু মরে পড়ে আছে—মুচিরা তার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে, তারই গন্ধ।

আর একজন জিজ্ঞাসা করল: তোমরা বুঝি তাহলে ছোট জাঙ্গাল ভেঙে আসছ? সঙ্গেও রান্নাবান্নার সরঞ্জাম দেখছি যে! কি ব্যাপার?

কানাই নামে আর একটি ছেলে বলল: ব্যাপার আর কি—পিকনিক

করতে এসেছিলুম, মরা গোরু দেখে পালিয়ে এসেছি, এখানেও সেই গন্ধ। সব ভেস্তে দিলে দেখছি।

স্নানার্থীরা সহানুভূতির সঙ্গেই বলাবলি করতে লাগল: দেখ দেখি কি বিভ্রাট! ছেলেমানুষ সব কোথায় আমোদ করে বনভোজনে বেরিয়েছে, তাতেও এই ব্যাঘাত ঘটালে বাপু! দেবতাকেও বলিহারি যাই!

একজন যুক্তি দিল: এক কাজ কর তোমরা, ওপরে উঠে গিয়ে মন্দিরের সামনের মাঠে—

বসন্ত তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাবে বাধা দিয়ে বলে উঠল; ওখানে কি বন-ভোজনের আমোদ হয়? তার পর, এ গন্ধ কি আর ওখানে যায়নি! তার চেয়ে চল বড় জাঙ্গালেই যাওয়া যাক।

বড় জাঙ্গালের নামে মেয়েদের মধ্যে কেমন একটি অস্বস্তির ভাব এল, অনেকেই হয়ত এ পর্যন্ত ওদিকটা মাড়ায়ও নি; তারপর পাশেই শ্মশান! দুর্গা নামে মেয়েটি চুপ করে না থেকে বলেই ফেলল: ওরে বাবা! ওখানে অমনি বড় কেউ যায়, তাতে আবার চড়িভাতি—রান্নাবান্না, খাওয়া, না না—তার চেয়ে বরং ফিরে যাওয়া ভালো।

বসন্ত পরিহাসের সুরে বলল: তুই বললি এ কথা? কোথায় তোর নাম নিয়েই তবে যাব, ভরসা দিবি; তা নয়—নিজেই ভয় পেয়ে গেলি! দুর্—দুর্—ফেরা আমাদের কখ্খনো হবে না।

রাধা বলল: ওদের যত ভয় ঐ শ্মশান দেখে—ওটা পেরিয়ে তো যেতে হবে ও জাঙ্গালে।

বসন্ত বলল: এই কথা! তারও বিহিত করা যাবে—সে আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছি। শ্মশানের ছায়াও আমরা মাড়াব না, এই ঘাটের পাশ দিয়ে কিনারা ধরে ওটা পার হয়ে যাব; এই স্নাথ না ভাঁটা পড়েছে—জল কত দূর নেমে গেছে। দিব্যি দল বেঁধে যাবো, ভয় কিসের?

শান্তি নামে আর একটি মেয়ে বলল: তাহলে এই ঘাট থেকে হাত-মুখ বরং ধুয়ে নিই এসো।

কথাটা দলের সকলেরই মনে লাগল। বসন্ত বলল: পাকা গিন্নীর মত

কথা বলেছে শান্তি। এসো, সবাই আমরা এখান থেকে হাত-মুখ ধোয়ার পাট সেরে নেই।

বসন্তর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠে পড়ে জলের দিকে নেমে গেল।

৫

ওদিকে ললিত ছেলেটি অনেক আগেই হরগৌরী-মন্দিরে এসে পৌঁছে গেছে। এত বেলায় মন্দিরে কোন লোক নেই। অল্প-স্বল্প যে দু'-চার জন ঘাটে স্নান করতে এসেছিল, তারা দূর থেকে হেঁট হয়ে প্রণাম করে সরে পড়ছিল, মন্দিরের মধ্যে কেউ বড় এগিয়ে আসছিল না।

অনেকখানি পথ দ্রুত পদে এসে ললিত মন্দিরের চাতালে বিশ্রাম করতে বসল। সেই সঙ্গে তার মাথায় একটা চিন্তা এল—সে এখন কি করবে? ঘাটে নেমে নদীর কিনারা দিয়ে চুপি চুপি যদি ছোট জাঙালে যায় তো কেমন হয়? আড়াল থেকে ওদের পিকনিক দেখবে, তার পর লুকোচুরি খেলবার জন্যে যখন ওরা বড় জাঙালে আসবে, সে-ও লুকিয়ে থেকে এমন কিছু করবে···

কিন্তু তখনই মনে তার অভিমান জেগে ওঠে—যদি ধরা পড়ে যায়, ওদের কেউ দেখে ফেলে! তাহলে—হ্যাংলা, গন্ধে গন্ধে এসেছে, ছোঁচা, এমনি সব বিশ্রী কথা বলে একবারে কুকুরেরও অধম করে দেবে! তার চেয়ে ও জাঙালে না যাওয়াই ভালো। পিকনিক ওরা ওখানে করুক, তার পর খেলতে হ'লে এ জাঙালে আসতেই হবে—সে বরং ওখানেই একটা ডালপালাওলা বড় ঝাঁকড়া গাছে উঠে ওদের খেলা দেখবে, তার পর যদি নিরালায় দেবীর সঙ্গে দেখা হয়···

দেবীর কথা মনে আসতেই তার মনের প্ল্যানটিও ঠিক হয়ে যায়। তাহলে আর কোন কথা নেই, যেটা স্থির করলে তাই হবে। এর পর পায়ের জুতো

খুলে তাড়াতাড়ি ভক্তির সঙ্গে সে মন্দিরে ঢুকল, দেবতার সামনে পীঠস্থানে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আর্তকণ্ঠে তার মনের প্রার্থনা জানাতে লাগল :- আমার কোন অপরাধ নেই ঠাকুর, তোমরা তো অন্তর্যামী, সবই জানো। দেবীরও কোন দোষ নেই, ওরা ওকে মিছে করে লাগিয়ে ওর মন ভেঙে দিয়েছে। তোমাদের দুটিতে তো কত ভাব, কখনো ছাড়াছাড়ি হয় না, আমাদেরও যাতে ভাব হয়, তাই করে দাও, দেবীকে ছেড়ে আমি যে আর একলা থাকতে পারছি না ঠাকুর! আমি মানত করে যাচ্ছি—ভাব হয়ে গেলে, দেবীকে নিয়ে এখানে আসব, তোমাদের পূজো দেব।

এই ভাবে মনের প্রার্থনা দেবস্থানে নিবেদন করে, অদ্ভুত প্রকৃতির এই ভাবুক ছেলেটি মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো। তার দুই চক্ষু তখন বাষ্পাচ্ছন্ন, মুক্তার মত অশ্রুর দু'-একটি ফোঁটা গণ্ডে গড়িয়ে পড়ছে।

এর পর শক্ত করে জুতো পায়ে দিয়ে, ছাতাটি তুলে নিয়ে সে সোজা ও সত্বর হবে বলে শ্মশানের উপর দিকের পথ ধরে বড় জাঙ্গাল অভিমুখে চলল। এই জাঙ্গালটির অনেকখানি অংশ ললিতের পরিচিত। এর আগেও অনেক বার সে এই জাঙ্গালে এসেছে পাঠশালার দু'-চার জন সাহসী সহপাঠীর সঙ্গে। একবার এই বনের একটা গাছ থেকে চাক ভেঙে তারা বিস্তর মধু সংগ্রহ করেছিল; লুকোচুরি খেলার চেয়ে তাতে আমোদ অনেক বেশী। সেই মধু থেকে অর্দ্ধেকখানি সে দেবীকে দিয়েছিল। দেবীর সঙ্গে তার কথা হয়ে আছে—একদিন এই বনে তাকে নিয়ে আসবে, যে গাছ থেকে মধু পেড়েছিল— সে গাছটাও তাকে দেখাবে। কিন্তু মাঝে থেকে ঝগড়া হতেই সব বিগড়ে গেল।

জঙ্গলে প্রবেশ করবার পর আর ছাতার প্রয়োজন নেই বুঝে ললিত ছাতাটি মুড়ে তার বাঁকানো বাঁটটি কাঁধের উপর রেখে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিল। সেই অবস্থায় হন-হন করে এগিয়ে চলল নিজের জন্য একটা নিরিবিলি স্থান দেখে নেবার জন্যে। এই বয়সেই গাছে উঠতে ললিত খুবই পটু হয়ে উঠেছিল। যে কোন গাছ হোক না কেন, বিশেষ একটি কৌশলে সর্ সর্ করে তার আগডালে উঠে যায়, তার পর এমনি কৌশলে প্রসারিত ডালের গোড়ায় বসে

পিছনের দিকে আর একটি ডালে পিঠটি ঠেসান দিয়ে গাছের ডালপালার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে যে, নীচে থেকে কেউ জানতে পারে না যে গাছের উপরে একটা ছেলে লুকিয়ে আছে। গাছে উঠে গাছের ডালে লুকিয়ে খেলুড়েদের হারিয়ে দেওয়াই হচ্ছে ললিতদের লুকোচুরি খেলার একটা বিশেষ ধারা। বনের মধ্যে সেঁধিয়ে ছুটোছুটির চেয়ে গাছে উঠে লুকোনো, তার পর খোঁজাখুঁজির এই খেলাটি একটু নতুন ধরণের বলেই ললিতের এর উপরে আগ্রহটি বেশী।

যেতে যেতে সামনেই একটা উঁচু শিরিস গাছ দেখতে পেয়ে ললিতের পা দু'খানা বুঝি সড়্ সড়্ করে উঠল, গাছটির তলায় এসে একটু থেমে চার দিকের পরিবেশটা দেখে বুঝল, বেশ নিরিবিলি জায়গাটি। এখানকার গাছগুলো বেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দেখাচ্ছে—বর্ষায়-গজানো নতুন নতুন ডালপালা আর তাজা তাজা পাতায়। নীচের জমিন অনেকখানি ফাঁকা, আশে-পাশের গাছগুলির ডাল-পালা যেন ছাতির মতন হয়ে রোদকে আড়াল করে রেখেছে। চড়িভাতি করতে হলে, এই জায়গাটিই ছিল চমৎকার! কিন্তু ওরা তো আর ছোট জাঙ্গালের মায়া ছেড়ে এখানে আসবে না চড়িভাতি করতে! ভাবতে ভাবতেই ললিত ছাতাটাকে গাছের গুঁড়ির কাছে রেখে লম্বা গাছটার উপর সর্ সর্ করে কাঠবিড়ালীর মত অভ্যস্ত কৌশলে উঠে গেল। শিরিস গাছ সাধারণতঃ সোজা হয়ে খুব উঁচুতে ওঠে, ডালপালা বড় বেশী থাকে না। আর এ গাছে বসে লুকিয়ে থাকাও চলে না, তবে দিগদর্শনের দিক দিয়ে এর উপযোগিতা খুব বেশী। যদিও ললিতের মনে এ চিন্তা আসেনি, সে জানে তারা এতক্ষণে নতুন জাঙ্গালের কোন স্থানে চড়িভাতির কাজে লেগে গেছে; খেয়ে দেয়ে এখানে আসতে এখনো অনেক দেরী। এ অবস্থায় নিজের জন্যেই একটা আশ্রয়-স্থান ঠিক করে ফেলাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তাই সে সামনের গাছটাকে আশ্চর্য রকমের উঁচু দেখে উঠে পড়েছিল নিজের খেয়ালের বশেই। কিন্তু গাছটার শীর্ষদেশে উঠে উত্তর দিকে নতুন জাঙ্গাল লক্ষ্য করে তাকাতেই অতি বড় বিস্ময়ে তার দু'চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, সেই সঙ্গে দেহে-মনে একটা উত্তেজনাও জেগে উঠল। ললিত দেখল—চণ্ডীমণ্ডপে বসে যে দলটিকে দেখেছিল, সেটি খানিক তফাতে পিঁপড়ের সারির মত এঁকে-বেঁকে এই

জাঙালের একটা বাঁকের কাছে এসে নদীর কিনারা থেকে ঢালু পথ ধরে উপরে উঠছে।

হতচকিতের মত ঠায় চেয়ে থাকে ললিত—এ যে একবারে তাজ্জব কাণ্ডের মত! অতখানি পথ ঘুরে ওরা বড় জাঙালেই আসছে চড়িভাতি করতে! এখনো যে সে পাট হয়নি, গাছের মগডালে দাঁড়িয়ে ললিত সেটা স্পষ্ট জেনেছে; যে দুটো ছোকরা চাকরের মাথায় ধামাভর্তি তোলা উনুন থেকে আরম্ভ করে রান্না-বান্নার জিনিসপত্র সব ওখানে দেখেছিল, তারা দুটিতে ঠিক সেই ভাবেই ধামা মাথায় করে দলটির আগে আগে আসছে। তবে নিশ্চয়ই ওরা মত বদলেছে, এই জাঙালেই এসে রান্না-বান্না করবে, তার পরে খেলা। কিন্তু ললিত এখন কি করবে? নীচের দিকে তাকাতেই নিজের বুদ্ধির উপরেই তার কেমন একটা অবজ্ঞা এলো। গাছটা উঁচু হলে কি হয়, বেশী ডালপালা না থাকায় ওরা এখানে এলেই ত ধরা পড়ে যাবে! তার পর ছাতাটাও কিনা গাছের গুঁড়ির গায়েই রেখে এসেছে! এখনি তো ওরা এসে পড়বে, কিন্তু তার আগেই ওর লুকোবার জায়গা ঠিক করে নেওয়া চাইই।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে, যেমন সে গাছটি দেখেই সড়্ সড়্ করে উঠেছিল, এখন ঐ দলটিকে দেখেও অন্যত্র লুকোবার উদ্দেশ্যে আরও দ্রুত তর্ তর্ করে নীচে নেমে এল। তার পর ছাতিটা তুলে নিয়ে এক দৌড়ে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে গেল। তার পরেই নিবিড় বন—গাছে গাছে ডালে ডালে পাতায় পাতায় মিশে দূর-দূরান্তরে এগিয়ে গেছে। একটু দূরে নদীর দিকে পথের মত একটা রেখা নজরে পড়ে, যারা এ বনে প্রবেশ করে—ঐ পথ ধরে এগিয়ে আসে। ললিতও কত বার গিয়েছে—বনের অনেকখানি ভিতরে, অনেকটা দূর পর্যন্ত। কিন্তু ফাঁকা জায়গার পরেই ঘন বনের দিকটা তার ভারি পছন্দ হলো। এখান থেকেই সে দেখতে পেল যে, হাত দশেক তফাতে প্রকাণ্ড একটা চালতা গাছ যেন হাজার খানেক ছাতা মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গাছটার চার দিকে এত সব ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখায় বড় বড় চওড়া চওড়া পুরু পুরু এত পাতা যে, ভিতরটা কিছুই দেখা যায় না। ললিত বুঝল যে, ঐ গাছে উঠে বসতে পারলেই তার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। কিন্তু কি করে ও গাছটির তলায়

গিয়ে দাঁড়াবে সে? চার দিকের বিশ্রী জঙ্গলগুলো যেন এতবার পথ রুখে কড়া পাহারা দিচ্ছে। এক পাশে বেতানের গাছগুলো লতিয়ে এসে গাছটার ডালের সঙ্গে মিশে গেছে; আর সব দিকেও শেঁকুল, বাকস, বৌচ, ফণীমনসা প্রভৃতির ঘন বেষ্টনী। কিন্তু আর ত ভাববার সময় নেই, হাতের ছাতাটির সাহায্যে এরই মধ্যে কোন রকমে মাথা ও দেহটাকে গলাবার একটু পথ করে নিয়ে ললিত গাছটির মোটা গুঁড়িটার কাছে গিয়ে পৌছাল। দেখল, কাঁটাগাছের একটা লম্বা লতানে ডাল তার উপরে একটা মাত্র বেড় দিয়েছে। ছাতার সাহায্যে সেই বেড়টি ছাড়িয়ে দিয়ে ক্ষিপ্রপদে গাছের উপর খানিকটা উঠেই ছাতা দিয়ে বিক্ষিপ্ত ডালটিকে গাছটির মূলদেশে পুনরায় জড়িয়ে দিল। তার পর ছাতাটিকে সামনে নিয়ে অবলীলাক্রমে উপরে উঠতে লাগল। এ ব্যাপারে ললিত ছেলেটির উপস্থিত বুদ্ধিরও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল। কাঁটা গাছের লতানে ডালটি আগের মত চালতা গাছটির কাণ্ডে একটা বেড় দেওয়া থাকলে, কেউ এ গাছের গোড়ায় এসে আর উঠতে চাইবে না, কিম্বা গাছে কেউ উঠেছে বলে সন্দেহও করবে না। এদিক দিয়ে তার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধিরও উদ্রেক হয়েছিল। যদিই দলটি এদিকে আসে, তাহলে গাছের মধ্যে অদৃশ্য থেকে দলশুদ্ধ সকলকে হকচকিয়ে দেবার মত কোন কিছু কসরতও সে করতে পারে তো। কাজেই নিজেকে অদৃশ্য রাখবার পক্ষে গাছটি তার খুবই উপযোগী বলেই মনে হলো।

তার পর গাছের ডালে ডালে পা দিয়ে দূর উপরে উঠতেই সে দেখতে পেল, পাতার ভিতরে ভিতরে অজস্র চালতা ফলে আছে। পাকা নয়, বড়ও নয়, কচি কচি ছোট ছোট সবুজ বর্ণের বলের মত গোল ফল। ললিতের মনে পড়ে গেল, বাড়িতে এ-সময় এই রকম কচি চালতার অম্বল রাঁধে তার মা, ফালা-ফালা করে চালতা কেটে বিনা উপাদানে, আবার কখন বা খেসারি, মুশুর, মটর প্রভৃতি ডালের অনুষঙ্গরূপে। ললিতের জিভে জল এসে গেল।

ওদিকে পিকনিকের দলের কলকণ্ঠে বনভূমির নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। এ দিনের যাত্রা সম্বন্ধে দুর্ভোগের কথা বলতে বলতে তারা দল বেঁধে এগিয়ে আসছিল। তাদের আলোচ্য কথার দু'-একটা টুকরো ললিতের কানে এসে

ঝঙ্কার তুলল। বসন্ত বলছিল: আজকের ভোগান্তির গোড়া হচ্ছে—ললিতে। সে হতভাগা চণ্ডীমণ্ডপে বসেছিল দেখিস্‌নি, তার মুখ দেখে যাত্রা করেছেই তো এই বিপত্তি!

দেবী অমনি মুখঝাপটা দিয়ে বলে উঠল: পরের পেছনে লাগতে তুমি ভারি ভালবাস বসন্তদা, চলছ চল না, এর মধ্যে ললিতদা'কে টানা কেন? সে বেচারী তো কিছু বলেনি।

বসন্ত অমনি রাধাকে লক্ষ্য করে বলল: শুনলি রাধা, কথা শুনেই দেবীর গায়ে বিঁধেছে!

রাধাও মুচকে হেসে বলে উঠল: একেই বলে—পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। আহা! দেবীর জন্তে আমার দুঃখ হচ্ছে।

দেবীও ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: থাক্‌, আমার জন্তে তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না। তোমাদের পাল্লায় পড়ে গতর তো চূর্ণ হতে বসেছে, এখন ভালয় ভালয় বাড়ী যেতে পারলে বাঁচি।

আগে আগে যে দুটি ছোকরা বাহক এক একটি ধামা মাথায় করে আসছিল, তাদের এক জন এই সময় জিজ্ঞাসা করল: আর কমনে যেতে হবে—এই ত বড় জাঙ্গালে এনু গো!

সামনে খোলা জায়গাটির উপর এই সময় বসন্তরও নজর পড়েছিল, সে চীৎকার করে উঠল: আর যেতে হবে না, ঠিকমত জায়গাই পেয়ে গেছি। রাধা দেখছিস, জঙ্গলের মধ্যে কেমন ঝাঁটপাট দেওয়া পরিষ্কার জমি—আমরা আসব জেনে কে যেন ঝাঁট দিয়ে রেখেছে।

দলের প্রত্যেকেরই মুখ দেখে বোঝা গেল যে, জায়গাটি সকলেরই মনে ধরেছে। বাহকদের পানে তাকিয়ে বসন্ত খর মেজাজে বলে উঠল: গন্ধমাদন মাথায় করে দাঁড়িয়ে রইলি যে! এখানে নামা—

বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে গিয়ে ধামাটি হাত দিয়ে ধরে সাহায্য করল। পর পর দুটো ধামাই নামান হলো। দলের সকলেই এগিয়ে এসে দাঁড়াতেই, বসন্ত সঙ্গী দুটি ভৃত্যের সাহায্যে ধামার ভিতর থেকে পাট-করা দুখানা ধূসর বর্ণের চট বার করে সেই খালি জায়গাটার ওপর বিছিয়ে দিল।

দেবী বলল : অ মা, আগে জায়গাটা ঝাঁট দিলে না—কত কি পড়ে আছে তার ঠিক নেই !

মুখখানা বিকৃত করে বসন্ত বলল : তাহলে ঝাঁটা-গাছটা সঙ্গে করে আননি কেন ? তখন তো মুখ বুজিয়ে ছিলে ?

কার্তিক নামে একটি ছেলে বলল : আর অত পিটপিটুনিতে কাজ নেই। নীচে যাই থাক, এখন তো চমৎকার হলো ; এসো বসা যাক—পা দুটো ধরে গেছে।

বলেই পায়ের জুতো খুলে ছেলেটি বিছানো রঙিন চটের উপর বসে পড়ল। তার দেখাদেখি আর সকলে পাশাপাশি বসে গেল।

রাধা বলল : একটু জিরিয়ে নিয়েই কিন্তু কাজে লাগতে হবে। হেবো, ভূতো তোরা দু'জনে ধামা থেকে জিনিসপত্র সব নামিয়ে গুছিয়ে রাখ।

বাহক দুই ভৃত্যই হচ্ছে হেবো ও ভূতো। পল্লীগ্রামের ছেলে, কায়দা-কানুন জানা আছে। তোলা উনুনটাকে আগেই চট থেকে একটু তফাতে রাখলে, গাছের একটা ডাল ভেঙে খোলা জায়গাটি ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে জিনিস-পত্রগুলি তার কাছেই গুছিয়ে রাখলে একখানা খবরের কাগজ পেতে।

ওদিকে গাছের উপরে পাশাপাশি একজোড়া ডালে দিব্যি জুত করে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে ললিত সব দেখছিল, আর কথাগুলিও শুনছিল। দেবীর কথা শুনে তার মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে—যেন এ মেয়েটি দল-ছাড়া, কোন দিক দিয়েই এদের সঙ্গে যেন তার খাপ খাচ্ছে না। ললিত আরো খুশি হয়েছে, একেবারে তার গাছটির সামনে ফাঁকা জমিটার ওপর বনভোজনের সরঞ্জাম সব নিয়ে তাদের বসায়। সে, জানে এত কাছে থাকলেও কেউ তার সন্ধান পাবে না, বরং এই ঘন ডালপাতাযুক্ত গাছটির ভিতরে অদেখা হয়ে বসে থেকে সে ওদের লক্ষ্য করতে পারে। আর যদিই জানতে পারে, গাছে আগে থেকেই সে বসে আছে, তাহলে এখানে কেউ তাকে বলতে পারবে না যে, চড়িভাতির গন্ধে গন্ধে এসেছে। সে তো অনায়াসেই বলতে পারে, ওদের অনেক আগে এখানে এসেছে, আর চালতা পাড়বার জন্যেই গাছে উঠেছে, নতুন জাঙাল হ'লে বরং কথা ছিল !

এদিকে তাড়াহুড়ো করেই ছেলে-মেয়েরা রান্নাবান্নার কাজে লেগে পড়ল। যোগাড়ে ছেলে দুটি ছিল খুব কাজের ; তারা দু'জনেই তৎপর হয়ে তোলা উনুনটি যথাস্থানে রেখে ধরিয়ে দিল। বাড়ী থেকেই উনুনটি সাজিয়ে রেখেছিল। বর্ষায় নদীর জল নোনা, তাই দুটো পাত্র ভরে পানীয় জলও আনা হয়েছে। উনুন ধরাবার জন্যে কয়লা, ঘুঁটে, কেরাসিনে সিক্ত করা পাটের ফেঁসো গুছিয়ে এনেছে। উনুন ধরে উঠতেই আগে আলুর দম তৈরী করা হবে স্থির হলো, তার পর মোহনভোগ ; মুড়ি সঙ্গে করে এনেছে। আলুর দমের আলুগুলিও বাড়ী থেকে খোসা ছাড়িয়ে কেটেকুটে আনা হয়েছে। পাকপাত্রে জল চাপিয়ে সিদ্ধ করতে দেওয়া হলো। রান্নার কাজে যাদের আগ্রহ এবং কিছু জানা-শোনা আছে, তারাই এগিয়ে গেলো। আলুর দম তৈরী হবার পরেই মোহনভোগ চড়ানো হলো। ক্ষুধায় তখন সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে ; পিকনিকের আনন্দে বাড়ীতে কোন রকমে দুটি ভাত মুখে গুঁজে এসেছিল— ছেলে-মেয়েদের স্বভাবই এই রকম, পিছনে একটা কিছু আনন্দময় অনুষ্ঠান থাকলে, তখন আর খাওয়ার দিকে লক্ষ্য থাকে না। কলাপাতাও কেটে-কুটে একই রকমের আয়তন করে গুছিয়ে আনা হয়েছে—নুন, ঘী, তেল, মশলা-পাতি, চিনি কিছুই বাদ পড়েনি।

মোহনভোগ তৈরী হয়ে গেলে প্রত্যেকের সামনে পাতা, আর কোঁচড়ে মুড়ি দেওয়া হতে লাগল। তখন সূর্য্য পশ্চিমে গড়িয়ে পড়েছে, অপরাহ্ণ এসে গেছে। পাতায় পাতায় যে পরিমাণ আলুর দম আর মোহনভোগ দেওয়া হলো, তাতে পেট ভরবার কথা। তৃপ্তির সঙ্গেই সবাই খেতে লাগল। সঙ্গের দুটি বাহকের জন্যও খাবার রাখা হলো। তারা কুণ্ঠার সঙ্গে জানাল যে, এদের খাওয়া হয়ে গেলে সবার শেষে খাবে। ছোট ছোট গেলাস প্রত্যেকেই বাড়ী থেকে সংগ্রহ করেছিল জল খাবার জন্যে। সেই গেলাসে জল দেওয়া হলো। অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি দেখা গেল না।

খেতে খেতে বসন্ত দলের রতন নামে ছেলেটিকে বলল : একটা কমিক গান ধর্ রত্না, তা না হলে ফূর্তি হচ্ছে না।

চর্বিত আহার্যটুকু উদরসাৎ করে রতন বলল: খাবার গানই যদি গাইলে, খেতে খেতে লাগবে ভালো।... বলেই রতন সুর করে গান ধরল:

জামাই, ভাত খাবি আয়, অনামুখো আনাড়ী।
রেঁধেছি, তোরই তরে আজ নতুন তরকারী।
নোড়া ভাতে, কাস্তে ভাজা, কোদাল চড়চড়ি,
তার ওপরে ইটের ডালনা, ঘুঁটের তক্তো, লোহাচাক্তির কারি।

ছেলেরা গান শুনে হল্লোড় করে উঠল; 'এন্‌কোর' দিতে লাগল। কিন্তু মেয়েরা মুখ ভার করে অনাস্থা জানাল। দেবী মুখখানি বেঁকিয়ে বলল: আহা, গানের কি ছিরি!

দেবীর কথা শুনেই বসন্ত সহর্ষে বলে উঠল: ললতেকে নিয়ে আমি একখানা গান বেঁধেছিলাম; মনেই ছিল না—এখন গাই, তোরা শোন।

দেবী বলল: আবার সে বেচারীকে নিয়ে টানাটানি কেন? কথা যখন নেই তার সঙ্গে, তাকে নিয়ে গান বাঁধবে কেন?

বসন্ত বলল: গানটা শুনে তুই তাকে শোনাবি, তাই। বুঝলি?

ঝঙ্কার দিয়ে দেবী বলল: বয়ে গেছে আমার—আমি এতে নেই।

গাছের ডালে বসে ললিত দেবীর কথাগুলি শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠে। এখানে তাকে নিয়ে যে সব কথা হয়, তাতে দেবীর কথাগুলি শুনে সে বুঝতে পারে, তার ওপর দেবীর দরদ কতখানি! এখানে আসার সময় হরগৌরীর মন্দিরে বসে সে-ও ঠাকুরের কাছে যে মিনতি করে এসেছে, তিনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, নইলে এমন হয়? তার চিন্তা এই সময় ভেঙে যায় বসন্তর কর্কশ গানে। সে তখন গলা চড়িয়ে গান ধরেছে:

ললতে এসে এমন কামড়
দিল যে আমার পায়।
কামড়ের চোটে মাংস কেটে
দাঁতগুলো সব বসে যায়।
দেখিয়া দুঃখে দেবী তখনি
আমারে ডাকিয়া কয়—

তুমি কেন দাদা ছেড়ে দিলে তারে

পালটে কামড় না দিয়ে তায়॥

শুনে আমি বলি—

কিন্তু আর বলা হলো না, যুগপৎ দুটো বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যাওয়ায়। এদের আসর থেকে একটু দূরে রেবো ও ভুতোর খাবার খোলা অবস্থায় পড়েছিল, সে দিকে কারও লক্ষ্য নেই—সবাই বসন্তর পানে তাকিয়ে সকৌতুকে তার গান শুনছিল; গানের ঐ কথায় আসতেই উপর থেকে প্রকাণ্ড একটা চিল পাক মেরে এসেই যেমন সেই খাদ্যের উপর পড়েছে, তখনি বলের মত সবেগে নিক্ষিপ্ত একটি চালতা বসন্তর মুখখানার উপর আঘাত করে সেখান থেকে ঠিকরে পিতলের ডেকচির গায়ে লাগতেই একটা আওয়াজ উঠল; সঙ্গে সঙ্গে চিলটাও সভয়ে তীক্ষ্ণ আর্তস্বর তুলে তেমনি পাক মেরে উড়ে পালাল। চিলের স্বরের সঙ্গে বসন্তর আহত কণ্ঠের স্বর সকলকে এমনি ত্রস্ত করে তুলল যে, খেতে খেতেই চীৎকার করে সবাই উঠে দাঁড়াল। বসন্তই একা উঠতে পারেনি, আঘাতটা পেয়েই 'উহুহু!' শব্দ তুলে মুখখানা চেপে ধরেছিল।

কিন্তু এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে চিলটাও চীৎকার তুলে উড়ে যাওয়ায় এরা অনেকটা আশ্বস্ত হলো; বুঝল যে, কোন রকম ভৌতিক কাণ্ড নয়, চিলটা খাদ্যপাত্রগুলো খোলা দেখে, তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেটা দেখতে পেয়েই কেউ চালতা ছুঁড়ে মারতেই ভয় পেয়ে উড়ে পালিয়েছে। কিন্তু চালতাটি কে ছুঁড়েছিল, সেটির আর মীমাংসা হলো না। এদিকে বসন্তর মুখখানা দেখতে দেখতে ফুলে উঠল, রীতিমত যন্ত্রণাও সে অনুভব করছিল।

এর পর গান ত বন্ধ হয়েই গেল, খাওয়ার পাট প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, কিন্তু আর কেউ ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য নিয়ে বসতে রাজী হলো না। দেবী বসন্তর মুখখানার পানে তাকিয়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল: দেখলে ত বসন্তদা, মিছিমিছি পরের খোয়ার করতে গেলে নিজের খোয়ার আগে হয়!

রাধা এবং আরও দু'-তিনটি ছেলে-মেয়ে তখন বসন্তর আহত ফুলো মুখ-

খানার পরিচর্যা করছিল; দেবীর কথার জবাব দিতে পারল না, তা ছাড়া জবাব দেবার মত সামর্থ্যও তার ছিল না তখন। রাখাই চোখ পাকিয়ে দেবীর পানে তাকিয়ে বলল: খুব হয়েছে—থাম!

এখন কথা উঠল যে, চিল যেন খাবার দেখে ছোঁ মারতে এসেছিল, কিন্তু চিলটাকে তাগ করে কে এমন করে চালতা ছুঁড়ে মারল?

কেউ বলল: চিল আগে চালতাটি গাছ থেকে ছোঁ মেরে তুলেছিল, চালতাটা পা থেকে ফসকে বসন্তের গালে পড়ে, চিলও সঙ্গে সঙ্গে খাবারের উপর পড়তেই, চালতাটা ঠিকরে গিয়ে ডেকচির গায়ে লাগে। তারই শব্দে চিলটা পালায়।

এই যুক্তিই সম্ভব ভেবে আর সকলে তর্কে নিরস্ত হলো। ওদিকে গাছের ডালে বসে ললিত ছোকরাও তখন ভেবেই অস্থির, রাগের বশে এ কি কাণ্ড সে করে বসেছে! যদি চালতাটি বসন্তর চোখে পড়ত, তাহলে ত তার একটা চোখই নষ্ট হয়ে যেত! যাক্, অল্পের ওপর দিয়ে এই যে শিক্ষা, এ ঠাকুরই দিয়েছেন ওকে। ললিত তার বাবার কাছে শুনেছিল, কারও অসাক্ষাতে তার নিন্দা বা কুৎসা করতে নেই, যা কিছু বলবার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে। ললিতের মনে হলো, কিন্তু সে-ও যে আড়াল থেকে বসন্তকে চালতা ছুঁড়ে মেরেছে, এও ত তাহলে সে অন্যায় করেছে। কিন্তু তখনই মন থেকে কে যেন বলে দেয়, খেতে বসে বসন্ত যে ভাবে বাড়াবাড়ি করছিল, ঠাকুরই তাকে শাস্তি দিয়েছেন, ললিত তার উপলক্ষ মাত্র। অগত্যা, ললিত এতে যেন তৃপ্তি পেল।

ওদিকে কথা উঠল, এখন কি করা যাবে? খাওয়া-দাওয়া তো এক রকম হলো, কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে সব দেখবার, আর লুকোচুরি খেলবার যে কথা ছিল, তার কি হবে? তাহলে বন্ধ থাক।

কিন্তু আহত অবস্থাতেই বসন্ত বলে উঠল: না, না, বন্ধ থাকবে না, তাহলে নিন্দায় কান পাতা যাবে না। খেলা হবেই।

কিন্তু দেবী বলল: আমি কিন্তু আর বনের ভেতরে যেতে পারব না, ওখানে পড়ে গিয়ে ভারি ব্যথা হয়েছে, আমি ছুটতে পারব না একবারে।

তার চেয়ে আমাকে বরং এখানে 'বুড়ি' করে বসিয়ে তোমরা খেল গে! আমি ঠিক বলে দেব, কে আগে এসে আমাকে ছুঁয়েছে।

প্রস্তাবটা বসন্তর পছন্দ হলো। নিজের ব্যথায় সে দেবীর ব্যথাটা উপলব্ধি করছিল। তারও কি এখন দৌড়াবার কথা, কিন্তু সে যখন নিজেই এ খেলার কল্পনা দিয়েছে, তখন সেও নিজে খেলায় যোগ না দিলে খেলা জমবে না—কেউ মন দিয়ে খেলবে না। অগত্যা তাকে বলতে হলো: এ কথা মন্দ নয়।

কিন্তু রাধা বলল: তা যেন হলো, কিন্তু এখানে ও একলাটি থাকতে পারবে?

কথাটা ভাববার মত বটে, শুনেই দেবীর বুকটা কেঁপে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হেবো ও ভূতো এ সমস্যার সমাধান করে দিল। তারা এ সময় দু'জনেই খেতে বসেছিল। খেতে খেতেই বলল: ভয় কিসের, আমরা তো রয়েছি। খাবার পর এখানকার সব গোছগাছ করে নিতে হবে না?

ঠিক কথাই ত ওরা বলেছে। তবে আর দেবীর কোন ভয় নেই জেনে, দলের আর সকলে নদীর দিকে যে পথ পড়েছিল, সেই পথ ধরে এগিয়ে গেল।

হেবো ও ভূতোর খাওয়া তখন হয়ে গেছে। তারা উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি একত্র করে ধামায় তুলে বলল যে, নদী থেকে সেগুলি ধুয়ে মেজে আনতে চলল, দেবী দিদিঠাকরুণ ততক্ষণ বরং চটের উপর শুয়ে একটু গড়িয়ে নিন, ব্যথাটা তাতে কমবে।

দেবী বলল: আমি এখানে শুতে পারব না, বসেই থাকব। তোমরা কাজ সেরে শীগ্‌গির এস।

গাছের ডালে বসে ললিত সবই শুনছিল, আর মনে মনে ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল, তিনিই এমন সুযোগ ঘটিয়ে দিলেন বলে। এর পর খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সে গাছ থেকে নেমে পড়ল। গাছের গায়ে লাগানো লতানে কাঁটা-গাছটি সরিয়ে দিল—যাতে এর পর আবার সে গাছের দিকে আসতে পারে। অল্প বয়স হলেও ছেলেটির বুদ্ধি-বিবেচনা যথেষ্ট ছিল। আচমকা এসে দেবীকে ভড়কিয়ে দেবার মত কিছু করলে পাছে সে চীৎকার করে ওঠে, আর তাই শুনে হেবো ও ভূতো এসে পড়ে, তাই সে দিক দিয়ে না

গিয়ে তার সঙ্কল্পটি তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে একেবারে সে দেবীর সামনে এসে দাঁড়াল। দেবীর তখন একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল; কিন্তু ললিতের পদশব্দে চোখ মেলে চেয়েই প্রথমটা সে চমকে উঠল, তার পরই অপ্রত্যাশিত উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল: ললিতদা'। তুমি?

দেবীর সম্ভাষণে আনন্দে অভিভূত হয়েও ললিত নিরুত্তরে আঙুলটি তুলে ঠোঁটের উপর চেপে ধরে যে ইঙ্গিত করল, তার অর্থ—চুপ!

দেবী কিন্তু ধড়মড় করে উঠে ললিতের সামনে ছুটে গিয়ে দু'হাতে তার হাত দু'খানি ধরে ব্যগ্রকণ্ঠে আবার বলল: তোমাকে দেখে আমার যে কি আহ্লাদ হচ্ছে! তুমি আমাকে বাড়ী নিয়ে চল ললিতদা'! পথে যেতে যেতে সব বলব তোমাকে—ভারি মজার কথা!

ললিত বলল: কিন্তু তুমি যে আড়ি দিয়েছ দেবী! আমি কি করে—

থপ করে ডান হাতখানা সরিয়ে নিয়ে তার বিশেষ একটি আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল: এই ছাখ—কেমন, এখন ত ভাব হয়ে গেল! আমি আড়ি দিয়েছিলুম, আবার আমিই যেচে ভাব করলুম। এখন চলো।

ললিত বলল: না, বাড়ী এখন যাওয়া হবে না, একটা মজা করতে হবে, ওরা এখানে এসে পড়বার আগে আমরা লুকাব। ওদের চেয়েও আমাদের লুকচুরি খেলা বেশী জমবে।

বিস্ময়ানন্দে দেবী জিজ্ঞাসা করল: কোথায় লুকাব আমরা? ওরা তো এখুনি এসে পড়বে।

ললিত তাড়াতাড়ি বলল: আমি যেখানে এতক্ষণ লুকিয়েছিলুম! সেখান থেকেই ত বসার গালে চালতা ছুঁড়ে মেরেছিলুম, কেউ টেরও পায়নি যে আমার কাজ!

আনন্দে সচকিত হয়ে দেবী বলে উঠল: অ-মা! তুমিই ও কাণ্ড করেছিলে? আমরা ভেবেছিলুম—চিল ফেলেছিল!

ললিত বলল: তোদের যেমন বুদ্ধি! চিলে কখনো চালতা ফেলে? চিল গেসল ডেকচি থেকে খাবার নিতে। একসঙ্গেই পড়েছিল চিল আর চালতা—বুঝলি? এখন শীগ্‌গির আয়।

আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে দেবীর হাতখানি খপ করে ধরে ললিত যে পথে এসেছিল, খুব সন্তর্পণে দেবীকে নিয়ে সেই পথ দিয়ে চাল্‌তাগাছটির তলায় এসে দাঁড়াল। গাছের পানে তাকিয়েই দেবী চমকে উঠে বলল : অ-মা—এই ত চাল্‌তা গাছ !

অনুজ্ঞার সুরে ললিত বলল : চুপ ! এখন আমি যা বলব করতে হবে মুখ বুজিয়ে, কোন কথা নয় ; এর পর গাছের ওপরে উঠে কথা হবে।

গাছের দিকে চেয়ে দেবী জিজ্ঞাসা করল : আমাকেও গাছে উঠতে হবে ? বুঝিছি, তুমি গাছে উঠে লুকিয়েছিলে !

ধমক দিয়ে ললিত বলল : আবার কথা বলে ! হাঁা, গাছে তোকে উঠতে হবে, কতবার ত আমার সঙ্গে উঠেছিস্ ; ভয় নেই, আমি উঠিয়ে দেব, তুই কেবল হাত বাড়িয়ে মাথার কাছের ডালটা ধরবি।

দলের মেয়েরা কেউ জুতো পায়ে দিয়ে আসেনি, পল্লী-অঞ্চলের বালিকা-মহলে তখনো জুতার চলন হয়নি। সুতরাং খালি পা থাকায় দেবীর পক্ষে গাছে ওঠা কঠিন হলো না, বিশেষ করে পিছনে থেকে ললিতের মত এ কাজে পরিপক্ক ছেলে যখন সাহায্য করছিল। ললিতও সুবিধার দিকে চেয়ে পায়ের জুতো-জোড়াটি খুলে ছাতার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিল জুতোর লম্বা ফিতের সাহায্যে।

উপরে উঠেই সুবিধামত আগে দেবীকে বসিয়ে তার পর ললিত তার পাশে এমন ভাবে বসল, কোন রকম অসুবিধা হ'লে দেবীকে যাতে সামলে নিতে পারে। বেশ স্বচ্ছন্দে বসে পিছনের ডালটিতে পিঠের ঠেস দিয়ে দেবী বলল : তুমি ত আচ্ছা ছেলে ললিতদা' !

ললিত একটু গম্ভীর হয়ে বলল : নৈলে কি তুই আড়ি ভেঙে ভাব করতে আসিস্ সেধে !

ফোঁস করে উঠল দেবী কথাটা শুনে ; বলল : যাও ! আমি যেন ইচ্ছে করে আড়ি দিয়েছিলুম ! ঐ রাধি আর বসাদা'ই ত যত নষ্টের গোড়া !

ললিত হেসে বলল : সেই জন্তেই ত বসার দাঁতের গোড়ায় চালতার ঘা দিয়েছিলুম রে ! রাধির শাস্তিও তোলা আছে।

দেবী কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সমস্ত জঙ্গল কাঁপিয়ে আকাশভেদী একটা ভীষণ শব্দে চমকে উঠে সভয়ে উভয় হস্তে সে পার্শ্বোপবিষ্ট সাথীটিকে জড়িয়ে ধরল। ললিতও চমকে উঠেছিল, কিন্তু তখনি সামলে নিয়ে বলল: মেঘ ডাকল, বোধ হয় এই বনেই কোথাও বাজ পড়ল।

দেবী বলল: অ-মা, বিষ্টিফিষ্টি কিছু নেই, তবুও বাজ পড়ল! তুমি বলছ, এই বনেই কোথাও পড়েছে! কিন্তু ওরা বনেই সেঁধিয়েছে খেলতে। তাহলে কি হবে?

ললিত বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল: ওরা আর কদ্দূর বা গেছে—দু'দিন গেলেও এ বনের শেষ হয় না। আর মেঘ যখন অমন করে ডেকেছে, বৃষ্টিও নামল বলে!

দেবী বলল: তাহলে কি হবে—আমরা গাছে বসে ভিজব দুটিতে?

ললিত বলল: ভিজতে আজ সবাইকে হবে। আমি তবু ছাতি এনেছি, তোকে ভিজতে দেব না। কিন্তু ওরা না ফিরলে তো আমাদের নামা হবে না! তার পর এখানে এসে তোকে দেখতে না পেয়ে ওরা কি করে, এখানে বসে সেটা জানতে পারাই ত মজার কথা রে! চুপ্—হেবো ভূতো আসছে।

দেবী বলল: ঐ খ্যাখ ললিতদা', বিষ্টিও এসেছে—অ-মা, কি বড় বড় ফোঁটা গো!

ললিত মুখখানা কঠিন করে বলল: একদম চুপ! নৈলে ধরা পড়তে হবে।

পাকপাত্র ও আনুষঙ্গিক বস্তুগুলি নদীর জলে মেজে-ঘষে ধামায় ভরে এই সময় হেবো ও ভূতো ফিরে এল। হঠাৎ বৃষ্টি আসায় তারা ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, চটের আস্তরণ দুটো তুলে ফেলতে হবে যাতে বৃষ্টির জলে ভিজে না যায়। ভেবেছিল, দেবী দিদিমণি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে তুলতে হবে আগে। কিন্তু যথাস্থানে এসে পাতা চট খালি পড়ে আছে দেখে দু'জনেই আশ্চর্য হয়ে গেল—তাই ত, কোথায় গেল দিদিমণি, এদিকে বৃষ্টি এসে গেছে! চট দু'খানা গুটোবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জোর গলায় দেবী দিদিমণিকে ডাকতে লাগল। ওদিকে গাছের ডালে পাশাপাশি বসে দুটি বালক-বালিকার কি চাপা হাসি! ললিত হেঁট হয়ে দেবীর কানে কানে চুপি চুপি বলল: কেমন মজা!

এমনি সময় তীব্র একটা অগ্নিরেখা ফুটিয়ে সেই সঙ্গে পূর্ববৎ সমস্ত বনভূমি কম্পিত করে আবার বজ্র-নির্ঘোষে মেঘ গর্জন করে উঠল। সে শব্দে উত্তরের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল মুখে, ভয়ে দেবী ললিতের হাত দুখানা চেপে ধরল।

ওদিকেও এই সময় বিভিন্ন কণ্ঠের ধ্বনি তুলে খেলুড়ে দলটি ফিরে এল; বৃষ্টির জলে তাদের জামা-কাপড় ভিজে গেছে, ঠাণ্ডার পরশ পেয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে প্রত্যেকে। আর, হেবো ও ভূতো ধামা দুটিকে গাছের আড়ালে রেখে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে দেবী দিদিমণির সন্ধান করছিল তখন।

দলের আর সকলে ব্যাপার বুঝে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। বসন্ত একান্ত বিরক্ত হয়ে বলল: এই দুর্যোগে কোন্ চুলোয় গেল সে! তোরা দেখিস্নি?

হেবো, ভূতো স্পষ্ট কথাই বলল যে, নদী থেকে এসে আর দিদিমণিকে দেখতে পায়নি, সেই জন্যেই ত ডাকছিল তাকে।

ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝে প্রত্যেকের মুখেই আশঙ্কার ছায়া পড়ল। একসঙ্গে তারা সবাই আমোদ করতে এসেছে; এখন তাকে ফেলে কি করে বাড়ী ফিরে যাবে? আর সে মেয়েরই বা কি আক্কেল—একলা গেল কোন্ চুলোয়?

রতন বলল: বৃষ্টি নামতেই হয়ত ভেজবার ভয়ে পালিয়েছে—যদি কোথাও মাথা বাঁচাবার জায়গা পায়, তাই খুঁজছে হয়ত।

রাধা বলল: এখন যে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা ভিজে সারা হলুম। তার চেয়ে এক কাজ করি এস; তাকে খুঁজতে খুঁজতেই বাড়ী ফিরে যাই।

রাধার কথাই সাব্যস্ত হলো। বনের অন্য দিক থেকে তারা আসছে, পথে তাদের সঙ্গে দেখা যখন হয়নি—ওদিকে যায়নি নিশ্চয়ই। তাহলে গাঁয়ের দিকেই যাওয়াই ভাল।

বৃষ্টি তখন খুব জোরে চেপে এসেছে; কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে ঠায় ভেজার চেয়ে বৃষ্টি মাথায় করে এগিয়ে যাওয়াই তারা উচিত বিবেচনা করে পা টিপে টিপে চলতে লাগল।

গাছের ডালে উপবিষ্ট দুটি প্রাণীর তখন কি আনন্দ! দেবী বলল: তুমি ঠিকই বলেছিলে ললিতদা' ভারি একটা মজা দেখাবে।

ললিত বলল: এই ত মজা রে! তোকে খুঁজছে, তোর কথা বলছে, আর তুই কাছে থেকেই সব শুনছিস্—ওরা জানতেও পারছে না! আমার পিছনে লাগার কেমন শাস্তি! জানিস দেবী, আসবার সময় আমি হরগৌরীর মন্দিরে মানত করে এসেছি—যেন আমাদের ভাব হয়ে যায়। তাহলে আমরা ফেরবার সময় দু'জনেই ঠাকুরকে নমো করে যাব।

দেবী বলল: বেশ হবে, কত দিন ও মন্দিরে যাইনি; কেবল সেই নীলের দিন মা'র সঙ্গে গেসলুম। তাহলে চল ললিতদা'—

ললিত বলল: চল বললেই কি চলা যায় রে পাগলী! দেখছিস্ না, কি রকম বৃষ্টি হচ্ছে! ওরা যেমন বোকা, গাছের তলায় না দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে চলল! কিন্তু আমরা ভিজিছি? ঐ ছাখ বড় বড় পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়ছে, আমাদের গায়ে এমন কি লেগেছে? যাক্, এখন বল ত শুনি; তোরা নতুন জাঙ্গালে চড়িভাতি না করে এখানে এলি কেন?

দেবী তখন তাদের সেই দুর্গতির কথা আগাগোড়া ললিতকে শুনিয়ে দিল। শুনতে শুনতে উৎফুল্ল মুখে ললিত বলল: জানিস দেবী, এটা হলো ওদের পাপের ফলে। আমি যে ঠাকুরকে জানিয়েছিলুম, কোন দোষ আমি করিনি, তবু আমাকে দল ছাড়া করলে, তোর সঙ্গে আড়ি দেওয়ালে, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে দল বেঁধে চড়িভাতি করতে এল, কিন্তু কেমন দুর্গতি হলো বল্?

দেবী উজ্জ্বল দৃষ্টি ললিতের মুখে নিবদ্ধ করে বলল: তুমিও কি সাধারণ ছেলে ললিতদা'! যে কাণ্ড করেছ ওদের অজানতে, এর পর শুনলে থ হয়ে যাবে।

ললিত বলল: হ্যাঁ, তখন ওদের মানতে হবে, যাকে বাদ দিয়ে লুকুচুরি খেলতে গেসল, সেই সত্যিকার লুকুচুরি খেলেছে।

খানিক পরেই বৃষ্টি ধরে গেল। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে তখন চার দিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কথায় কথায় এরা সেটা লক্ষ্য করেনি। আগেকার মতই সন্তর্পণে দেবীকে নীচে নামিয়ে আনে ললিত। তার পর ঘন বনটুকু পার হয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াতেই দেবী সহানুভূতির সুরে বলল: এইখানে বসে গিললুম,

যদি জানতুম তুমি কাছেই আছ, তাহলে তোমাকে না খাইয়ে খেতে পারতুম? সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে ললিতদা'।

ললিত আনন্দে দেবীর হাতখানি ধরে বলল: তোর কথা শুনেই আমার খাওয়া হয়েছে। সত্যি, অনেকক্ষণ ত খাইনি, কিন্তু কিছু কষ্ট হচ্ছে না।

দেবী বলল: দেখছ, কি রকম অন্ধকার, এখন যাব কি করে?

জুতো-জোড়াটি পায়ে দিয়ে ছাতিটা খুলে দেবীর মাথায় ধরে ললিত বলল: এখনো ঝির্-ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছে, একটা ছাতিতে দু'জন ত ধরবে না, তার চেয়ে তোর মাথায় ধরি, যাতে না ভিজে যাস্।

দেবী বলল: তাহলে ত তুমিই ভিজবে?

ললিত মাথা নেড়ে জানাল: আমাদের জলে ভেজা অভ্যেস আছে। তবে অন্ধকার হয়েছে এই যা ভয়! কিন্তু পথ আমার জানা আছে। বলেই ছাতাখানি দেবীর মাথার উপর এগিয়ে দিয়ে তার একখানি হাত ধরল ললিত। তার পর সেই পিচ্ছিল বনপথে দুটিতে এগিয়ে চলল। ক'দিন যে-সব কথা চাপা পড়েছিল, এখন জলের ফোয়ারার মত ছড়িয়ে পড়ল।

পথে যেতে যেতে অনভ্যস্ত পদে দেবী বার বার পতনোন্মুখী হলেও তার অতিমাত্রায় সতর্ক সাথীটির জন্য সে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। অমনি নতুন জাঙ্গালের পথে পা-পিছলে পড়বার কথা দেবীর মনে পড়ল। অতগুলো ছেলে-মেয়ে ত আশে-পাশে ছিল, কেউ কি এমনি যত্নে তার হাতখানি ধরেছিল! কিন্তু এই ললিতদা' যদি থাকত সঙ্গে, তাহলে—

ক্রমে তারা মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হলো। সন্ধ্যার আগেই পুরোহিত মন্দিরের পাট সেরে চলে গেছেন। বাইরে জুতো খুলে নিরাপদ স্থানে রেখে রুদ্ধ দরজা ঠেলে তারা ভিতরে প্রবেশ করল। ঘরের কোণে একটি মাটির দেরকোর ওপরে রাখা তেল-ভরা প্রকাণ্ড প্রদীপটি তখনো জলছিল। দু'জনেই একসঙ্গে অবনত হয়ে হরগৌরীকে প্রণাম করে সামনেই পাশাপাশি বসল। হঠাৎ ললিত দেবীর পিঠে হাত দিয়েই বলল: এ কি রে, তোর পিঠের দিকটা যে একেবারে ভিজে গেছে—বলিসনি ত আমাকে?

দেবী বলল : বললে কি করতে ? বরং আসতে আসতে অনেকটা শুকিয়ে গেছে। তোমার জামাটাও ত ভিজে গেছে, তবে ?

চিন্তিত ভাবে ললিত বলল : না, না, ভিজে কাপড় গায়ে থাকলে অসুখ করবে। আমি জামা খুলে ফেলছি, তুইও আঁচলটা খুলে সামনে বাতাসে মেলে দে—এখুনি শুকিয়ে যাবে।

বলেই ললিত জামাটা খুলে সুবিধামত স্থান দেখে শুকোতে দিল। অগত্যা দেবীকেও গায়ের কাপড় খুলতে হলো। পাঁচ বছরের বালিকা, কিন্তু রক্ষণশীল পরিবারের এমনি কঠিন সংস্কার যে, এই বয়সেই সুপরিচিত একটি বালকের সামনে স্বেচ্ছায় সিক্ত অঞ্চলখানি গা থেকে সরাতে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে!

এই অবস্থায় দু'জনে দেবতার সামনে বসে একবার পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করল। সহসা ললিতের দেহটা শিউরে উঠল—সে যে ঠাকুরের কাছে মানত করেছিল। যে জন্য মানত, তা সিদ্ধ হয়েছে ; যাকে পেতে চেয়েছিল, সে-ও ধরা দিয়েছে ; এখন তাকেই সঙ্গে করে ঠাকুরের সামনে এসে বসেছে সে। সুতরাং তারও কর্তব্য আছে বৈ কি! তখনি ছোট ছোট হাত দুখানি যোড় করে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা নিবেদন করল : আমার কথা তুমি রেখেছ ঠাকুর, আমিও আমার কথা রাখতে এসেছি। দেবীর সঙ্গে আর আমার আড়ি নেই—ভাব হয়ে গেছে। তাই তাকে নিয়ে তোমাকে গড় করতে এসেছি।

বলতে বলতে দেবীর সুকোমল কণ্ঠের উপর হাতের বেড়টি দিয়ে নিজের মাথার সঙ্গে তার বেণীবদ্ধ মাথাটি ঠাকুরের পিঠের সামনে নত করে দিল। ললিতের মনের পুলক বুঝি দেবীরও সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে তাকেও বিহ্বল করে তুলেছে তখন।

ঠিক এই অবস্থায় ললিত আর এক কাণ্ড করে বসল। সে জানে, এ ভাবে ঠাকুরকে আত্মসমর্পণ করলে, পুরুত ঠাকুর তখনি দেবী-পীঠ থেকে প্রসাদী মালা তুলে ভক্তের গলায় পরিয়ে দেন, তা সে পুরুষ-নারী বা বালক-বালিকা যেই হোক। ললিতও তৎক্ষণাৎ দেবী-পীঠ থেকে এক ছড়া তাজা রজনীগন্ধার মালা তুলে দেবীর গলায় নীরবে পরিয়ে দিল।

দেবী প্রথমে চমকে উঠল যদিও, কিন্তু পরক্ষণে কি ভেবে সেও হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে দেব-পীঠ থেকে ঠিক ঐ রকম আর এক ছড়া মালা তুলে ললিতের গলায় পরিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলল: যা রে ছেলে, নিজেই জিতে যাবে—এখন শোধ-বোধ!

মন্দিরের বাইরে ইতিমধ্যেই যে বহু লোকের সমাগম হয়েছিল, মন্দিরের ভিতর উপবিষ্ট বালক-বালিকা তা জানতে পারেনি। পিকনিকের দলটি গ্রামে ফিরে গিয়ে দেবীর নিরুদ্দেশের কথা জানাতেই, দেবীদের বাড়ীতে ও পাড়ায় রীতিমত হাঁকাহাঁকি পড়ে যায়। সে সময় ললিতের বাবা এসে বলেন, ললিতকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, দুপুরের পর কোথায় গেছে কেউ জানে না। এদিকে দেবীর সঙ্গে ললিতের অসদ্ভাবের কথাটাও পাড়ায় অজ্ঞাত ছিল না। সমগ্র পল্লীর আনন্দস্বরূপ এমন দুটি বালক-বালিকার নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা সকলকেই চিন্তান্বিত করে তোলে। তৎক্ষণাৎ সকলে দলবদ্ধ হয়ে লণ্ঠন ও মশাল জ্বেলে গ্রাম্য পুরোহিতকে সঙ্গে করে অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন।

হরগৌরী মন্দিরের কাছে এসে তার বিস্তীর্ণ চাতালে সকলে বিশ্রাম করতে বসলেন। এই অবসরে দেবদর্শনের আকাঙ্ক্ষাও কতিপয় প্রবীণ ও প্রৌঢ়কে প্রলুব্ধ করল। তার ফলে, পুরোহিত, পশুপতি ও বগলাপদ মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলে উন্মুক্ত করতেই তিন জোড়া চক্ষু এক সঙ্গে বিস্মিত ও বিস্ফারিত হয়ে উঠল ভিতরের দৃশ্যটি দেখে!

যে দুটি বালক-বালিকার সন্ধানের জন্য তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে এত দূরে এসেছেন, তারা দুটিতে এই দুর্যোগের রাতে নির্জন মন্দির-কক্ষে প্রসন্ন মুখে পাশাপাশি বসে আছে—উভয়ের গলাতেই দুলছে রজনীগন্ধার মালা!

৬

পিকনিকের দলটি রীতিমত একটা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক নিয়েই পাড়ায় ফিরেছিল। বাড়ীতে এসেই শুনল—কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে, তাছাড়া দুপুর থেকে ললিতেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রত্যেককেই অভিভাবকদের সামনে নানা রকম জেরার সম্মুখীন হতে হয়। মোটামুটি খবরটা শুনে এবং এ-দল থেকে দুই খিৎমৎদার হেবো ও ভূতোকে নিয়ে গ্রাম্য মাতব্বরগণ লণ্ঠন ও মশাল জেলে জাঙ্গালে সন্ধানের জন্য রওনা হলেও, দলের ছেলে মেয়েগুলি একেবারে যেন ভেঙে পড়ার মত হয়ে ওঁদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। বাচ্চাগুলি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও বসন্ত, রতন, রাধা, শান্তি প্রমুখ চাঁইয়েরা চণ্ডীমণ্ডপে এসে জমায়েত হয়, এদের পেয়ে সেখানকার ভাঙা মজলিস আবার জমকে ওঠে। পাড়ার সবাই ত আর অনুসন্ধানের জন্য দলে যোগ দেয় নাই—চড়িভাতির দলের চাঁইগুলিকে চণ্ডীমণ্ডপে হাজির দেখে তাদের মজলিসী মন দুলে ওঠে।

রাত তখন বেশীও হয়নি, গ্রামাঞ্চল নিশুঁথি হতে অনেকটা বাকি। এমনি সময় সন্ধানী দল কৃতকার্য হয়ে বহু কণ্ঠের কলরবে পল্লীপথ মুখরিত করে চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে এলেন। পল্লীর দুটি বলিষ্ঠ যুবকের স্কন্ধে ললিত ও দেবী বিহসিত মুখে বসে আছে—তখনো পর্যন্ত তাদের গলায় ঝুলছে রজনীগন্ধার মালা। মজলিস ভঙ্গ করে মজলিসীরা দাওয়ার উপর এগিয়ে এসেছিল। সন্ধানকারীরা বারংবার নতুন করে ঘোষণা করছিলেন—জাঙ্গালে তাঁদের যেতে হয়নি, হর-গৌরীর মন্দির থেকেই জ্যান্ত হর-গৌরীকে যে অবস্থায় পেয়েছেন, সেই অবস্থায় তুলে এনেছেন।

কথাটা শুনে এবং স্বচক্ষে তাঁদের কথিত হর-গৌরীকে দেখে চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসীরাও সহর্ষে হর-গৌরীর নামে জয়ধ্বনি দিল বটে, কিন্তু বসন্ত রাধা প্রমুখ চাঁইগুলির মুখ সব এক সঙ্গে যেন কালো হয়ে গেল। এরা অবাক হয়ে

তখন ভাবছিল, তাদের এতগুলো চোখে ধূলো দিয়ে ললিত কি করে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, আর দেবীর সঙ্গেই বা মিশে মন্দিরে পালিয়ে এসেছিল ? হায়—হায়, তারা ওদের চালে মাত হয়ে গেল—ললতেই জিতে সব ভেস্তে দিলে !

সেই রাতে পশুপতি ও বগলাকে পরিবেষ্টন করে চণ্ডীমণ্ডপের প্রশস্ত আঙিনায় পল্লীর বিভিন্ন বয়সের প্রৌঢ় ও যুবকগণ আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এ ঘটনা হর-গৌরীর ইচ্ছাতেই হয়েছে—দেব-দম্পতির জোর-ধরেই হয়েছে এর সৃষ্টি, এ যেন গোড়া থেকেই গড়ে দিয়েছেন ওঁরা ! খবরদার ! যেন পরে না ভাঙে—ছাড়াছাড়ি না হয়।

বগলাপদ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে তাকাতেই পশুপতি প্রসন্নমুখে বলে ওঠেন : পাগল ! আমার স্ত্রী এখন থেকেই সম্বন্ধটাকে পাকিয়ে ফেলেছেন ; বগলা ভায়া কি বল ?

বগলা বললেন—আমি হচ্ছি মেয়ের বাপ, সে দিক দিয়ে প্রার্থী বইত নই ! তবে বলি, আমার স্ত্রীও মনে মনে গেরো দিয়ে রেখেছেন। তারপর, এ যেন দৈবী কাণ্ডের মত তাক লাগিয়ে দিচ্ছে—ভাঙতে কখনো পারে না।

অন্যতম প্রবীণ প্রতিবাসী সত্য ঘোষাল সন্ধানী দলের সঙ্গে না গেলেও উৎকণ্ঠিত ভাবেই প্রতীক্ষা করছিলেন। এই সময় তিনিও চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসছিলেন, বগলার কথাগুলি দূর থেকেই তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল, কাছে এসে তিনিও বললেন : পারে নাই ত ! এ কি বড় সাধারণ কথা—আমি ত শুনে অবাক ! তাই বলছি—এই দুটো খোকা খুকীকে উপলক্ষ করে এই গ্রামেই তোমরা হরগৌরীর লীলা দেখবে।

কথাগুলি সকলেরই মনঃপূত হওয়ায় সমস্বরে একটা উল্লাসধ্বনি উঠল। এমন কি, অনর্থক অসময়ে পথশ্রমের এই ক্লান্তির জন্য কেউই যে বিরক্ত হননি, তাঁদের হর্ষভাব থেকেই উপলব্ধি করা গেল। সত্যই, এই শিশু দুটির অবাধ মেলা-মেশা, সদ্ভাব ও খেলাধূলার ভিতর দিয়ে দম্পতি-সুলভ কথাবার্তাগুলি শুনে এঁরাও সকলে এমনই কৌতুক বোধ করতেন যে, এদের দু' পক্ষের পিতামাতার মত এঁরাও ভবিষ্যতে এদের মধ্যে মিলন-গ্রন্থী রচনার কল্পনা না করে পারেন না, বরং এতেই তৃপ্তি পান।

সকালে উঠেই বালক-বালিকার দল দেখল যে, আবার সব পালটে গেছে ; দেবী, ললিতের সঙ্গে ভাব করে দ্বিগুণ উৎসাহে খেলাঘরের কাজে লেগে পড়েছে। রাধা যেন ভেঙে পড়েছে, বসন্ত ও রতন তাকে নানা ভাবে আশ্বাস দিতে থাকে—ভাবিস কেন, এক পৌষে কি শীত পালায় ? এর শোধ আমরা তুলবই।

রাধা চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলে : বাবা, ওকি সোজা ছেলে ! ভিজে বেড়ালের মতন চুপ করে থাকে, যেন কিছু জানে না। একেই ত বলে, মিটমিটে ভান ছেলে খাবার রাক্ষস !

ওদিকে রাণী অসুস্থ দেহে ভেবেই অস্থির হয়ে উঠেছিল। তার দিদি দেবীর সঙ্গে ললিতদা'র আড়ি হয়েছে শুনে সে মনে মনে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছে ক'দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। কিন্তু দেবী নিজে তার কাছে একথা ভাঙেনি বলে, সেও অভিমানে গুম হয়ে থাকে। নিজের মনেই ঠিক করে নেয়—আগে সেরে উঠি, তার পর করব এর বিহিত। দিদি কি জানে না, ললিতদা'র সঙ্গে তার আড়ি হতে পারে না ?

এই সব ভাবতে ভাবতেই সেদিন কিন্তু ঘাম দিয়ে রাণীর জ্বর ছেড়ে যায়। তার পর সন্ধ্যার দিকে চড়িভাতির দলের আর সকলে যখন ফিরে এসে দেবীর নিরুদ্দেশের খবর দেয়, তখন রাণীর রোক দেখে কে ? কান্নায় ভেঙে না পড়ে সে তখনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে দলের চাঁই বসন্ত আর রাধাকে যা নয় তাই বলে একেবারে ফুলকোমুখী করে দেয়। তর্জন করে বলে—তোরা না জাঁক করে তাকে নিয়ে গিয়েছিলি ললিতদা'র সঙ্গে তার আড়ি করে দিয়ে ? এখন কোন মুখে এসে বললি—'তাকে খুঁজে পাইনি, কোথায় গেছে তাও জানিনে ?' কিন্তু আমি বলছি, ললিতদা যদি ও-দলে থাকত, যেখানেই দিদি থাকুক—খুঁজে বার করে আনত।'

মা ছুটে এসে মেয়েকে সামলান, জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলেন : আজই জ্বর ছেড়েছে, আর তুই এমনি করে চেঁচাচ্ছিস ? কোথায় যাবে সে—যখন হরগৌরীর দোর-ধরা, ওঁরাই তাকে খুঁজে দেবেন।

এমনি সময় খবর এল যে, ললিতকেও পাওয়া যাচ্ছে না ; দুপুর বেলায়

খাওয়া-দাওয়ার পর কোথায় যে ছেলে বেরিয়েছে—কেউ তা জানে না।···
রাণী অমনি চেঁচিয়ে ওঠেঃ তাহলে আর ভাবনা নেই, ললিতদা যখন বাড়ী নেই—নিশ্চয়ই জাঙ্গালে গেছে, দিদিকে না নিয়ে সে ফিরবে না।

এই ঘটনার পর থেকে ললিত ও দেবীকে নিয়ে যেন গ্রামের মধ্যে আর এক নূতনতম পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, আর সেই সঙ্গে এদের খেলাঘরটিও আরো জেঁকে উঠল। এদিকে রাণী সেরে উঠে পথ্য পেয়ে সেদিন দেবীদের খেলাঘরে এসে বলল: ওদিনের লুকোচুরি খেলা আর পিক্‌নিকের শোধ নিতে হবে দিদি—বড় জাঙ্গালে গিয়ে এমন জাঁকিয়ে এ-ছুটো করব, সবার তাক লেগে যাবে।

দেবী বলল: বেশ ত, তোর অসুখ ছিল বলে সেদিনের খেলায় কি কেলেঙ্কারী—তুই থাকলে কি অমন গুলতোন্ হোত?

ললিত ফুলচন্দন দিয়ে দেবীকে সাজাচ্ছিল, কথা সে অল্পই বলে; কিন্তু দেবীর কথার উত্তরে খপ করে বলে বসল: ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যেই; ওদের কাজটা খারাপ হলেও, আমাদের কিন্তু ভালোই হয়েছিল।

মুচকি হেসে রাণী বলল: সে কথা একশো বার—হরগৌরীর মন্দিরে প্রবেশ করে হর-গৌরী সাজা হয়েছিল—সে কি মন্দ? আমি কিন্তু সেদিন যেই শুনি, তোমাকেও দুপুরের পর থেকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তখনি ভেবেছিলুম—তুমি দিদির সন্ধানেই ছুটেছিলে, আর—তাই ত সত্যি হলো। তা বলে কিন্তু, ওদের ওপর টেক্কা দিয়ে বড় জাঙ্গালে গিয়ে খুব জাঁকিয়ে চড়িভাতি আমরা করবই।

কিন্তু বিরোধী দলের উপর টেক্কা দিয়ে খুব জাঁকিয়ে চড়িভাতি করবার পরিবর্তে কয়েকদিনের মধ্যেই ললিতের সঙ্গ ছাড়া হয়ে, গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়ে রাণীদের কলকাতায় রওনা হবার কথাটাই পাকা হয়ে গেল। বগলাপদ মধ্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন; সেখান থেকে ফিরে এসে ভাগ্যোদয়ের সে আখ্যানটি শুভানুধ্যায়ী মহলকে জানিয়ে দিলেন। শুনে প্রত্যেকেই প্রফুল্ল হয়ে বগলাপদর শুভাদৃষ্টের তারিফ করতে লাগলেন। কলকাতায় যে শিল্পপতির প্রতিষ্ঠানে তিনি মফঃস্বলের দ্রব্যজাত সরবরাহ করতেন, তিনি সরকার

কর্তৃক কতকগুলি বিশেষ পণ্য বস্তুর একচেটিয়া সরবরাহকার মনোনীত হন। সেই সকল পণ্য সম্পর্কে বগলাপদর অভিজ্ঞতা থাকায় অংশীদাররূপে তাঁকে সেই সরবরাহ-প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং সে-সম্বন্ধে লেখা পড়া পাকা হয়ে গেছে। সাত দিনের মধ্যে এখানকার পাট তুলে তাঁকে সপরিবার কলকাতায় রওনা হতে হবে।

চণ্ডীমণ্ডপে বসে বগলাপদ বন্ধু পশুপতিকে বলছিলেন: গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে সত্যিই প্রাণটা যেন কেঁদে উঠছে; কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই, পার্টনারসিপ ডীড্ পর্যন্ত রেজেষ্ট্রি হয়ে গেছে, তার পর এমন একটা চান্স—

পশুপতি গম্ভীর মুখে বললেন: বটেই ত, অত বড় ব্যবসাদার তোমাকে বখরাদার করে নিয়েছেন—এ কি সাধারণ কথা হে! তবে সবাইকে ছেড়ে ছুড়ে যেতে মনে কষ্ট হবে বৈ কি, তা' সে কষ্ট সামলে নিতে হবে—এর পর গা-সওয়া হয়ে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, মন থেকে সব মুছে না-গেলেই হলো।

মুখখানার একটা বিশেষ ভঙ্গি করে বগলা বললেন: মুছে যাবে! এই গ্রাম, এই চণ্ডীমণ্ডপ, তোমার সঙ্গে বসে গুড়ুক টানতে টানতে গল্প-গুজব, হর-গৌরীদের ঘর গেরস্থালী—সর্বক্ষণই চোখের ওপর ভাসছে: এসব কি ভোলবার, না মন থেকে মুছে যাবার মত ব্যাপার? বরং আমি বলতে পারি ভায়া, ছেলে বড় হলে যেন ওদের এখানকার সেই সব কথা ভুলে যেয়ো না; তাহলে আমার স্ত্রী একবারে ভেঙে পড়বেন কিন্তু।

পশুপতি মুখখানাকে কিঞ্চিৎ দৃঢ় করেই বলে উঠলেন: আমরা পাড়া-গাঁয়ের মানুষ, এখানে মানুষ হয়েছি, এখানে বাস করছি, আর—এখানেই থাকব। কাজেই, আমাদের মন মতিও ঠিক থাকবে—কিছুতেই নড়চড় হবে না জেনো।

পুকুর-ঘাটে দুই সই অনুপমা ও সুলোচনার মধ্যেও এমন আকস্মিকভাবে গ্রাম ছেড়ে কলকতায় গিয়ে বসবাস-সম্পর্কে আলোচনা চলে।

অনুপমা বলেন: আমি খালি খালি ভাবছি সই, ছেলেটার কথা—কি করে ও মনটাকে ধরে রাখবে জানিনে। রাত্তে ঘুমন্ত চেঁচিয়ে ওঠে—তাতে কেবলি দেবীর কথা, তাকে ডাকছে, কত কি বলছে। ঘুমিয়েও নিস্তার নেই সই! সেই সাথী ওর সঙ্গছাড়া হয়ে কলকাতায় চলেছে—শুনে অবধি ছেলের মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

সুলোচনাও মেয়ের কথা তুলে বলেন: আর বোল না সই, দেবীকে নিয়েও আমি এমনি ভাবনায় পড়েছি। কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে, কর্তা পড়ে শোনাচ্ছিলেন সবাইকে। আমাদের জন্ত একখানা বাড়ী সাজিয়ে রেখেছে, বিজলীর আলো—পাখা, কলের জল, রেডিও, ঝি-চাকর, রাঁধুনী—সব বরাদ্দ করে রেখেছেন ওখানকার ব্যবসার মালিক। শুনে রাণীর কি আহ্লাদ! কিন্তু দেবীর পানে তাকিয়ে যদি দেখতে সই—চমকে উঠতে। তার মুখে একটিও কথা নেই, চোখ দুটো ছলছল করছে, মুখখানা একবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আড়ালে আমাকে একলা পেয়ে আমার কোলে মুখখানা গুঁজে বলে—আমি কলকাতায় যাব না মা, আমাকে তোমরা জেঠামণির বাড়ীতে রেখে যাও, আমি এখানে থাকব। এমন কাকুতি করে বললে যে, আমার চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে এলো!

অনুপমা এর পর একটু শক্ত হয়ে বলেন: ছেলে-বয়সের মনের ধর্মই এরকম সই—সহজে বাগ মানে না, কিন্তু মানাতেই হবে। আবার এর পর দেখবে, সহরে গিয়ে পাঁচ রকম নতুন নতুন কত কি দেখে ভুলে যাবে—হয়ত পরে এখানকার কথা মনেই থাকবে না।

শিউরে উঠে সুলোচনা বলেন: অমন কথা বোল না সই, এখানকার কথা মনে থাকবে না, একথা ভাবতেও পারি না; মনে নেই—হরগৌরী-মন্দিরের কথা!

সুলোচনা বলেন: মনে অবিশ্যি আছে সই, সে কি ভুলবার? তবে সহরের ধারা-ধর্ম নাকি আলাদা, আগের কথা সব ভুলিয়ে দেয়; তাই ভয় হয়—

তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সুলোচনা বলে ওঠেন: হরগৌরী

আমাদের মনগুলো ভরসায় ভরিয়ে রাখুন সই, এই কামনাই করি। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমরা যেন মুখের কথা মনে রাখি।

খেলাঘরে খেলা আর জমে না, নতুন একটা চড়িভাতির কথাও চাপা পড়ে গেছে। ললিত ও দেবী দুটিতে মুখোমুখী বসে ভবিষ্যৎ নিয়ে কত কথাই বলাবলি করে।

দেবী বলল: রাধার মনোস্কামনাই পূর্ণ হলো; আমার এই সাজানো ঘর-গেরস্থালী সেই দখল করে বসবে। আর তুমি—

দেবীর স্বর আবেগে বদ্ধ হয়ে আসে। ললিত সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে: দূর! তা কখখনো হবে না। তুই চলে গেলে আমি আবার এই ঘরে বসে খেলব? রাধি এখানে এসে…তুই আমাকে কি ভেবেছিস্?

কথার সঙ্গে ললিতের চোখ দুটো বাষ্পে ভরে ওঠে, একটু পরেই সেই বাষ্প থেকে অশ্রুধারা নামে।

দেবী বিহ্বল ভাবে বলে: কেঁদোনা ললিতদা, আমি কি জানিনা তুমি আমাকে কত ভালবাস! আমিও ঠিক করতে পারছি না—সহরে গিয়ে, তোমায় ছেড়ে কি করে থাকব! মাকে অত করে বললুম—আমাকে এখানে রেখে যাও মা, নিয়ে যেওনা, আমি কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারব না! কিন্তু—

বলতে বলতে দেবীর দুটি আয়ত চোখেও জলের ধারা নেমে আসে। ললিত কাছে এগিয়ে গিয়ে কোঁচার খুঁটে তার চোখের জল মুছে দিয়ে সান্ত্বনা দেয়: কাঁদিস্‌নি ভাই, তোর কান্না যে আমি সইতে পারি না।

আপনাকে সামলে নিয়ে দেবী বলে: মা বলছিলেন, সবাই কি বরাবর এক জায়গায় থাকে? ছাড়াছাড়ি হয়—আবার আসেও। আমরা যাচ্ছি কাজের জন্য, আবার আসব এখানে। ঘরবাড়ী ত আর তুলে নিয়ে যাচ্ছি না? কলকাতায় গিয়ে চিঠি লিখবি, আর তোর ললিত দা'কেও বলবি—চিঠি লিখতে।

লিখবে তুমি চিঠি—বল?

গাড়ঘরে ললিত উত্তর দেয়: লিখব। কাকা বাবু বাবাকে ওর ঠিকানা বলেছেন, বাবা পাঁজিতে লিখে রেখেছেন। আমি লিখব চিঠি; আর তুমি?

ম্লান মুখে দেবী জানাল: তুমি ত জানো ললিতদা, আমি চিঠি লিখতে জানি না। তবে কি করে লিখব বল?

ললিত বলল: কেন, মাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে। তারপর ওখানে গিয়ে কত পড়াশোনা করবে, লিখতে তখন বাধবে না। কলকাতা সহরে দেখবার কত কি আছে; ট্রাম গাড়ী, হাওয়া গাড়ী, চিড়িয়াখানা, আরো কত কি! ঐ সব দেখে হয়ত এখানকার কথা ভুলেই যাবে। তখন হয়ত—

দেবী ঝংকার দিয়ে বলে উঠল: অমন কথা বলবে না বলছি—ভালো হবে না। এখানকার কথা আমি ভুলে যাব! তোমার কথা আমার···জানো, ক'রাত আমি ঘুমুতে পারিনি! আর তুমি বলছ—

চোখে আঁচল চাপা দেয় দেবী। ললিতও অপ্রস্তুত হয়ে দেবীরই আঁচলের কাপড়ে তার চোখ দুটি মুছিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকে: আমি ভুল করে ওকথা বলেছি দেবী ভাই, তুই কিছু মনে করিসনি, জানি রে জানি, তুই আমাকে ভুলতে পারবি নি।

দেবীর অভিমান এ কথায় চূর্ণ হয়ে যায়, ছল ছল চোখে প্রিয় সাথীর ম্লান মুখখানির পানে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে। ললিতের বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দুটিও চক্ চক্ করে ওঠে।

এদিকে দেখতে দেখতে রথযাত্রার উৎসব এসে পড়েছে। ললিত নিজের হাতে একখানা রথ তৈরি করতে লেগে গেছে প্রচণ্ড উৎসাহে। এই রথ খেলাঘরে পূজো করে, তারপর দেবীর সঙ্গে একত্র টেনে সে সকলের ওপর টেক্কা দেবে, এই কল্পনা তাকে আরো উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। দেবীকেও বলেছে সে—কলকাতায় যাবার আগে আমি তোকে এমন একটি জিনিস নিজের হাতে তৈরি করে দেব, দেখেই তুই খুব খুশি হবি, আর সেটা মনে করে রাখবি।

দেবী কথাগুলি শোনে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথা আর বা'র হয়

না; সে মনে মনে ভাবে—ললিতদাকে সে কি দেবে আহলে? তারও ত কিছু দেওয়া চাই। কিন্তু কি দেবে? তার ত দেবার মত কিছুই নেই!

কথা ছিল, রথযাত্রার পর ত্রয়োদশীর দিন বগলাপদ সপরিবার কলকাতা রওনা হবেন—পশুপতিই দিন স্থির করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ক'দিন আগেই সন্ধ্যার পর বগলাপদ কলকাতা থেকে তার পেলেন—রথযাত্রার দিন সকালেই তিনি যেন সপরিবার রওনা হয়ে পড়েন। শিয়ালদহ স্টেশনে লোকজন ও যান বাহন সব মোতায়েন থাকবে।

অগত্যা বগলাপদকে সেই ভাবেই প্রস্তুত হতে হয়। বন্ধু পশুপতিকে তারবার্তা জানিয়ে তাঁরও সম্মতি নিয়ে তিনি সস্ত্রীক মালপত্র গুছাতে থাকেন। দেবীর শরীরটা সেদিন ভালো ছিল না, বিকেলের দিকে একবার ললিতের সঙ্গে দেখা করে এসেই ছুটি মুড়ি-মুড়কি ও একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারের কথা সে জানতে পারেনি।

ললিত এখন রথ নিয়ে ভারি ব্যস্ত। বাড়ীতেই তার রথ নির্মাণের কাজটি সংগোপনে চলেছে—আর কোন দিকে তার লক্ষ্য রাখবার অবসর নেই।

সকালে উঠে সাজানো রথখানি নিয়ে তাদের খেলাঘরে আসতেই রাধা ছুটে এসে বলল: বা-রে, ললিত দা! দিব্যি রথ বানিয়েছ ত? কিন্তু যার জন্যে এনেছ, সে ত কলকাতায় চললো। ভালই ত হলো, এখন এসো—এই রথ নিয়ে আমরা খেলি।

ললিতের মনে হলো, তার মাথায় বুঝি আকাশ ভেঙে পড়েছে; দেবীরা কলকাতায় চলল! সে কি! তাদের যেতে ত এখনও তিন দিন দেরী। চোখ দুটো পাকিয়ে সে রাধার পানে চেয়ে বলল: সকালেই মিছে কথা বলিসনে রাধা—

রাধা বলল: মিছে কথা নয়—সত্যি। কেন, তুমি কি শোন নি—কাল রাতে তার এসেছে কলকাতা থেকে। তাই ওরা আজই চলেছে। ঐ ভাখ—

ললিত বিস্ফারিত চোখে দেখল—আর বগলা কাকা, সইমা, দেবী ও রাণীকে নিয়ে তাদের বাড়ীর দিকেই আসছেন। তাঁদের বেশভূষা দেখেই সে বুঝল যে, রাধা মিছে কথা বলেনি। কিন্তু সত্য হলেও এ কি দারুণ অবস্থা! তার এত যত্নে গড়া রথ, এত আশা উল্লাস সব ব্যর্থ হয়ে গেল!

কাছে এসেই বগলাপদ বললেন: এই যে ললিত, তোমাকেই আমরা খুঁজছিলাম। আমরা আজই চলেছি বাবা! তোমার বাবা মা'র সঙ্গে দেখা করে আসি।

স্থলোচনা দেবী ললিতের চিবুকটি ধরে চুমো খেয়ে বললেন: বেঁচে থাকো বাবা—

রাণী এগিয়ে এসে বলল: রথ তৈরি করেছ ললিতদা, বা—বেশ হয়েছে; তবে দুঃখ এই—দিদির আর রথ টানা হলো না।

ললিত নির্বাক, তার বিহ্বল দৃষ্টি ম্লানমুখী দেবীর দিকেই নিবদ্ধ। এই সময় স্থলোচনা দেবী পিছনে ফিরে মেয়েদের উদ্দেশে বললেন: তোরাও আয়, জেঠামণি, সইমাকে গড় করে যা।

রাণী তাড়াতাড়ি মা'কে অনুসরণ করল। দেবী পথের ধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল; মায়ের আহ্বানে দু'পা এগুতেই ললিতের সঙ্গে চোখোচোখী হয়ে গেল।

ললিতের দুই চোখের কোণ বেয়ে তখন অশ্রুর ধারা ছুটেছে। সেই অবস্থায় আর্তকণ্ঠে বলল: কাল সারা রাত জেগে তোমাকে দেব বলে তৈরি করেছি দেবী ভাই! তখন কি জেনেছিলুম—তোমরা আজই চলে যাবে?

দেবীও অশ্রুভরা চোখে জবাব দিল: আমিও জানতুম না, সন্ধ্যের আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সকালে উঠে সব শুনলুম। তুমি আমার জন্যে কষ্ট করে এত বড় রথ বানিয়েছ ললিতদা! এ রথ দেখে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না—কিছুতেই না। কিন্তু আমাকে ত থাকতে দেবে না—

কথার সঙ্গে আবার অশ্রুধারা চোখের কোণে নেমে এল। ললিত কোঁচার খুঁট দিয়ে উদ্গত অশ্রু মুছিয়ে দিতে দিতে বলল: তোমার জন্যে তৈরি করেছি, তুমি এটা নিয়ে যাও দেবী ভাই!

দেবীও কাপড়ের ভিতর থেকে ছোট একখানি ফটো বার করে বলল: কেবলই ভাবতুম ললিতদা, আমি তোমাকে কি দেব! আর কিছু না পেয়ে আমার এই ছবিখানা দিয়ে যাচ্ছি। সেবার সদরে আমাদের দুই বোনকে নিয়ে গিয়ে বাবা তুলিয়েছিলেন। খারাপ হয়ে গেছে বলে কলকাতায়

ভাল করে তুলাতে দিয়েছেন। কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেব। এখন এইটিই রাখ ভাই!

ছবিখানি হাতে নিয়ে ললিত বলল: আমার জিনিসের চেয়েও অনেক ভাল জিনিস তুমি আমাকে দিলে দেবী ভাই! তোমার এই ছবিই হবে আমার সাথী।

মায়ের ডাকে দেবী চমকিত হয়ে উঠল। ললিতের বাবা ও মায়ের সঙ্গে বগলাবাবু, সুলোচনা ও রাণী পুনরায় এই পথেই ফিরে এলেন। সুলোচনা বললেন: সইমাকে প্রণাম করতে গেলিনি দেবী—এখনো কথা ফুরোয় নি?

অনুপমা দেবী একটু এগিয়ে এসে বললেন: তাতে হয়েছে কি সই—আমরাই ত এসেছি, এইখানেই সেটা হবে।

দেবী তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে সই মা ও জেঠামণিকে প্রণাম করল। অনুপমা সস্নেহে দেবীকে কোলে টেনে বললেন: সইমাকে যেন ভুলে যেয়ো না মা!

ম্লান মুখখানি তুলে সইমার পানে নীরবে তাকাল দেবী। তার পর বগলার কাছে গিয়ে আবদারের সুরে বলল: বাবা, আমি এই রথখানা নিয়ে যাব—ললিতদা আমার জন্যে……

কন্যার কথায় বাধা দিয়ে বগলাপদ বললেন: দূর ক্ষেপী, একি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চলে—কত ওঠা-নামা, ধকল সইবে কেন, ভেঙ্গে যাবে; তার চেয়ে কলকাতায় গিয়ে রঙ করা টিনের রথ কিনে দেব'খন।

দেবীর মুখখানা অন্ধকার হয়ে এল—সেই অবস্থাতেই ললিতদা'র বিষণ্ণ মুখের নীরব ভাষাও বুঝি তার পড়া হয়ে গেল।

বগলাপদ বললেন: চল, আর দেরী করা চলবে না।

অদূরে রাস্তার উপর ছই দেওয়া যাত্রীবাহী গো-যান দাঁড়িয়েছিল। মালপত্র তার মধ্যে তোলা হয়ে গেছে—পল্লী-প্রতিবাসীদের অনেকেই সেখানে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে পথ করে নিয়ে একে একে এঁরা গাড়িতে উঠলেন। সবার পিছনে দেবী, তার ছল ছল চোখদুটিও তখন পিছনে পড়েছে—পরিত্যক্ত রথখানির পাশে মর্মর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে যেখান থেকে ললিতও তার পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে!

এই অবস্থায় পশুপতি গম্ভীর কণ্ঠে বিদায়বাণী শুনিয়ে দিলেন : দুর্গা, দুর্গা—শিবাস্তে পন্থানঃ।

ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা বৃষগজতুরগা,
দক্ষিণাবর্তবহ্নির্দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভা,
দ্বিজ নৃপ গণিকা পুষ্পমালা পতাকা,
সদ্যো মাংসম্বৃতং বা দধি মধু রজতং কাঞ্চনং,
শুক্ল ধান্যং দৃষ্টা শ্রুত্বা পঠিত্বা,
ফলমিহলভতে মানবো গন্তু কামঃ।

৭

কলকাতায় যে পণ্য-প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বগলাপদ সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং যাঁর সাদর আহ্বান তাঁকে সপরিবার কলকাতায় এনে স্থায়ীভাবে বসবাসে বাধ্য করে, তিনি হচ্ছেন সরকারের প্রধান সরবরাহকার ব্যবসায়ী অরবিন্দ রায়। ইতিমধ্যেই ইনি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে লক্ষীর বরপুত্র হয়েছেন, তার উপর সুবর্ণ সুযোগ এসেছে সরকার কর্তৃক প্রধান সরবরাহকার মনোনীত হওয়ায়। নিত্যানন্দ চৌধুরী নামে আর এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির সঙ্গে অরবিন্দ রায়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল ব্যবসায়ের দিক দিয়ে। এঁরা উভয়েই বুঝেছিলেন, ব্যবসায়ের ব্যাপারে যে অভাবনীয় সুযোগ এসেছে, মফঃস্বলের পণ্যপ্রধান বিভিন্ন মোকাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ বগলাপদকে সেজন্য তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন। এ হেন স্বার্থের খাতিরেই দুই বিচক্ষণ ব্যবসায়ী অনাত্মীয় বগলার প্রতি আত্মীয়সুলভ ব্যবহার করিতে থাকেন।

সহরের অন্যত্র বসবাসে পাছে অসুবিধা ঘটে, সেজন্য বিডন ষ্ট্রীটের উপর একখানি ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন স্বতন্ত্র বাড়ীতে সপরিবার বগলাপদর থাকবার

ব্যবস্থা করে দিলেন অরবিন্দ রায়। কয়েকটি ঘোটাঘুটি রকমে সাজানো, ঘরে ঘরে বিজলীর আলো ও পাখা। বসবার ঘরে টেবিল, চেয়ার, র‍্যাক; এক পাশে একটি রেডিও সেট। এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই আনন্দে অভিভূত হবার কথা। রাণী ত আলো জেলে, পাখা খুলে, রেডিওর গান-বাজনা শুনে আহ্লাদে আটখানা—কি যে করবে, ভেবে পায় না। ছুটে গিয়ে একবার বাবাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল: সত্যি বাবা, কি মজার সহর এই কলকাতা—আরো আগে কেন আমাদের আননি?

সুলোচনা দেবী সহাস্যে বললেন: পাঁগলীর কথা শোন!

হঠাৎ দেবীর দিকে রাণীর নজর পড়ে। দেবী এই সময় বারান্দার রেলিংটি ধরে নির্বাক্ দৃষ্টিতে রাস্তার পানে তাকিয়েছিল। রাণী ছুটে গিয়ে তার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল: তুই কি রকম মেয়ে দিদিভাই—ঐ সব দেখে আহ্লাদ করলিনি! এখানে একাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রাস্তার পানে তাকিয়ে আছিস্? কি ভাবছিস বল ত?

ম্লান মুখখানি ফিরিয়ে রাণীর বিহসিত মুখের উপর নিজের বিষণ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেবী জানাল: ভাবছি, ললিতদা' যদি সঙ্গে আসত, এ সব দেখত, তাহলে সত্যিই আহ্লাদ হোত।

বলতে বলতে দেবীর চোখ দুটি স্ফীত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে রাণী মুখখানার একটা ভঙ্গি করে ঝাঁঝিয়ে উঠল: তুই কি দিনকের দিন খুকি হচ্ছিস্ দিদি? এখানে তোর ললিতদা' আসবে কেন? আহা-হা! সেই জন্যে রাস্তার পানে তাকিয়ে দরদ দেখানো হচ্ছে মেয়ের!

ঘরের ভিতর থেকে বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে রে রাণী?

রাণী গলার স্বর আরো একটু চড়িয়ে দিয়ে বলল: তোমার সোহাগী মেয়ের কলকাতা ভালো লাগছে না—ওঁর ললিতদা' সঙ্গে আসেননি ব'লে!

কথাটা শুনেই স্বামি-স্ত্রী পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। সুলোচনা দেবী জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন: ওকে নিয়েই আমার ভাবনা, সারা পথটা মুখ বুজিয়ে এসেছে, একটু হাসি কোথাও ফোটেনি—শেষে না হেদিয়ে অসুখ-বিসুখ করে বসে।

বগলাপদ মুখে ঈষৎ উপেক্ষায় ভাব ফুটিয়ে বললেন: সব ঠিক হয়ে যাবে দু'দিনে। সামনেই বিডন পার্ক, কত রকমের খেলার ব্যবস্থা, কত বড় বড় ঘরের ছেলে-মেয়েরা সব আসে। দেখবে তখন, গাঁয়ের কথা সব ভুলেই গেছে।

কিন্তু পুরো একটি মাস কলকাতায় থেকেও দেবীর মনের অবস্থা মোটেই ফিরল না। বিডন উদ্যানে বালক-বালিকাদের জন্য খেলা-ধুলা ও দৌড়-ঝাঁপের নানা রকম বিচিত্র ব্যবস্থা দেখেও, সে কিছুতেই রাণীর মত পূর্ণোৎসাহে যোগ দিতে পারল না। কেবলই ললিতদা'র কথা তার মনে পড়ে; ছেলেদের লাফালাফি দেখে প্রশংসা না করে সে বলে ওঠে—ললিতদা' ওর চেয়েও জোরে লাফ দিয়ে গাছের ডাল ধরত—আসত এখানে সে। এমনি সব কথা খেলাধূলার মাঠেও শুনে ছোট বোন রাণী ভাবে—দিদির কি ললিতদা'র জন্যে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে গেল! এ কি রকম মেয়ে বাবা!

দিদির সব কথা রাণী বাড়ী গিয়ে মাকে বলে, সেই সঙ্গে অনুরোধ করে—তোমার মেয়েকে যদি হাসিখুসি দেখতে চাও, তাহলে ললিতদা'কে আনাও মা এখানে—সেখানকার মত খেলাঘর পেতে খেলুক ওরা।

মা ধমক দিয়ে বলেন: তুই থাম ত! প্রথম প্রথম অমন হয়, তারপর সামলে নেয়! ওর মনে যে কত দরদ, তুই তার কি বুঝবি?

এই সময় বগলাপদ চৌরঙ্গীর একটা বড় স্টুডিও থেকে দুই মেয়ের কয়েক সেট ফটো তুলিয়ে আনলেন। দেশেই রাণীর কাছে তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন, কলকাতা থেকে ভালো ফটো তাদের আনাবেন। কথাটা দেবী শুনতে পায় এবং সে-ও আবদার ধরে: আমাকে একখানা আলাদা ফটো দিও বাবা—আমি এক জনকে দেব।

সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন বগলাপদ। একসঙ্গে দুই বোন হাতধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে, তা ছাড়া তারা একা একা উপবিষ্টা—দুই ধরণের দুই প্রস্থ ছবি। প্রত্যেক প্রস্থ তিনখানি করে তারা পেয়েছে। দেবীর মনে পড়ে যায়—ললিতদা'কে সে কথা দিয়ে এসেছে, তার নতুন ফটো তাকে পাঠিয়ে দেবে। নিজের ফটোখানি নিয়ে সে বগলাপদর ঘরে এসে তাঁর টেবিলের

সামনে দাঁড়াল। কাজ করতে করতে চোখ তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কি মা—কিছু বলবে?

নিজের ফটোখানি শক্ত কাগজে প্যাক-করা অবস্থায় পিতার টেবিলের উপর রেখে দেবী বলল: এখানা আমি ললিতদা'র কাছে পাঠাতে চাই বাবা!

কন্যার মুখের পানে তাকিয়ে বগলাপদ বললেন: বেশ ত মা আমি দেব পাঠিয়ে; ঠিক সময়েই তুমি এখানা এনেছ, আমি তোমার জেঠামণিকেই এখন চিঠি লিখছি।

দেবী অমনি খপ করে আহ্লাদে অনুরোধ করে বসল: তাহলে ঐ চিঠিতে লিখে দাও বাবা, ললিতদা' যেন আমাকে চিঠি লেখে।

কন্যার বিহসিত মুখের পানে চেয়ে বগলাপদও সহাস্যে বললেন: এই কথা! আচ্ছা মা, এখনি লিখে দিচ্ছি।

চিঠি ও ফটোর প্যাকেট সেই দিনই হরগৌরীপুরে পোষ্ট করা হলো।

৮

ওদিকে ললিতের মুখের হাসি, মনের উল্লাস, খেলার উৎসাহ সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে হরগৌরীপুর গ্রাম ছেড়ে দেবীদের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। সে দিন নিজের হাতে তৈরি খেলাঘরের রথখানির পাশে দাঁড়িয়ে ঠায় একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল দেবীর পানে—এক একবার পিছনে ফিরে ফিরে বড় সাধের রথখানার পানেও তাকাচ্ছিল—যে পর্যন্ত না সে গাড়ীতে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটু পরেই রাধা ছুটে এসে বলে: বাবা—বাবা! ধন্যি ছেলে যা হোক; এখন হলো তা? আমি জানি যে—ওরা চলেছে কলকাতায়, সেখানে কি রথের

ভাবনা? বয়ে গেছে তোমার রথখানা নিয়ে আর একটা পুঁটলি বাড়াতে! এখন এসো, আমরাই দুজনে—

কথাগুলি বলতে বলতে রাধা আরো উৎসাহে ললিতের একখানা হাত চেপে ধরবার জন্যে এগুতে থাকে, কিন্তু খরদৃষ্টিতে একটি বার তার দিকে চেয়ে উপেক্ষার ভঙ্গিতে—'ধ্যেৎ' বলে ললিত বাড়ীর দিকে ছুটে পালায়। সে সময় তার মনে হতে থাকে—রাজ্যের দুঃখ, নিরাশা, বিরাগ, বিরক্তি, লজ্জা সবগুলোই তাকে যেন চেপে ধরতে আসছে, সে এখন মুখখানা লোকচক্ষুর অগোচরে লুকাতে পারলে বুঝি নিষ্কৃতি পায়!

বাড়ীতে ঢুকতেই মায়ের সঙ্গে ললিতের চোখোচোখী হয়। মা চমকে উঠে ছেলেকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন: কি হয়েছে রে, এমন করে ফুলকোমুখী হয়ে এলি কেন—দেখি গা?

ছেলের গণ্ডে গণ্ড রেখে মা গায়ের তাপ পরীক্ষা করতে যান, ছেলে কিন্তু তার আগে মায়ের বুকের মধ্যে মুখখানা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে। কান্নার ধরণ দেখেই মায়ের মন টন-টন করে ওঠে, বুঝতে তখন বাধে না—কিসের জন্যে কোন্ দুঃখে ছেলের এই কান্না! দু' হাতে কোলে চেপে ধরে সান্ত্বনার সুরে প্রবোধ দিতে থাকেন—ও মা, তাই বল—দেবীর জন্যে মন কেমন করছে? কিন্তু তাই বলে অমন করে কাঁদে রে বোকা ছেলে? ওরা কলকাতায় গেছে—আবার আসবে, আবার খেলবি দুজনে।

ছেলে তখন ফোঁকাতে ফোঁকাতে বলে: বড্ডো মন কেমন কোরছে মা—দেবীর জন্যে। অত করে রথ বানালুম দুজনে খেলব বলে—

কথা আর শেষ হয় না—আটকে যায় চোখের জলে। মা আঁচলে চোখ দুটি মুছে দিয়ে বলেন: খেলা ত হোত, হঠাৎ কলকাতা থেকে 'তার' আসতেই আজ রথের দিনই ওদের যেতে হলো। দেবীরও কি কম দুঃখ্যু মনে, মাকে বলে—আমি সইমার কাছে থাকব। যেমন সেই মেয়ে, তুইও তেমনি। দু দিন মন কেমন করবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

কর্তা পশুপতি সব শুনে বলেন—এখন থেকে লেখাপড়ায় মন নিবিষ্ট কর

দেখি, তাহলে আর দেবীর জন্যে মন কেমন করবে না।' অনেক কবিতা
• ত কণ্ঠস্থ করেছিস, সেইগুলো পড়—

কিন্তু পড়তে বসলেও দেবীর কথা মনের মধ্যে আরও স্পষ্ট করে যেন ফুটে ওঠে। এই বয়সেই ললিত বাবার কাছে সংস্কৃত ও বাঙলা কবিতা অনেক শিখেছিল—শিশুদের মনে সেগুলি বেশ আনন্দ যোগায়। দেবী আবদার ধরত—কবিতা পড় ললিতদা', তোমার মুখে কবিতা আমার শুনতে বড্ডো ভালো লাগে।

অমনি ললিত বাবার আবৃত্তির অনুকরণে কবিতা বলত—

যা রাকা শশীশোভনা গতঘনা সা যামিনী—যামিনী।

যা নারী পতিরতা গুণযুতা সা কামিনী—কামিনী॥

মুখখানি প্রফুল্ল করে দেবী পুনরায় অনুরোধ করত—সেই কুঁদুলির কবিতাটি বলো ললিতদা'! ললিতও পরক্ষণে আবৃত্তি করত—

'খোকামণি মায়ের গলার মাদুলি।
খোকামণির বৌটি হ'ল কুঁদুলি।
কুঁদুলিকে খোকা বাবু কোণে দিলেন ঠেসে,
কুঁদুলিকে নিয়ে গেল খ্যাক্‌শিয়ালি এসে।'

— যাবার সময় দেবী যে ফটোখানি ললিতকে দিয়ে যায়, তাকেই সাথী করে সে খেলা ও পড়া চালাতে চায়। কিন্তু ছবির মুখ-চোখ বিবর্ণ হওয়ায় স্পষ্ট চেনা যায় না, তথাপি ললিত তার প্রখর কল্পনার আলো ফুটিয়ে ছবিখানিকে জাগিয়ে তুলে আলাপ জমাতে থাকে। কত প্রশ্ন, কত কথা, কত সব আলোচনা।

প্রশ্ন করে—ওখানে গিয়ে কেমন আছ? আমার জন্তে মন কেমন করে? না—কলকাতা সহরের অনেক কিছু দেখে ভুলে গেছ আমাকে? আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি। এই দেখ না—তুমি আমার মুখে কবিতা শুনতে ভালবাস বলে, কবিতা পড়ছি। মনে হচ্ছে, তুমি এই ছবির মধ্যে বসে সব শুনছ। কিন্তু কি বিশ্রী হয়ে গেছে তোমার ছবিখানা—আমি বলেই চিনতে পারি।

ছবিখানা নিয়ে সেই পরিচিত খেলাঘরেও হাজির হয়েছিল ললিত। কিন্তু এক খণ্ড পিচবোর্ডের উপর আঁটা একটা ছবিকে খেলুড়ে করে খেলাঘরে ললিতের খেলবার প্রচেষ্টা দেখে রাখা ত হেসেই খুন! সে তখনি ঢাকে ঘা দেয়, অমনি চার দিক থেকে ছেলেমেয়ের দল এসে ললিতকে ছেঁকে ধরে, তার কাণ্ড দেখে কেউ কেউ হেসে লুটোপুটি খায়, কেউ বা ছড়া কেটে খোঁটা দেয়। এক তরুণী সে সময় খেলাঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি সব শুনে হাসিমুখে একটা উপমা দিলেন—আহা-হা, এতে কি হয়েছে যে তোরা এমন করে হাসাহাসি করছিস্? শুনিস্ নি—সীতা বিহনে রামচন্দ্র সোনার সীতে গড়িয়ে যজ্ঞি করতে বসেছিলেন, আর আমাদের ললিতরাম দেবীর বদলে দেবীর ফটো এনে তার সঙ্গে খেলতে বসেছে।

এ ভাবে সবার চোখে পড়ায়, আর নানা রকম কথা শুনে ললিত এর পর খেলার পাট একেবারে ছেড়ে দিয়ে পড়া নিয়েই পড়ল। তার পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করলে আর কেউ সে ঘরে প্রবেশ করতে পারে না; কাজেই নিশ্চিন্ত মনে সে এখানে তার সাথীটিকে নিয়ে কবিতা পাঠে মেতে ওঠে।

কোন দিন বা একাই অসময়ে হরগৌরী-মন্দিরে গিয়ে গৌরীপীঠের সামনে ধর্ণা দিয়ে পড়ে—নির্জন মন্দিরের পীঠভূমিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলে—'আমার দেবীকে এনে দাও ঠাকুর, তাকে ছেড়ে আমি যে আর থাকতে পারছি না, বড্ডো মন কেমন করছে। তুমি ত সব জানো ঠাকুর!' প্রার্থনার পর ঠাকুরের চরণামৃত নিজের মুখে দেয়, সর্বাঙ্গে মাখে, সঙ্গের ফটোখানিও বাদ পড়ে না—চরণামৃতের পুণ্য পরশ পায়।

দেবীকে সঙ্গে করে বন-জঙ্গলে যেখানে যেখানে ঘুরত, মাটি থেকে লাফিয়ে যে সব গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠে পড়ত, সে গাছগুলোর কাছে গিয়ে তার কি কান্না! আজ সে একা এসেছে, সঙ্গে দেবী নেই; থাকলে আজও সে গাছে উঠে দেবীকে অবাক করে দিত। ফটোখানার দিকে চেয়ে বলে—'তুমি কোন কর্মের নও, বাজে।'

কিন্তু দিন কয়েক পরে পশুপতি পুত্রকে ডেকে ডাকঘর থেকে পাওয়া একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন: এই নে, দেবী পাঠিয়েছে—তার নতুন ফটো;

ফটোখানি ছেলের হাতে দিয়ে তিনি বগলাপদর চিঠি নিয়ে পড়লেন। এ চিঠির সুর যেন কেমন একটু ভিন্ন রকমের। তাঁকে এখন মফঃস্বলের নানা মোকামে ঘুরতে হবে। মালিকরা বলেছেন—যে মওকা এসেছে, ভাগ্য ফিরে যাবে। তাঁদের ইচ্ছা যে, আমরা সবাই ওঁদের মতই আধুনিক হই। কলকাতার মজা হচ্ছে, সব সময় নাক উঁচু করে থাকা চাই, আমরা গরীব—সেকালে চালে চলতে অভ্যস্ত, এমনি আভাস দিলে আর ওদের দলে মিশবার উপায় থাকবে না, আমাদের গেঁয়ো ভূত ভেবে হেনস্তা করবে। কাজেই আমরাও বাইরের চাল বাড়িয়ে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছি। এ জন্যে নিজেদের হাল-চাল, বাড়ীর আদব-কায়দা সব কিছুই বদলাতে হয়েছে। মেয়ে দুটোকে রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়ে তৈরি করতে হবে। তুমিও তায়া ছেলের লেখাপড়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। দেবী এখানে এসে খুশি নয়, সে ললিতের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে—সর্বদাই তার মুখে ললিতদা'র নাম। হালে ওদের ফটো তোলানো হয়েছে, দেবী তার ভাগ থেকে একখানা ফটো ললিতকে পাঠাচ্ছে। তুমি তাকে দিও। মাঝে মাঝে ওখানকার খবর দিও, তবে আমাদের খবর যদি সময় মত বা একবারেই না পাও ত রাগ কর না যেন, বুঝবে যে—কাজের ভীড়ে আমরা সাড়া দিতে পারছি না। বছর কতক এই ভাবেই কাটবে।

বন্ধু বগলাপদ কলকাতায় গিয়েই যে গ্রাম্য পরিবেশের কথা সব ভুলে গিয়ে সহরে সভ্যতায় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরই স্বহস্তে লেখা পত্রে তা' জ্ঞাত হয়ে পশুপতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। পল্লীসভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষণশীল রূপে দুই বন্ধুর সুনাম ছিল। বগলাপদই চণ্ডীমণ্ডপের বৈঠকে বসে কত দিন কলকাতার তরুণ-তরুণীদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অভিভাবকদের তাতে উপেক্ষার প্রসঙ্গ তুলে কঠোর সমালোচনা করেছেন; অথচ এখন কলকাতাবাসী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পূর্ব-মনোভাবের কি বিস্ময়কর পরিবর্তন! এ অবস্থায় তিনি নীরব না থেকে পত্রে লিখিত প্রত্যেক কথাটির খণ্ডন করে দীর্ঘ এক প্রতিবাদ-পত্র লিখে উপসংহারে নির্দেশ দিলেন—পল্লী-সমাজে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আমরা যে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত, তাকে

ত্যাগ না করেও কলকাতায় থাকা যায়। অন্যে যাই করুক, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হয়ে যতই বাড়াবাড়ি করুক, তুমি-আমি কখনই তার সমর্থন করতে পারি না। আমার এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট মনে করি।

বগলাপদ বন্ধু পশুপতির পত্রখানি স্ত্রীর সামনেই খুলে পাঠ করেন। সুলোচনা দেবী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন—শুনলে ত, প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুর মতই তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন। তুমি ওঁর কথাগুলো ভাল করে ভাবো।

বগলাপদ তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দেন—আমি যদি ঐ গ্রামে থাকতাম, আমার মুখ দিয়েও এই সব কথা বেরুত, শুনে গাঁয়ের লোক ধন্য ধন্য করত। কিন্তু কাল যে এগিয়ে চলেছে, গ্রামের সভ্যতা, সংস্কৃতি পিছিয়ে আছে, এ কথা কে ওঁদের বোঝাবে বল? পুরোনো সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে আধুনিক যুগের হাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না।

পশুপতি যদি কলকাতার পরিবেশ উপলব্ধি করে বগলাপদর সঙ্কল্পটি সময়োপযোগী বলে সমর্থন করতেন, তাহলে সব গোলমাল মিটে যেত; কিন্তু পত্রে প্রতিবাদ করে অযাচিত নির্দেশ দেওয়ায় বগলাপদ এতই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন যে, এ পত্রের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেন না।

এই ঘটনার পর প্রায় একই সঙ্গে দুই বাড়ীতে দুরারোগ্য ব্যাধি দারুণ বিপত্তি উপস্থিত করল। একদা গভীর রাত্রে দেবী হঠাৎ চীৎকার করে উঠল: ললিতদা'! দেখ, দেখ আমি পড়ে যাচ্ছি গাছ থেকে—ধর, ধর, শীগগির ধরো—

দেবীর চীৎকারে পাশ থেকে রাণী ধড়মড় করে উঠে বসল, পাশের ঘর থেকে বাবা ও মা ছুটে আসেন। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সকলেই দেখেন যে, বিছানার উপর বসে দেবী ঠক-ঠক করে কাঁপছে; তার চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু এখন আর মুখে কথা নেই, দৃষ্টি উদাস!

মা গায়ে হাত দিয়ে শিউরে উঠে বলেন: ও মা, গা যে পুড়ে যাচ্ছে—নাড়ীটা দেখ ত!

বগলাপদ কন্যার হাতখানি তুলে নাড়ী পরীক্ষা করেই বুঝলেন, প্রবল জ্বর, তারই ঝোঁকে চেঁচিয়ে উঠেছে।

মা বুঝলেন, মেয়েটা বেদিয়ে জ্বর করে বসেছে। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর মা কন্যাকে নিয়ে পড়েন, ঘুম পাড়াতে চেষ্টা পান। মেয়ে কিন্তু ঘুমের মুখে মাঝে মাঝে ললিতদা'কে ডেকে আবার জোর করে বিছানায় উঠে বসে, ললিতকে উদ্দেশ করে অসংলগ্ন কথা সব বলতে থাকে—রথখানা রেখে দিও ললিতদা', আমি ফিরে গিয়ে নেব!...ভারি দুষ্টু হয়েছ তুমি—আমাকে আর কবিতা শোনাও না!...রাখির সঙ্গে কথা বলবে না তুমি—আমি ওর সঙ্গে আড়ি দিয়েছি!...এমনি কত কথা। এক একবার আচ্ছন্নের মত হয়ে চুপ করে, তার পর সেটা ভেঙে গেলেই ঐ ভাবে চীৎকার! অবশিষ্ট রাতটুকু সবারই অস্বস্তিতে কাটে।

সকালেই ডাক্তার ডাকা হলো—পাশ-করা নামকরা ডাক্তার। তিনি দেখে বললেন: ভোগাবে, জ্বরটা সোজা নয়। তবে এখনই কিছু বলা যায় না।

জ্বর ওঠা-নামা করতে থাকে, ডাক্তারের চিকিৎসাও চলে। নানা ভাবে রোগ পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়; তার আড়ম্বর দেখে সুলোচনা দেবী শিউরে ওঠেন। দিন কয়েক পরেই ডাক্তার জানালেন—টাইফয়েড, সেই সঙ্গে মেনেনজাইটিসের আশঙ্কাও আছে।

মেয়ের এই অসুখের মধ্যেই বগলাপদকে কর্মস্থানে ছুটতে হলো। জরুরী প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার। তাঁর মুরুব্বীরা অভয় দিয়ে বললেন: রোগের চিকিৎসা ত আর আপনি করছেন না, তবে আপনার কিসের ভয়? ডাক্তারের ওপর সব ভার দেওয়া হয়েছে- দায়িত্ব এখন ওঁর। আপনি কাজে লেগে পড়ুন।

কাজেই বগলাপদকে কাজে নামতে হয়। কয়েক দিনের কাজেই বুঝতে পারেন, কর্মক্ষেত্রে সৌভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই ঝাঁপি হাতে করে বসে আছেন—ঝাঁপির মধ্যে অফুরন্ত সম্পদ! আনন্দে উৎসাহে তাঁর চোখ-মুখ চক-মক করে ওঠে।

ও দিকে হরগৌরীপুর গ্রামে দেবীর তাজা ছবিখানি পেয়ে ললিত আনন্দে আটখানা। তার সঙ্গে আলাপ করে, পড়ার ঘরে তাকে ডেস্কের উপর বসিয়ে

তার প্রিয় কবিতাখানি পড়ে শোনায়, তার পর মায়ের কাছে গিয়ে নানা ভাবে আবদার করতে থাকে। প্রথম প্রথম পুত্রের এই সব চাপল্যে পশুপতি বিশেষ আপত্তি করেননি, কিন্তু ইদানীং তিনি শক্ত হয়ে ওঠেন। ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন: ঢের হয়েছে, আর দেবী দেবী করে তার ছবি নিয়ে ঢং করে বেড়াতে হবে না, পড়াশোনায় মন দে।

ললিত গিয়ে মাকে ধরল, তাঁর কাছে আবদার তুলল: বাবার কথা শুনলে মা, আমি কি পড়ি না? কিন্তু দেবীর ছবি থাকলে কি দোষ হবে বল ত? আমি যে মনে করি—দেবী আমার পড়া সব শুনছে!

মা বললেন: আচ্ছা, আমি ওঁকে বলব'খন। তুমি কিন্তু বাবা, যার তার সামনে দেবী দেবী ক'র না। দেবীর ছবি ত পেয়েছ—কাছে রেখে মন দিয়ে পড়বে। তাহলে উনিও কিছু বলবেন না।

এর পরই একদিন হঠাৎ অনুপমা দেবী জ্বরে পড়লেন। ক'দিন ধরেই তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না, কিন্তু দেহের ভিতর যে জ্বরের বীজাণু ছড়িয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারেননি। ব্যাধি যেদিন প্রবল হয়ে ধরা দিল, তখন তাঁর উত্থান-শক্তি নেই। এ অবস্থায় বাড়ীর প্রাচীনা পরিচারিকা এবং পুত্র ললিতকে নিয়ে পশুপতি স্ত্রীর পরিচর্যা ও সংসারের কাজকর্ম কোন রকমে চালাতে লাগলেন। পড়াশোনার পাট সেরেই ললিত মায়ের বিছানায় এসে বসে, অকাতরে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করে; তারই মাঝে বলে—দেবী এখানে থাকলে সে-ও তোমার কত সেবা করত—নয় মা? মা কথাটার সমর্থন করে বলেন, হ্যাঁ, করতই ত, সে জানে—বড় হলে তোর সঙ্গে তার বিয়ে হবে, ছেলে-বৌ দুজনেই ত মায়ের সেবা করে।

হঠাৎ ললিত কি ভেবে বলে উঠল: কাকাবাবুরা দেবীকে রেখে গেলেই ভাল করতেন মা, দেবী কি যেতে চেয়েছিল? ওঁরা জোর করে নিয়ে গেলেন।

মা জবাব দিলেন: ওঁদেরও মেয়ে ত, ছেড়ে গেলে মন কেমন করত না? বেশ ত, তুমি আর একটু বড় হও, লেখাপড়া শেখ, আমি খুব তাড়াতাড়ি তোদের দুজনের হাত এক করে দেব—তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না, আর বৌ হলেই দেবী এ বাড়ীতে থাকবে।

মায়ের এ কথাগুলি ললিতের ভারি মিষ্টি লাগল। মুখখানা প্রফুল্ল করে স্থিরদৃষ্টিতে সে মায়ের মুখের পানে চেয়ে রইল। একটু পরে আস্তে আস্তে বলল : এ সব কথা যেন বাবাকে বল না মা!

মা ছেলের মুখের পানে চেয়ে মনে মনে ভাবেন, খেলাঘরের খেলা থেকে এই বয়সেই খেলার সাথীটিকে কী ভালোই বেসেছে এ ছেলে! তারপর, এ ত নেহাৎ বাজেও নয়, তাঁরা দুই সই হরগৌরীর মন্দিরে কথা দিয়েছেন, সে হিসেবে দেবী বাগ্‌দত্তা হয়ে আছে, আর তিনিও কথা দিয়ে রেখেছেন—সে কথা ফেরবার নয়। তিনি বেঁচে থাকতে এর নড়-চড় হতে দেবেন না কখনো।

তখনো নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন মন্দ ধারণার উৎপত্তি হয় নি। কিছুদিন পরেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অনুপমা দেবীর অসুখ সারবার দিকে না এসে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়াতে গ্রামের ডাক্তার পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। পশুপতিও লক্ষ্য করেছিলেন, অসুখটি সহজ নয়। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে সদর থেকে হাসপাতালের নামকরা ডাক্তারকে মোটা ফী দিয়ে আনানো হলো। গ্রামের ডাক্তার যে সন্দেহ করেছিলেন, তাই সত্য বলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—টাইফয়েড, সেই সঙ্গে নিউমোনিয়া। পশুপতি স্ত্রীর চিকিৎসায় কার্পণ্য করলেন না; খুব ঘটা করেই সপ্তাহ খানেক চিকিৎসা চলল, তার পর সে আয়োজন এক দিন সহসা বাধা প্রাপ্ত হলো—চিকিৎসকদিগকে চমৎকৃত করে অনুপমা দেবীর পবিত্র আত্মা ভোরের দিকে সকলকে মুক্তি দিয়ে দিব্য-ধামে চলে গেল। ইদানীং তাঁর কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। এই অবস্থাতেই স্বামীকে এক সময় কাছে ডেকে দুটি কথা শুধু বলেন : দেবীর সঙ্গে ললিতের বিয়ে দিও, কিছুতেই এর যেন অন্যথা না হয়।

অনুপমা দেবীর মৃত্যুর পর পশুপতির সংসার একবারে অন্ধকার হয়ে গেল। ললিতকে মাতৃশোকে সান্ত্বনা দিয়ে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল। এক পরিচারিকা ছাড়া বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নেই, কে তাকে সান্ত্বনা দেয়? পাড়ার মেয়েরা এসে ললিতকে বোঝান, দেখা-শোনা করেন। দেবীর জন্যে মন কেমন করলে মা কত বোঝাতেন, সান্ত্বনা দিতেন, এখন সেই মা-ও তাকে ছেড়ে চলে গেলেন! কি করে সে এ-বাড়ীতে থাকবে?

শ্রাদ্ধ-শান্তির পর পশুপতি অনেক ভেবে-চিন্তে ললিতকে স্থানান্তরে পাঠাবার সঙ্কল্প করলেন। তাঁর বরাবরই ঝোঁক ছিল যে, ছেলেকে বেনারসে রেখে হিন্দু ইউনিভারসিটি থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেবেন। কাশীতে তাঁর এক পরিচিত অধ্যাপক-বন্ধু ছিলেন, তাঁর সঙ্গে লেখালিখি করে সাব্যস্ত হল যে, ললিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত স্কুল-বিভাগেই এখন পড়বে, সেখানকার বোর্ডিংএ থাকবে, তবে সংস্কৃত শিক্ষার দিকে কর্তৃপক্ষ যাতে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, সে ব্যবস্থাও করা হবে। এই বয়সেই এখানে ললিত পিতার কাছে সংস্কৃত পাঠে অভ্যস্ত হয়েছিল। ললিতের আসক্তি দেখে তিনি খুব প্রসন্নও ছিলেন। এরপর কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে পুত্র সংস্কৃতে পণ্ডিত হয়ে ফিরবে, এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। অধ্যাপক বন্ধু সে-ভার নিতে সম্মত হন। এর পর এক শুভদিনে ললিতকে উচ্চশিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠিয়ে পশুপতি নিশ্চিন্ত হলেন।

কাশীর বিখ্যাত কলেজিয়েট স্কুল সংলগ্ন বোর্ডিং-এ আলাদা একখানি ছোট ঘরে ললিতের থাকার ব্যবস্থা হয়। নিজের পাঠানুরাগ ও বিনয়নম্র ব্যবহারে বোর্ডিং-এর অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশংসা সে অর্জন করেছে। কিন্তু পড়ার সময় তার টেবিলে প্রধান স্থান পেয়েছে দেবীর সেই ফটোখানি। এখানেও তাকে উদ্দেশ করে কবিতা আবৃত্তি চলে, মনের কথাগুলি বলে—যেন সেই আলেখ্যটি কান পেতে শুনছে তার প্রতিটি কথা!

বোর্ডিং-এর ছেলেরা লক্ষ্য করে, নিজের ঘরখানির দরজা বন্ধ করে ললিত-অধ্যয়নে নিমগ্ন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সব ধরা পড়ে যায়, তারা ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের লক্ষ্য করে বলে—জানিস্ ভাই, আমাদের বোর্ডিংয়ে একটা ছেলে আছে, একখানা ছবি সামনে রেখে তাকে কবিতা শোনায়, তার সঙ্গে কথা কয়।

তাদের চোখের ইশারায় উদ্দিষ্ট ছেলেটিও প্রকাশ পায়। তখন চারদিক থেকে প্রশ্ন উঠতে থাকে—কার ছবি রে ললিত ভাই? কি রকম ছবি রে? কাকে কবিতা শোনাস তুই? কার সঙ্গে কথা বলিস্?

এমনি কত প্রশ্ন। কিন্তু ললিত প্রতি প্রশ্নটি এড়িয়ে যায়—মুখখানা ভার করে চুপ করে থাকে। ছেলেরাও চুপি চুপি নানারূপ আলোচনা করে।

হঠাৎ ললিতের মনে পড়ে যায় যে, দেবীকে তার চিঠি লিখবার কথা ছিল, দেবী সে জন্যে অনুরোধও করেছিল। সেই দিনই ললিত কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে যায়। হরগৌরীপুরে সেই বিদায়ের দিন থেকে তার দুঃখের কথা, পড়া-শোনা, তার পর দেবীর ফটো পাওয়ার কথা, সেই ফটো সামনে রেখে কবিতা শোনানো, বাবার অনুযোগ, মায়ের সান্ত্বনা দান, তার পর—তাঁর কঠিন অসুখ ও মৃত্যুর কথা, গ্রাম থেকে কাশীতে এসে বোর্ডিংএ থেকে পড়াশোনা, সব কথাই দিব্যি গুছিয়ে লিখে দেবীর নামে ডাকে পাঠিয়ে দেয়। চিঠি যথাসময়ে দেবীর বাবা বগলাপদর হাতে এসে পড়ে। তিনি তখন টেবিলের সামনে বসে অফিসের কাজ করছিলেন। দেবীর তখন অসুখ চলেছে, ললিতদা'র নাম ধরে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছে। বগলাপদ না পড়েই সে চিঠি ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন—চিঠির প্রসঙ্গও বাড়ীতে কারও কাছে তোলা প্রয়োজন মনে করেন না।

ওদিকে ললিত দেবীর উত্তর প্রতীক্ষা করতে থাকে। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। চিঠির জবাব না পেয়ে সে ব্যথিত হয়ে দেবীর ছবিকে জিজ্ঞেসা করে—কৈ, কি হলো? চিঠির জবাব ত এল না! মনে তার অভিমান জাগে—ছবির সঙ্গে ঝগড়া করে, মুখের কথা না রাখার জন্যে মনের দুঃখে কেঁদে ফেলে। আশ্চর্য, বোর্ডিংয়ের বিভিন্ন বয়সের ছেলের দল, ক্লাসের সহপাঠিগণ—কারও দিকে তার লক্ষ্য পড়ে না—দেবীর ছবিই তাকে সর্বক্ষণ যেন অভিভূত করে রাখে। মাসের পর মাস ধরে এই ভাবে ললিতের দিন কাটে।

এদিকে কলকাতায় দেবী প্রায় ৬২ দিন এক টানা রোগভোগের পর কোন প্রকারে সেরে উঠল বটে, কিন্তু এই ভীষণ প্রকৃতির ব্যাধির প্রকোপে সে পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলল। মা ও রাণী সর্বক্ষণ তার রোগশয্যা-পার্শ্বে থাকায় একেবারে অপরিচিতার সামিল না হলেও আর কাউকেই সে স্মৃতিপথে আনতে

পারে না। এমন কি বগলাপদ এই ব্যাধির সময় প্রায়ই বাহিরে থাকতেন বলে তাঁকেও প্রথম প্রথম সে চিনতে পারেনি। অনেক কষ্টে পরে সে বাবাকে উপলব্ধি করতে সমর্থা হয়; ডাক্তার বলেন—এমন হয়, কিন্তু ভয় নেই, এরও ব্যবস্থা আছে; যাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়—কিছু কিছু মানসিক চিকিৎসা করালেই ঠিক হয়ে যাবে। একটা দিক দিয়ে বগলাপদ আশ্বস্ত হন যে, দেশের কথা—বিশেষ করে ললিত ছোকরার কথাও দেবী একবারে ভুলে গেছে। আর, তাঁরা সবাই জেনেছেন যে, দেবীর এই অসুখের মূল হচ্ছে ললিত, তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠাতেই তো এই কঠিন রোগে পড়েছিল। এখন ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হয়ে তিনি খুব শক্ত হয়েই সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, দেশ বা ললিত সম্পর্কে কোন কথাই যেন দেবীর সামনে তোলা না হয়। দেবীর অবস্থা উপলব্ধি করে সকলেই বগলাপদর কথা মেনে নিতে বাধ্য হন।

দেবী অসুখে পড়ায় রাণী শিক্ষার দিকে অনেকটা এগিয়ে পড়ে। আরোগ্য লাভের পরেও ডাক্তারের নির্দেশে দেবীর পড়াশোনা দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকে। কিছু কাল পরে সুলোচনা দেবী বলেন—রাণী যেমন বাইরে পড়ছে পড়ুক, তুই আমার কাছে বাড়ীতে পড়বি দেবী। আমি তোকে এমন সব বই পড়াব, যাতে সত্যিকার শিক্ষা হবে।

দেবী মায়ের কথা মেনে নিয়ে তাঁরই কাছে পড়ে। ভাল ভাল বাঙলা বই, রামায়ণ, মহাভারত দেবীর পাঠ্য। দিদির বই আর পড়া দেখে রাণী হাসে। কিন্তু দেবী তাতে গ্রাহ্য করে না এবং মা কিংবা বই-এর প্রতিও সে শ্রদ্ধা হারায় না।

এই পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে দুই ভগিনীর কৈশোর অতিবাহিত হয়।

৯

পূর্বোক্ত ঘটনার পর—পর্যায়ক্রমে বিভ্রান্ত ও বিত্রস্ত বৃটিশ শাসকদের প্রমাদসৃষ্ট পঞ্চাশের মর্মন্তুদ মন্বন্তর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি, মুসলিম-লীগপন্থীদের প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম জনিত সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং দেশনায়কদের নিরুপায় সিদ্ধান্ত-প্রসূত আপোষের তরবারি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমপ্রান্তবর্তী দুটি অংশকে পাকিস্তানে পরিণত করে তথাকথিত স্বাধীনতাও অর্জিত হয়েছে। এতগুলি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ একটি দ্বাদশবার্ষিকী যুগের সীমা-রেখা বেশী কিছু নয়—শত-বার্ষিকী একটা যুগ বা শতাব্দীর মধ্যে এতগুলি ভাগ্যবিপর্যয়কারী ঘটনারাজির বিস্ময়কর সমাগতি কোন দেশে কখনো সম্ভবপর হয়নি বলেই সুধীসমাজের ধারণা।

মহা অনর্থকর এই একটি মাত্র বিপ্লবী-যুগের পরিক্রমার মধ্যে এক দিকে যেমন হিংসা প্রমত্ত বিদ্বেষ ঘনিয়ে উঠে লক্ষ লক্ষ গৃহসংসার তছনছ করে দিয়েছে, অসংখ্য নর-নারী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বর্ষের পর বর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্ন আর্তস্বরের অনুরণনে আকাশ-বাতাস যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে,—পক্ষান্তরেও তেমনি যুগপূর্বে অপরিচিত, অখ্যাত, বিশিষ্ট সমাজে অপাংক্তেয় বৃহৎ একটি শ্রেণী সময়োপযোগী যোগাড়যন্ত্রের সাহায্যে লব্ধ সুযোগ, রীতিমত সাহস, কূট বুদ্ধি ও দেশের মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির সুপারিসে দেখতে দেখতে এমন একটি আধুনিক অভিজাত-শ্রেণীর স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন, তাঁদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি জাঁকজমক এখন সবার আলোচ্য ত বটেই, ব্যবসায়-জগতেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে বসেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজ এই শ্রেণীর হঠাৎ-বড়লোকদের লক্ষ্য করে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলেন—আঙুল ফুলে সব কলাগাছ হয়েছে! কিন্তু যাদের উদ্দেশে এ-সব বলা, তাঁরা কারও কথার তোয়াক্কা রাখেন না বা সাধারণ স্তরের জীবগুলিকে মানুষ বলেই মনে করেন না। তাই, এঁদের প্রতি পূর্বোক্ত ধনীদের বিরাগের অন্ত নেই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে—ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সহর ও সহর-

গুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করে অস্থায়ী ভাবে প্রাচীর ঘিরে ফেলে রেখেছিলেন। এদিকে দেশ ভাগ ও পাকিস্তান কায়েম হবার পর সেখানকার যে-সব দুর্ভাগ্য বাঙালী-পরিবার পিতৃপুরুষের ভিটা, প্রতিষ্ঠিত সংসার, আওলাত-ভরা জমিজেরাৎ পরিত্যাগ করে জাতিধর্ম রক্ষার টানে কাতারে কাতারে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসেন উদ্বাস্তু আখ্যা নিয়ে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বিত্তবান, প্রচুর ধনসম্পদ সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন, চড়া দরে ঐ সব সুরক্ষিত জমি ক্রয় করে বাসিন্দা হতে থাকেন। যাঁরা অসহায়, কায়িক শ্রম ভিন্ন এখানে জীবিকার উপায় নেই—কোন রকমে মাথা গুঁজে বসবার স্থান পেলে পরে জীবিকার ব্যবস্থা করবার আশা রাখে—তারাই নিরুপায় হয়ে দলবদ্ধ ভাবে ঐ সব পতিত জমির উপর সদ্য সদ্য পর্ণশালা রচনা করে এক একটা ছোটখাটো কলোনী বা উপনিবেশ গড়ে তোলেন। এমন ক্ষিপ্রতা ও সিদ্ধ হস্তে উদ্বাস্তুদের এই বাস্তু নির্মাণের কাজ নানা দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে যে, জমির মালিকরা জমির চেহারার পরিবর্তন দেখেই অবাক হয়ে যান। এমন কি, সহরের নানা স্থানে বনিয়াদী ধনীরাও যে সব জমি স্বত্বহানির ভয়ে প্রজাবিলি না করে কিম্বা জমি থেকে কোন রকম ফসল উৎপাদনের প্রচেষ্টায় উদাসীন থেকে দীর্ঘকাল থেকে শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করেই এসেছেন—সে সব জমিও দেখতে দেখতে উদ্বাস্তু-পরিবারে পরিপূর্ণ হতে থাকে। মালিকদের মধ্যে যাঁরা সহৃদয় ও বিবেচক, তাঁরা বাস্তুহারা দুর্ভাগাদের প্রতি সদয় হয়ে প্রজা স্বীকার করে নিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক মালিক উগ্রমূর্তি ধরে জমি থেকে তাদের উৎখাত করতে তৎপর হলেন। ফলে বাধল সংঘর্ষ, হানাহানি, পুলিশ তদন্ত, ধরপাকড়। এর ফলে এই শ্রেণীর আধুনিক বড়লোক নামে পরিচিত সম্প্রদায়—যাঁরা সদ্য সদ্য আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন—শুধু বাস্তুহারা নয়, বস্তির বাসিন্দাদের প্রতিও এমনি বিরূপ যে, কোন দরিদ্রকেই সহ্য করতে পারেন না। অনায়াসে ভুলে যান অতীতের কথা, ভুলে যান যে—তাঁরাও একদা দরিদ্র পর্যায়ভুক্ত ছিলেন!

কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, সেন্ট্রাল এভিনিউ নামে সুবৃহৎ ও প্রশস্ত

রাস্তাটিকে উত্তরাংশে সম্প্রসারিত করে ঐ অঞ্চলের স্বর্গত বিশিষ্ট অধিবাসীদের নামানুসারে স্বতন্ত্র ভাবে যে সব খণ্ড খণ্ড এভিনিউ গড়ে তুলেছেন, তারই একটা উন্নত অংশে তথাকথিত কতকগুলি আধুনিক অর্থপতি একই রকমের আধুনিক পরিকল্পনায় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার বাহার তুলে যেন নিজেদের একটা কলোনীর পত্তন করেছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে সহর অঞ্চলে এঁদের না ছিল কোন প্রতিষ্ঠা, না ছিল পরিচয় দেবার মত কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। কেহ করতেন দালালী, কেহ বা মালপত্রের আড়তদারী, সারা দেশের পণ্যবহুল মোকামগুলিতে ঘোরাঘুরি করে কেউ হয়ত পণ্যের সন্ধান এনে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধকালে কলকাতা মহানগরী যখন সরবরাহের প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার সঙ্গে এঁদের অদৃষ্টের পথ খুলে যায়। মফঃস্বলের ব্যাপার সম্পর্কে অজ্ঞ উপরওয়ালাদিগকে বেকুব বানিয়ে চালের বাজারে ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে এঁরা ব্যবসায়-জগতে মুদ্রাস্ফীতির সুযোগ সুবিধা যে ভাবে গ্রহণ করেন, দেশবাসী তার ফলে যত বড় সর্বনাশের সম্মুখীন হোক না কেন, এঁদের অবস্থা কিন্তু একেবারেই ফিরে গেল—প্রত্যেকেই এঁরা হঠাৎ বড়লোক হয়ে পণ্য-জগতে মাতব্বরী করতে লাগলেন।

বছর বারো আগেও বগলাপদ সমদ্দারকে হরগৌরীপুর গ্রমের চণ্ডীমণ্ডপে সকালে বিকালে প্রায়ই সুখদুঃখের সাথী প্রতিবেশী পশুপতি হালদারের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্পগুজব করতে দেখা যেত; তারপর কলকাতার কর্মস্থান থেকে আহ্বান আসায়—সেই বছরেই রথযাত্রার স্মরণীয় দিনে স্ত্রী সুলোচনা দেবী এবং দুই শিশুকন্যা দেবী ও রাণীকে নিয়ে সাশ্রুলোচনে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—কলকাতায় গেলেও গ্রামের মায়া কখনো কাটাবেন না, মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আসবেন, খোঁজ-খবর নেবেন, বাস্তু ভিটা যখন রেখে যাচ্ছেন, আসতেই হবে!

গ্রামের সকলেও তাই ভেবেছিলেন—সপরিবার সহরে গেলেও সমদ্দার

গাঁয়ের মায়া কাটাতে পারবেন না। বিশেষ করে, পশুপতি হালদারের সঙ্গে তাঁর যে রকম মাখামাখি হৃদ্যতা, সমদ্দারের স্ত্রী সুলোচনা ঠাকরুণ যে রকম গ্রাম-অন্ত প্রাণ, আর তাঁদের দেবী মেয়ে দু' বছর বয়স থেকেই হরগৌরী-তলায় নীলের পুজোর দিনে পশুপতির ছেলের গলায় মালা দিয়ে যে ভাবে 'কুটো-বাঁধা' হয়ে আছে, তাতে করে এ গ্রামে তাদের ফিরতেই হবে।

কিন্তু কাল-চক্রের এমনি গতি, বগলার প্রতিশ্রুতি এবং গ্রামবাসীদের প্রত্যাশা—কোনটিই এ পর্যন্ত সার্থক হয়নি। কলকাতায় গিয়ে বগলাপদ মাস কয়েক প্রিয় বন্ধু পশুপতির সঙ্গে চিঠি-পত্রে আলাপ বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু তার পর সে পাঠও বন্ধ হয়ে যায়। সে অবস্থায় পশুপতির ঘন ঘন পত্রাঘাতে বিরক্ত হয়ে বগলা এই মর্মে এক মোক্ষম পত্র দেন যে—কলকাতার অবস্থা তোমরা বুঝবে না—অর্থ এখানে উড়ে বেড়াচ্ছে, সবাই ব্যস্ত আয়ত্তে আনতে। সে জন্য অনন্যকর্মা হয়ে এরই সাধনা করছি। কখন কোথায় থাকব, কোন্ পথে পাড়ি দেব—কিছুই স্থির নেই। কাজেই এখন আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। বারোটা বছর ধরে চলবে এই সাধনা, তার পর ছুটি। তুমিও ভায়া অনন্যকর্মা হয়ে ছেলেটিকে মানুষ কর—উচ্চশিক্ষা দিয়ে কৃতবিদ্য করে তোল। বারো বছর পরেই আমরা একসঙ্গে বসে আবার করব বোঝাপাড়া।

এই হলো বগলাপদর কথা ও কাহিনী—হরগৌরী গ্রাম, তার বাসিন্দাগণ, প্রিয় বন্ধু পশুপতি এবং নিজের প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ।

বগলাপদ অধুনা বোগলা সাহেব নামে পরিচিত। এখন আর তিনি বিডন স্ট্রীটের ভাড়াবাড়ীর অধিবাসী নন। সেন্ট্রাল এভিনিউর যে অংশে আধুনিক শিল্পপতি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অভিনব আবাস-ভবন নির্মিত হয়েছে, তারই মধ্যে চক্ষুচমৎকারী প্রাসাদোপম "বোগলা-ভিলা" নামে বাড়ীখানি প্রথমেই সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সপরিবার তিনি এই বাড়ীতে এখন বসবাস করেন। বাড়ীর দেউড়ীতে গুরখা দ্বারবান, ভিতরে লন, পিছনে উদ্যান। সুসজ্জিত

ড্রয়িং রুম। চার দিকে লোকজন গিস্‌গিস্ করছে। সে দিনের বালিকা দেবী ও রাণী এখন অনুপম লাবণ্যময়ী তরুণী। রাণী এখনো তেমনি চঞ্চলা; নিত্যই কলেজ থেকে এসেই স্কুল-বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে তার পোষা পায়রাগুলোকে তাদের ঘর থেকে বাইরে এনে উড়িয়ে দেয় দূরবর্তিনী বান্ধবীদের উদ্দেশে; এইটিই তার এখনকার বড় আগ্রহের খেলা। দেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট বোনের ছেলেমানুষী খেলা দেখে। কিন্তু একদিন তাকেও রাণীর একান্ত অনুরোধে এই খেলায় নামতে হলো, তারপর এই খেলা থেকেই তার জীবনে আর এক নতুন ঘটনার প্রভাব পড়লো।

১০

ললিত এখন কৈশোরের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজের সংস্কৃত বিভাগে সে ভর্তি হয়েছে। স্কুলের পুরাতন বোর্ডিংও ত্যাগ করে কলেজ-বোর্ডিং-এর একখানি ছোট ঘরে ললিত এখন বাস করে। সেই যে গ্রাম ছেড়ে ললিত কাশীর বিদ্যানিকেতনে বিদ্যার সাধনা আরম্ভ করেছিল, তার মধ্যে কোনরূপ ছেদ আর পড়েনি, দেশের মাটি স্পর্শ করবার সুযোগও ঘটেনি। পিতা পশুপতিই প্রতি বছরে দু'বার গ্রাম ছেড়ে কাশীধামে এসে পুত্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, এমন কি তার উপনয়ন-সংস্কার পর্যন্ত সমাধা করে যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছেন।

কলেজে প্রবেশ করে ললিত কাব্যের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। দেবীর সেই ছবি ধীরে ধীরে তার টেবিল থেকে সরে গিয়ে কাচের আবরণ মধ্যে ঘরের দেওয়ালের শোভাবৃদ্ধি করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার বিবেক-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হয়ে আবাল্যের সংশক্তিশীল সংস্কারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের মুখে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের বিশদ ব্যাখ্যা তার তরুণ মনে

নূতন এক ভাবের প্রবাহ এমন উদ্দাম গতিতে সঞ্চালিত করে যে, মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থরাজির রসধারা আস্বাদন করতে সে অধীর হয়ে ওঠে। অত্যন্ত তরুণ বয়সে ললিতের এই কাব্যানুরাগ এবং বোর্ডিংয়ের ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে বসে একাকী অভিনিবেশ সহকারে এ ভাবে তার কাব্যচর্চা দেখে বোর্ডিং-এর অন্যান্য ছাত্রেরা মনে মনে কৌতুক বোধ করে। সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে যে-সব ছাত্রের কিছু কিছু পরিচয় আছে, তারা কিন্তু বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকে— কালিদাসের কাব্যের উপর নিবিড় ভাবে এতখানি অধিকার ললিত কি করে পেল? ফলে, স্কুলের ছাত্র-জীবনে ছবিকে কবিতা পড়ে শোনাবার মত, এখন একা একা উদাত্ত কণ্ঠে ললিতের কাব্যাবৃত্তি নিয়েও বোর্ডিং ও কলেজের ছাত্রগণ কৌতূহলী হয়ে নানা প্রকার মন্তব্য করল, কিন্তু ললিতের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ললিতের মনে আর একটি খেয়াল জেগে ওঠে— সেটি হচ্ছে ছবি আঁকা। কারো কাছে শিক্ষা না নিয়ে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই এই আঁকার কাজটি বরাবরই সে অতি সংগোপনে চালিয়ে এসেছে। চিত্র-বিদ্যার সাধক যাঁরা, প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজিকেই সাধারণতঃ আদর্শরূপে গ্রহণ করে থাকেন—গাছ, পাতা, ফুল, ফল, পাহাড়, নদী এমনি কত কি। কেউ কেউ বা পশু, পাখী, মানুষকে আদর্শ করে তাদের ছবি তুলে আনন্দ পান। কিন্তু ললিতের চিত্রাঙ্কনের যত কিছু সাধনা একখানি প্রতিকৃতি বা ফটো নিয়ে। সে আলেখ্য আর কারও নয়—তার বাল্যের সাথী, বালিকা—দেবীর। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, পূর্বের সেই ফটোখানি বিবর্ণ অবস্থায় কক্ষের দেওয়ালে উঠেছিল; কিন্তু কিছুদিন পরেই তার প্রতি তরুণ ললিতের নূতন এক আগ্রহ পড়ায়, আবার সেখানি আধারমুক্ত অবস্থায় তার চিত্রাঙ্কণের টেবিলে স্থান পেয়েছে। প্রতিকৃতিকে আদর্শ করে নানা প্রকার কল্পিত ভঙ্গিতে বর্ষের পর বর্ষ ধরে ললিত তার রুচির সাধনা চালিয়ে এসেছে। পাছে সহপাঠি বা মেসের বন্ধুরা ব্যাপারটি জানতে পেরে হৈ-হুল্লোড়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে, এই ভয়ে বেচারি তার আঁকা ছবিগুলি অতি সন্তর্পণে ডেস্কের ভিতরে লুকিয়ে রাখে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমেও ললিতের এই গুপ্তসাধনার কথা সহপাঠিরা জানতে পারতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করত

যে, বছর কয়েক আগে এই ছেলেটি যে বালিকার ফটোখানিকে সাথী করে কবিতা পড়িয়ে আনন্দ পেত, এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েও রঙ ও তুলি চালিয়ে তার সেই বাল্য-সাথীটিকেই নির্বিকার চিত্তে নিজের তরুণ যৌবনের সাথী করে নিয়েছে !

ছবির পর ছবি আঁকার ফলে রীতিমত একখানি য়্যালবাম তৈরি হয়ে উঠেছে। ফাঁকে ফাঁকে য়্যালবাম খুলে এক এক করে প্রত্যেক ছবিখানি দেখে সে আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। একই রকমের ছবি সব—মুখ, চোখ, নাক, চুল চিবুক কোথাও খুঁৎ নেই। বালিকা দেবীর ছবিতে মাথার চুলগুলি খাটো-খাটো ছিল, এখন নতুন ছবিতে চুলগুলি বৃদ্ধি পেয়ে তার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

পশুপতির ইচ্ছা নয় যে, ললিত ছুটি-ছাটাতেও গ্রামে এসে ছুটিটা কাটিয়ে যায়। তিনি লক্ষ্য করছেন—কলকাতাবাসী হবার পর বগলা যেন গ্রামের সম্পর্ক ছিন্ন করে নির্লিপ্ত ভাবে থাকতে ব্যস্ত। তিনি নিয়মিত ভাবে চিঠি লিখলেও বগলার কাছ থেকে অনিয়মিত ভাবে উত্তর আসে। চিঠির উক্তি-গুলিতে নতুনত্ব কিছু নেই, সেই একঘেয়ে মামুলি নির্দেশ: 'কাজের অসম্ভব ভীড়ে অবসর কম; তাঁর লক্ষ্য, অর্থ উপার্জন করে আত্মপ্রতিষ্ঠা। দুই কন্যা পড়া-শোনা নিয়েই ব্যস্ত—উচ্চশিক্ষার পথে তারা এগিয়ে চলেছে। তোমার ছেলেকেও মানুষ করে তোল, তোমার জীবনেও এটা মস্ত কর্তব্য।' এ-ধরণের চিঠি বগলার কাছ থেকে পশুপতি প্রত্যাশা করেন না—চিঠি পড়তে পড়তে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বসে দুই বন্ধুর অতীতের সেই সব প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে যায়, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে ভাবতে বসেন—সত্যই কি তবে বগলার মনে পরিবর্তন এসেছে ? সে কি গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধও কাটাতে চায় ?

কিন্তু পুত্র ললিতকে তিনি এ-ব্যাপারে তফাতে রাখতে চান। সে যদি দেবী বা বগলাদের কথা ভুলে যায়, তাতে ক্ষুব্ধ হবার কিছুই নেই, বরং তিনি খুশিই হবেন। ললিত কাশী গিয়ে অবধি তাঁকে যে সব চিঠি লিখে-ছিল, গোড়ার দিকে দেবীর কথা প্রায়ই থাকত, সেই সঙ্গে বগলাদেরও।

কিশোর বয়সে একখানা চিঠিতে আক্ষেপ করে পিতাকে জানিয়েছিল যে, দেবীকে সে চিঠি লিখেও জবাব পায়নি। দেবীর বাবা ত তাঁকে চিঠি দেন ; তিনি যেন জিজ্ঞাসা করেন—দেবী তার চিঠির জবাব দেয়নি কেন ?

এই সময় বগলারও চিঠি আসে পশুপতির নামে। সেই চিঠির মর্ম অনুসারে পশুপতি ললিতকে লেখেন : দেবীর বাবা চান, এখন তোমরা চিঠি-লেখালিখি ছেড়ে মন দিয়ে লেখাপড়া কর। সেই জন্তেই বোধ হয় দেবী তোমার চিঠির জবাব দেয়নি। তুমিও পড়ায় মন দাও ; তোমাকে ভবিষ্যতে কৃতবিদ্য দেখে ওরা আনন্দ পেলে আমিও আনন্দিত হব।

এই চিঠি পাবার পর শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিকাল থেকেই ললিতের মনের ভাবধারার গতি পরিবর্তিত হতে থাকে। দেবীর ছবিকে সামনে রেখে কবিতা পড়ার পাট বন্ধ করে খাতার পাতায় ফটোর অনুকরণে ছবি আঁকার কাজ সুরু করে দেয়। খাতার পর খাতায় পাতাগুলি ভরে ওঠে নব নব চিত্রে। সাধারণতঃ সে অত্যন্ত অভিমানী ; পিতার পত্রে দেবীর পিতার নির্দেশ তাকে রীতিমত আঘাত দেয়—তাই সে দেবীর স্মৃতি তার মনোমন্দিরে জাগিয়ে রাখবার এই অভিনব ব্যবস্থা করেছে এবং এই বিচিত্র পরিকল্পনাটি তার নিজস্ব। তার ধারণা, একদিন না একদিন দেবীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবেই ; তখন সে ছবির য়্যালবামখানি তার হাতে দিলেই সযত্নে অঙ্কিত ছবিগুলিই জানিয়ে দেবে—দেবীকে সে কি রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে মনে করে রেখেছে !

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যার দিকে মজলিস বসে, নানা কথার আলোচনা হয়। সে দিন বয়োবৃদ্ধ সত্য ঘোষাল বগলাকে লক্ষ্য করে বললেন : ব্যাপার কি হে পণ্ডিত! বগলা যে এক দম চুপ, সাড়া-শব্দ নেই, অথচ তুমিও দিব্যি চুপ করে আছ ?

পশুপতি কিঞ্চিৎ ব্যথিত হয়েই জবাব দিলেন : সহরে গিয়ে বগলা এখন টাকা চিনেছে, শুনতে পাই—মস্ত লোক হয়েছে, তাহলেও তার টাকার সাধনা বোধ হয় এখনো শেষ হয় নি—তাই চিঠি লেখে না। মনে নেই—

লিখেছিল, হু'চোখ বুজিয়ে টাকার সাধনা করবে, মেয়ে দুটোকে রীতিমত লেখাপড়া শেখাবে, শেষে লিখেছিল—সময় মত বা একেবারেই চিঠিপত্র যদি না লেখে, আমরা যেন তার জন্যে রাগ বা দুঃখ না করি। কাজের ভীড়ে সাড়া দিতে পারেনি—এই বুঝে আমাদের চুপ করে থাকতে হবে।

সত্য ঘোষাল বললেন: আমি ভেবে পাইনে, তোমার সঙ্গে তার অত মাখামাখির কথা কি করে সে ভুলে আছে? তার পর তোমার ছেলের সঙ্গে তার মেয়ে দেবীর বিয়ের কথাটাও ভেবে দেখ! বগলার মেয়ে ত সেই থেকে বাগ্‌দত্তা হয়ে আছে—দুই সইয়ে হরগৌরী-মন্দিরে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, কেউ তা ভোলে নি। তোমার স্ত্রী ছেলের মা হয়েও শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে তোমাকে কি অনুরোধ করে যান—সে কথাও কে না জানে? কিন্তু আশ্চর্য এই, বগলার কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন কথাই শোনা যায় নি, সেই ক'খানা চিঠি দিয়ে তার পর থেকে চুপ করে আছে—লম্বা কটা বছর ধরে।

পশুপতি বললেন: আমার মনে হয়, বাল্যকালে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঐ সব আলোচনা ঠিক নয়। তাতে ব্যাপারটা নানা সূত্রে এমনি জেঁকে ওঠে যে, ঐ বয়সেই ওদের মনে ভালবাসাবাসির একটা ছাপ পড়ে যায়। আমরা তখন তাই নিয়ে হাসাহাসি করেছি, আহ্লাদ করেছি, আনন্দ পেয়েছি। জানি বড় হ'তে হ'তে ওসব কথা অবিশ্যি চাপা পড়ে যাবে পড়াশোনার চাপে। কিন্তু এমন ভাবপ্রবণ ছেলে-মেয়েও থাকে—যাদের মন থেকে শৈশবের সেই সব কথা পড়াশোনার চাপেও মুছে যায় না, আগাগোড়া ব্যাপার-টাকে তারা মনে করে রাখতে চায়। এদের কল্পনার দৌড়ও খুব বেশী। ললিতের ছেলেবেলাকার এই নিয়ে গুলতানি মনে পড়ে না? ধমক পর্যন্ত দিতে হয়েছিল আমাকে। আর, ভবিষ্যৎ ভেবেই আমি ওকে এখানকার পরিবেশ থেকে সরিয়ে কাশী পাঠিয়ে দিই পড়ার দিকে যাতে মন নিবিষ্ট করতে পারে। সেটা বিশেষ করে ভেবেই পড়ার ব্যবস্থা করে দিই; বাড়ীতে যাতে হামেশা না আসতে পারে, সে জন্যে বছরে দুবার নিজে গিয়ে এখানকার খবর সব শুনিয়ে দিই, আমিও তাকে দেখে আশ্বস্ত হই। কেবল,

এ বছরই যাওয়া হয়নি; যাব যাব করছি বটে, কিন্তু হয়ে উঠছে না। শরীরে কেমন যেন জুত পাচ্ছি না। যাই হোক, আজ-কালের মধ্যেই দু'-জায়গায় দু'-খানা চিঠি লিখব ঠিক করেছি; একখানা বগলার স্ত্রীকে, আর একখানা ললিতকে।

সত্য ঘোষাল একটু শক্ত হয়ে বললেন: ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে তোমার স্বভাবটা নিতান্ত কড়া হয়ে গেছে, তাই একমাত্র ছেলেটাকে এভাবে নির্বাসনে পাঠিয়ে স্থির হয়ে আছ! বেশী কি বলব, আমার ভাগনী—ওদের ছেলেবেলার খেলার সাথী রাধার বিয়ে হয়ে গেল, তোমাকে কত করে বললাম, ললিতকে বিয়ের সময় আনাবার জন্যে, তা তুমি কিছুতেই গা করনি। জানো রাধা তার ললিতদাকে দেখবার জন্যে কত আশা করেছিল?

পশুপতি বললেন: সে কথা মিছে নয় খুড়ো। তখন শুনেছিলাম, বগলাকেও তোমরা নিমন্ত্রণ করেছিলে। সপরিবার সে এলে দেবী মেয়েটির সঙ্গে পাছে ললিতের দেখা হয়ে যায়, আবার তার মাথায় সেই সব খেয়াল চাপে, সেই জন্যে তাকে আনা বা রাধার বিয়ের কথা জানানো উচিত মনে করিনি। এ-ব্যাপারটা ঠিক সংক্রামক ব্যাধির মত, বুঝলে খুড়ো? রাধার বিয়ে হচ্ছে শুনলেই তার মাথায় এই চিন্তা ঢুকবে—তার বিয়েটা দেবীর সঙ্গে হচ্ছে না কেন, বা কবে হবে? আমি ওখানে খবর নিয়ে জেনেছি, গোড়ার দিকে দেবীর জন্য ওর চিন্তা, তার ছবিকে পড়ানো, বরাবর চলেছিল। এদানীং সে খেয়ালটা গেছে, বেশ গম্ভীর হয়ে কলেজের পড়া পড়ছে। আমার ইচ্ছা কি জানো, কলকাতা থেকে চিঠিখানার জবাব আসুক, তখন নিজে গিয়ে কথাবার্তা সব পাকা করে আসব। আর, চেষ্টা করব—গায়ে-হলুদ থেকে বিয়ে, বৌভাত সব কটা উৎসবই যাতে এখানে হয়—সারা গ্রাম সে উৎসবে যোগ দেয়।

সত্য ঘোষাল বললেন: ভালো, সেই আশাতেই থাক।

এমনি সময় ডাকঘরের পরিচিত পিওন হরিহর, চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ার নীচে এগিয়ে এসে চিঠি বাছতে লাগল। গ্রামের মধ্যে পশুপতি ও সত্য ঘোষালের নামে প্রায়ই চিঠিপত্র আসে; উভয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিওনের হাতে মোটা কাগজের মধ্যে রাখা চিঠির গোছার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হরিহর একখানি

পোষ্টকার্ড, গোছার ভিতর থেকে টেনে বার করে সসম্ভ্রমে সুপ্রবীণ ঘোষাল মহাশয়ের হাতে দিলেন।

ফতুয়ার পকেট থেকে চশমাটি বার করে চোখে লাগিয়ে সত্য ঘোষাল মনে মনে চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। কিন্তু খানিকটা পড়েই কপালে করাঘাত করতে করতে আর্তনাদ তুললেন: মা জগদম্বা, এ কি সর্বনাশ আমার করলি মা!

চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত সকলেই ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সবার মুখে এক প্রশ্ন—কি হলো? কি ব্যাপার?

সত্য ঘোষাল হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা পশুপতিকে দিলেন। তিনি এক নিঃশ্বাসে পাঠ সমাপ্ত করে সরোদনে জানালেন: সত্যিই সর্বনাশ হয়েছে সত্য খুড়োর। তাঁর আদরের ভাগনী রাধা গত বৃহস্পতিবার বিধবা হয়েছে; জামাতা বাবাজী রেলের আর, এম, এস-এ চাকরি করতেন, দুর্ঘটনায় মারা পড়েছেন।

তৎক্ষণাৎ সমস্ত পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেল। বিজ্ঞ সুপ্রবীণ সত্য ঘোষালকে সামলানো কঠিন হয়ে উঠল, কি আকুলি-ব্যাকুলি কান্না তাঁর! পশুপতি ও পাড়ার আরও জন দুই লোক তাঁকে ধরে বাড়ীতে নিয়ে চললেন।

প্রায় বছর পূর্ণ হতে চলেছে—পশুপতি পণ্ডিতের এবার আর কাশী যাওয়া হয়নি। একেই উপলক্ষ করে পাছে ললিত কাশী থেকে চলে আসে, এই আশঙ্কায় সম্প্রতি ললিতকে এক পত্র লিখেছেন তিনি। পত্রে সকলের কথাই অস্পষ্ট ভাবে থাকে। যেমন বগলাদের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, তিনি চুটিয়ে ব্যবসা করছেন বড় মানুষ হবার জন্যে, তাঁর মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিচ্ছেন—তারা যাতে আধুনিকা বলে সমাজে সম্মান পায়। এখনো সেই শিক্ষা চলেছে তাদের। সুতরাং তোমারও উচিত, শিক্ষার দিকে সমস্ত মন নিবিষ্ট করা। শেষের দিকে রাধার বৈধব্যের কথা লিখে আক্ষেপ করেন—সত্য খুড়ো এ ব্যাপারে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তাঁর কত আদরের ঐ ভাগনীটি! তিনি রাধাকে আনছেন, এখানেই সে থাকবে। তার পরে লিখেছেন, শরীরটি

কিছু দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না বলে, আমি এবার কাশী যেতে পারিনি, তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না ; একটু সুস্থ হলেই আমি তোমাকে দেখতে যাব।

চিঠি পড়ে ললিত কিন্তু রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়ল। সেই রাধা—শৈশবে যার সঙ্গে কত কলহ করেছে দেবীর পক্ষ নিয়ে, ললিতদা বলতে সে যে অজ্ঞান হ'ত...কত দিনের কত স্মৃতি মনে জড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে.. সেই রাধার এই সর্বনাশ ! আর, এ যে আরও আশ্চর্য কাণ্ড ! রাধার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ? কিন্তু এখানে কেউ বিয়ের খবরটা পর্যন্ত দিলে না। যখন বিয়ে হয়ে ছিল—তার ললিতদাকে তখন মনে পড়ে নি ? তারপর এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল তার !

এ ভাবে উচ্ছ্বাসের পর একটু থেমে কি ভেবে শিউরে উঠে বলতে থাকে : তাহলে ত দেবীরও বিয়ে হয়ে যেতে পারে ! অ্যাঁ !...দেবীর বিয়ে হবে, আমি এখানে আছি—আমাকে ছেড়ে...আকুল আবেগে চীৎকার করে ওঠে ললিত—দেবী ! দেবী ! না, না, না, আমি মস্ত ভুল করেছি, এ ভুল আমাকে শোধরাতেই হবে। আমি যাব—দেশে যাব।

পরদিনই কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে স্যুটকেশে ভরে ললিত দেশে রওনা হলো। যাবার আগে পশুপতিকে একখানা তার করে দিল।

১১

চণ্ডীমণ্ডপে বসে বয়োজ্যেষ্ঠ সত্য ঘোষালের সঙ্গে গল্প করছিলেন পশুপতি। গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছে, স্কুল এখন বন্ধ। সুতরাং গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ বেলায় পশুপতির এখন প্রচুর অবসর। অত্যন্ত আদরের ভাগিনী রাধা ভাগ্যহারা হয়ে সংসারে ফিরে আসায় বর্ষীয়ান্ সত্য ঘোষালের দেহ মন যেন এক সঙ্গে ভেঙে পড়েছে। বাড়ীতে থাকতে ভাল লাগে না, মেয়েটাকে দেখলেই বুক-খানা যেন দমে যায়, কথা বার হয় না মুখ দিয়ে। তার চেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে এসে বসলে, আর পশুপতিকে পেলে তিনি অনেকটা শান্তি পান। হাজার হোক, পশুপতি পণ্ডিত লোক, শাস্ত্র-পুরাণের প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করেন, শুনতেও ভাল লাগে। দেখতে দেখতে গ্রামের লোকও এসে জোটে। চাষের ব্যাপারে গ্রামের চাষী মজুরদের সঙ্গেও অল্পবিস্তর সংস্রব এঁদের থাকায়—অবসর পেলে তারাও আসে। নিম্নশ্রেণীর লোক হলেও, চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসবার জন্য আলাদা মাদুর-জাতীয় 'ঝাঁতাল' নামক বস্তু গুটানো থাকে, এরা এসে নিজেই পেতে বসে। কর্ত্তৃপক্ষের কেউ তামাকের ডেলা নিক্ষেপ করেন এদের দিকে; উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল হয় না, তৎক্ষণাৎ সেই ডেলা থেকে দরকার মত অংশটুকু কেটে নিয়ে ডলাই মালাই করে কলিকায় ভরে। দাওয়ার এক পাশে থাকে আগুনের মালসা; বলের আকারে শুষ্ক বিল-ঘুঁটে ও তুঁষের সাহায্যে তার মধ্যে আগুনকে জীইয়ে রাখা হয়। পল্লী অঞ্চলে চণ্ডীমণ্ডপের এটিই একটি বিশিষ্ট উপাদান এবং এই ভাবে তামাক সাজাটিও সুপরিচিত। লোক-সংখ্যার অনুপাতে এক সঙ্গে তিন চারিটি কলিকা প্রস্তুত করা হয় এবং মজলিসে হাতে হাতে ফিরতে থাকে। বলা বাহুল্য, নিম্নশ্রেণীর অভ্যাগতেরাও এই মধুর তাম্রকূট সেবায় বঞ্চিত হয় না।

পশুপতি ইদানীং নানা প্রকার আধ্যাত্মিক কথা তুলে সত্য ঘোষালের শোকতপ্ত অন্তরে শান্তিধারা বর্ষণের চেষ্টা করেন এবং তাঁকে বলেন: রাধুকেও

এমনি করে বোঝাবেন। আপনাকে বলাই বাহুল্য, অভিভাবকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন মেয়েকে এমন ঘরে দিতে, তার অদৃষ্ট মন্দ হলেও যেন আবার গলগ্রহ না হয়, কিম্বা পথে এসে না দাঁড়ায়। আপনি গোড়াতেই ভুল করেছিলেন; একান্নবর্তী কোন বড় সংসার দেখে রাধুকে দেবার চেষ্টাই করেন নি। সাবেক সংসার থেকে পৃথক হয়ে ছেলে বেরিয়ে এসে নতুন সংসার পেতে বসেছে, ভালো উপার্জনও করছে, এই দেখেই আপনি ভুলে গেলেন। জামায়ের অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাধুকে তাই চোখে অন্ধকার দেখতে হলো, আপনাকেই ছুটে গিয়ে নিয়ে আসতে হলো। কিন্তু গোড়াতেই ছিল আপনারই দোষ।

বিস্ময়ের স্বরে সত্য ঘোষাল বলে ওঠেন: আমার দোষ! তুমি এ কথা বলছ পশু?

পশুপতি বলতে লাগলেন: হ্যাঁ খুড়ো, যেটা সত্য তাই বলছি। রাধু যদি উপযুক্ত শিক্ষা পেত, স্বামীর ঘরে গিয়েই আগে স্বামীর ভুল ভেঙে দিত, জোর করে বলত—বিয়ের আগে ঝগড়া করে আলাদা হয়েছিলে, এখন বিয়ে যখন করেছ,—আবার সেখানে ফিরে চল ঝগড়াঝাঁটি সব মিটিয়ে ফেলে। কিন্তু রাধু তা করেনি, ভাঙা সংসারও মিলে-মিশে এক হয়নি। তাহলে আজ তাকে তোমার গলগ্রহ হতে হবে কেন? তবে এখনো হয়ত মিটমাট করা যায়—কিন্তু সেটা খুব শক্ত।

সত্য ঘোষাল জোর গলায় বললেন: সে অসম্ভব—হতে পারে না, ও কথা ছেড়ে দাও বাবাজী! এখন মেয়েটা যাতে এখানে থেকে শান্তি পায়, যে জ্বালায় দিন-রাত জ্বলছে, তার একটু উপশম হয়—সেইটে করতে হবে।

পশুপতি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: দেখুন, দুঃখ জ্বালা হচ্ছে আমাদের নিত্য সাথী। সংসারে থাকতে হলে এর দহন সইতেই হবে। তবে আমরা ত সব দিকেই হিসাব করে চলি, কাজেই এই জ্বালার মধ্যেই কিছুটা আরাম খুঁজে নিয়ে শান্তি পেতে চাই। তখন সত্যই মনে হয়, যে দুঃখ-জ্বালা জীবনে উপভোগ করেছি, তার কিছু সার্থকতা হয়ত আছে। এই জন্যই সংসারে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে অভ্যস্ত হই। শেষ পর্যন্ত আমরা যদি এই লড়াইকে জয় করতে পারি, তাহলে

দুঃখ জ্বালায় আর ভয় থাকে না—কেন না, আমরা তাকে জয় করে ফেলেছি। এই সময়কার আনন্দ সত্যই উপভোগ্য, এর তুলনা নেই। রাধুকে তাই সেদিন বোঝাচ্ছিলুম—'দুঃখ জ্বালা অনেক পাবে দিদি, কিন্তু শক্ত হয়ে সইতে হবে। এগুলো মনকে অনেক রকমে নাড়া দিয়ে বিরক্ত করে তুলবে, হয়ত আশার কোন আলোও দেখাবে, কিন্তু তোমাকে স্থির হয়ে থাকতে হবে, ভগবান যে দণ্ড দিয়েছেন, তাঁরই দান ভেবে সইতে হবে। এর পর দেখবে, তিনি নিজেই আনন্দময় হয়ে তোমার দেহ মন আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশ ও সমাজের বড় বড় মহীয়সী মহিলাদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে, অল্প বয়সে বৈধব্যের জ্বালা ভোগ করেও তাঁরা আনন্দ-ময়ীরূপে দেশ ও জাতির কত কল্যাণ করে গেছেন, আনন্দ দিয়েছেন।' এখন খুড়ো, রাধুকেও আপনি সংসারে এমন করে জড়িয়ে দিন, ও জানুক—তার জীবনের যা কিছু কর্তব্য এদের সেবায়—এদের অভাব দুঃখ মোচন করে আনন্দ দেওয়ায়।

পশুপতি এই ভাবে উপদেশ দিতে থাকেন। চণ্ডীমণ্ডপে প্রথমে ছিলেন সত্য ঘোষাল ও পশুপতি, পরে এসেছেন পাড়ার আরও অনেকে—চাষী মজুররাও দু-চার জন এসে জুটেছে। পশুপতির কথাগুলি সকলেই নিবিষ্ট মনে শুনছে। এমন সময় একটু তফাতে রাস্তাটার বাঁকের মুখ থেকে মিলিত কণ্ঠের স্বর শোনা গেল : ওগো হালদার মশাই—

শব্দ শুনে পশুপতি হালদার মুখের কথা বন্ধ করে সামনের দিকে তাকালেন। গ্রামের দুই প্রৌঢ় ব্যক্তি শিবরাম ও নরহরি তখন আরো একটু এগিয়ে এসে চেঁচাচ্ছিল : চেয়ে দেখেন ত—কে এয়েছেন ?

পশুপতির সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত সকলেই দেখলেন—হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘাকৃতি গৌরকান্তি এক যুবক অবলীলাক্রমে সুবৃহৎ একটি সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসছে।

চেয়ে চেয়ে দেখবার মত চেহারা বটে! এমন সুশ্রী শ্রীমান্ সর্বাঙ্গসুন্দর যুবা এ অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। পশুপতি প্রথম দৃষ্টিতেই চিনলেও, সত্য ঘোষাল বা পাড়ার বাসিন্দারা স্থির করতে পারেন নি যে, পশুপতি

হালদারের পুত্র ললিতই দীর্ঘকাল পরে স্বগ্রামে উপস্থিত হয়েছে। তবে যে দু'টি লোক আগে থেকেই চীৎকার করছিল, পথেই আলাপ করে তার পরিচয়টি জেনেছিল। আর, প্রবাস থেকে গ্রামের ছেলে নিরাপদে গ্রামে এসেছে শুনে পশুপতির বিশেষ আহ্লাদ হবে ভেবেই তারা গ্রাম্য পরিভাষায় মিলিতকণ্ঠে খবরটির আভাস দিচ্ছিল।

চলার পথ, আশে পাশের ঘর-বাড়ী, আর সামনের চণ্ডীমণ্ডপটির দিকে চাইতে চাইতে ললিত ধীরে ধীরেই আসছিল। সিঁড়ির কাছে এসে সে সন্দিগ্ধ ও বিস্মিত গ্রামবাসীদের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সুটকেশটি নামিয়ে রেখে প্রথমেই ভূমিষ্ঠ হয়ে পিতাকে প্রণাম করল। তার পর সত্য ঘোষাল এবং অন্যান্য কতিপয় বর্ষীয়ান গ্রামবাসীকে প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল: আমি ললিত। আপনাদের মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি—আমাকে অনেকে চিনতে পারেন নি।

পশুপতি বললেন: কি করে চিনবেন বল? বারো তেরো বছর বয়সে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলে, তার পর আর একটা যুগ কেটে গেছে; চেনা কি সহজ কথা!

সত্য ঘোষাল মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন: পথের ওপর নজর পড়তেই আমার মনেও এমনি একটা সন্দেহ হয়েছিল; মনে মনে ভাবছিলুম, এমনি সময়—

ললিত বলল: আপনাকে আমি কিন্তু চিনেছি দাদামণি—রাধার আপনি মামা বাবু!

সত্য ঘোষাল ধরাগলায় বললেন: আশীর্বাদ করি বেঁচে থাক দাদা, সুখী হও, মনস্কামনা পূর্ণ হোক। তোমাদের ছেলেবেলার খেলা, ঝগড়াঝাঁটি, চড়িভাতি, হৈ-হল্লোড়—সবই মনে পড়ছে। দেবী আর রাধি ছিল তোমা-অন্ত প্রাণ—ওদের 'ললিতদা' ডাক এখনো যেন কানে বাজছে। সে খেলাঘর নেই, কিন্তু খালি জমিন পড়ে আছে, সে দিকে তাকালেই তোমাদের কথা মনে জেগে ওঠে। রাধি এখনো তার মায়া কাটাতে পারেনি, বাইরের দিকে এলেই ঠায় তাকিয়ে থাকে—চোখের জল সামলাতে পারে না। সেই সদাই

হাসিখুসি, আমুদে মেয়ের কি দশা হয়েছে, সব ত শুনেছ ? এখন এক মুঠো ভাতের কাঙাল হয়ে সেই মামারবাড়ীর ওপরেই ভর করতে হয়েছে—বরাত, বরাত !

সত্য ঘোষালের কথাগুলি শুনতে শুনতে ললিতের চোখ দু'টি ছল-ছল করতে থাকে, গলায় স্বর গাঢ় হয়ে ওঠে, আর্তকণ্ঠে সে বলতে লাগল : কিন্তু আমারও এমনি বরাত, রাধার বিয়ের খবরটিও পাইনি। সেদিন বাবার চিঠিতে জানলুম, স্বামীকে হারিয়ে সে আবার মামার বাড়ী ফিরেছে। এ খবর পেয়ে আর থাকতে পারলুম না, আসবার খবর না দিয়েই—

পুত্রের আকস্মিক আগমনে পশুপতি বিস্মিত হয়েছিলেন, এখন উপলক্ষটি বুঝে বললেন : তাহলে আমার চিঠি পেয়েই চলে এসছ বল ? কিন্তু এত ব্যস্ত না হয়ে চিঠি পাঠালেও পারতে।

ললিত বলল : অপরাধ নেবেন না বাবা, রাধার ব্যাপারে আমার মনে হলো, আমাকে যেন পর করে রাখা হয়েছে। তার বিয়ে হলো, সে খবরটিও আমি পেলাম না, জানি না আরো কত খবর—

সত্য ঘোষাল বললেন : রাধার বিয়ের সময় তার খেলার সাথীদের আনবার খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পড়ার ক্ষতি হবার ভয়ে তোমার বাবাই আপত্তি করেছিলেন। বড় আশা ছিল—বগলা সপরিবারে আসবে, কিন্তু তারাও আসতে পারেনি। এ জন্যে রাধার কি দুঃখ ! দেখা ত হবেই, সব শুনবে'খন।

পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠে সস্নেহে পুত্রকে বললেন : বাড়ী চল, হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হবে, সারা রাত ত—

ললিতও সবিনয়ে বলল : আজ্ঞে হ্যাঁ, গাড়ীতে ভীষণ ভিড় ছিল, সারা রাত বসেই কাটিয়েছি, ঘুমাতে পারিনি। চলুন।

হাতের ব্যাগটি মেঝের উপর রেখে ললিত এতক্ষণ কথা বলছিল। এখন হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিল। পশুপতি জনৈক চাষীকে লক্ষ্য করে বললেন : গোপীনাথ, ওটা নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দাও ত।

আদেশটি শুনেই যেন কৃতার্থ হয়ে শশব্যস্ত ভাবে সে ব্যক্তি ব্যাগটি নেবার জন্যে এগিয়ে গেল, কিন্তু তার আগেই ললিত সেটি তুলে নিয়েছিল। গোপী-

নাথকে তৎপর দেখে স্নিগ্ধ স্বরে সে বলল: না, না, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না—আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি। বামুনের ছেলে হলেও ভারি জিনিস বইতে আমি ভয় পাইনে, আর সে সামর্থ্যও যখন আছে।

ললিতের কথাগুলি অনেকেরই অন্তর স্পর্শ করল, সত্য ঘোষাল সহর্ষে বললেন: বেশ, দাদা বেশ। এই ত মানুষের মত কথা। জানো ললিত, এই গ্রামে সবার চেয়ে আমার বয়স বেশী, কিন্তু দৈহিক খাটা-খাটুনিতে সবাই আমার নীচে।

পিতার পিছু পিছু ললিত বাড়ীর দিকে চলল। গ্রাম্য প্রতিবেশীরাও গৃহাভিমুখী হলেন। কেবল কৃষী-মজুর কয়জন চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নীচে উঠানে নেমে পরামর্শ করতে লাগল যে, এত বেলায় হালদার মশায়ের ছেলে এলেন, উনিও বামুনপণ্ডিত মানুষ, ভাতে-ভাত আর দুধ-কলা যথেষ্ট, কিন্তু জোয়ান ছেলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ত করা চাই।

তখনই স্থির হয়ে গেল, কার বাড়ীতে বিলের মাগুর মাছ জীয়ানো আছে, মানকচু কে আজ সকালেই তুলেছে, কার ক্ষেতের পটোল ভালো—এমনি, কে কি নিয়ে অবিলম্বে হালদার মশায়ের বাড়ীতে হাজির হবে! যেতে যেতে এরা বলতে থাকে: সংসারে মা-ঠাকরুণ ত নেই—ওনাকেই সব করতে কর্মাতে হয়। কত কাল পরে ছাবাল এলেন—তাঁর তরে সেবা যত্ন করাও ত গাঁয়ের মনিষ্যির কাজ গো! মোরা কি চুপ করে থাকতি পারি? চল চল।

হালদার ঠাকুরের বাড়ীতে বহু দিন পরে তাঁর ছেলে এসেছেন, বাড়ীতে মা-ঠাকরুণ নেই; তাহলেও তারা যখন একই পাড়ায় রয়েছে, ঠাকুরকে দেখা-শোনা ত তাদেরই দায়—একটা বড় রকমের কর্তব্য। কাজেই, তাদের বাড়ীতে যা ক্ষেতে-খামারে, পুকুরে ঠাকুরদের সেবায় লাগাবার মত যা যা আছে—পটোল, ঝিঙে, ফুটি, কাঁকুড়, শাকসব্জী, মাছ, দুধ এই সব, তাড়াতাড়ি যোগাড় করে আনবার জন্য এরা সব ব্যস্ত হয়ে ছুটল। পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত কৃষী-সমাজও পল্লীর গৌরবস্বরূপ উচ্চবর্ণের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি দেশের এই দুর্দিনেও এমনি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন!

আহারাদির পর পশুপতি শয্যায় আশ্রয় নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এর আগেই তিনি পাশের ঘরে ললিতকে বলে গেছেন—'সারা রাত গাড়ীতে যখন ঘুম হয়নি, খানিকটা ঘুমিয়ে নাও আগে, তার পর যাদের সঙ্গে দেখাশোনা করা দরকার—যেও।' কিন্তু তিনি ঘুমালেও ললিতের চোখে ঘুম আসেনি, সে জানালায় বসে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুঝতে চেষ্টা করছিল, কাছেই কি কি পরিচিত স্থান আছে—এখান থেকে দেখা যায়, তখন দেবীর সঙ্গে যে স্থানগুলিতে সে খেলা করত!

কিন্তু স্থানগুলির অনেক কিছু পরিবর্তন হলেও, ললিতের মনে হয়—প্রত্যেকটি চেনা জায়গা। এখন হয়ত তার ওপর গাছপালা হয়েছে; আগে যেটা খালি পড়ে ছিল—এখানে সেখানে বাগান হয়েছে, কোনখানে বা গরুর গোয়াল উঠেছে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানটি এত দিন পরে দেখেও সে চিনেছে। দেবীকে নিয়ে এই সব জায়গায় কত ছুটাছুটি করেছে, কত রকমের কত খেলা। একটি একটি করে অতীতের কথা ললিতের মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মনটিও বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে—বর্তমানের কথা ভেবে। সে ত আবার ফিরে এসেছে, পরিচিত জানালার গরাদের উপর মুখখানা রেখে সবই দেখছে; কিন্তু দেবী এখন কোথায়? সেও যদি আজ এখানে থাকত, এই জানালায় এসে তার পাশটিতে বসত, তাহলে—

'ললিতদা!'

ঘরের দরজার কাছ থেকে নারীর কোমল কণ্ঠের এই ডাকটি শুনে ললিত শিউরে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, একটি মেয়ে দরজার এক পাশের চৌকাঠটি ধরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। পরনে তার চুলপাড় একখানি কাপড়, তার আঁচলটা ঘোমটার মত করে সীমন্ত পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে, মুখের কিছুটা দেখা যাচ্ছে! অতীতের চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিল ললিত, কল্পনায় কত দৃশ্যই সে দেখছিল, অকস্মাৎ এই বাস্তবদৃশ্য চোখে পড়তে সচকিত হয়ে ললিত জিজ্ঞাসা করল: কে?

মূর্তি এগিয়ে এসে জানালায় উপবিষ্ট ললিতের সামনেই মেঝের উপর ঢিপ করে মাথা ঠুকে বলল: আমাকে চিনতে পারলে না ললিতদা? জানালায়

বসে চেয়ে চেয়ে ত সব দেখছিলে, চিনতে পার কি না—তার মধ্যে রাধাকে মনে পড়ল না ?

উৎফুল্ল হয়ে জানালা থেকে উঠে তক্তপোষে বিছানো বিছানার উপর বসতে বসতে ললিত বলল : ওহো—তুমিই তাহলে রাধা ? দেখ কাণ্ড—বাবার চিঠিতে তোমার কথা পড়ে মনটা এমনি খারাপ হয়ে গেল যে, আর সেখানে তিষ্ঠুতে পারলুম না, কোন খবর না দিয়েই চলে এলুম ! কোথায় আমি যাব তোমাকে দেখতে, তা নয়—তুমিই আগে এলে, আর—আমি কিন্তু তোমাকে চিনতেও পারিনি ! এরকম কাণ্ড কখনো দেখেছ ?

মুখ টিপে হেসে রাধা বলল : ও এমন হয়—কত কাল পরে দেখা বল দেখি, মাঝে কতগুলো বছর চলে গেছে, দেখা-শোনা দূরে থাক—এক-আধখানা চিঠিও কেউ কাউকে লিখিনি, এতে কি হঠাৎ দেখে চেনা যায় ?

ললিত বলল : আমাকে ত তোমরা সবাই মিলে পর করে রেখেছিলে। এত দিন একাটি সেখানে কাটিয়েছি। এই দেখ না, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, আমাকে একখানা চিঠিতেও কেউ খবরটা দেয়নি ! বাবার চিঠিতে সেদিন খবর পেলুম—কি বিশ্রী বল ত ? চিঠিতে সব জেনে আমার মনে যে কি কষ্ট হয়েছিল—তা আর কি বলি ? রাতে ঘুমুতে পারিনি। ঐ জানালায় বসে বাইরে চেয়ে চেয়ে আগেকার সেই সব কথা ভাবছিলুম, খেলা করিছি, ভাব করিছি, আড়ি দিয়েছি, ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু তবুও কত আনন্দে থাকতুম ! আবার সেই আগেকার দিনে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে।

রাধা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল : সে দিন আর এ জীবনে আসবে না ললিতদা ! ঐ যে দেবীরা—গাঁয়ের কথা একেবারে ভুলে গেছে, ওদের কেউ কোন খবর আমাদের রাখে ? তোমার সঙ্গে ত দেবীর কত ভাব ছিল, একটু চোখের আড়াল হলে কি ছটফটানি ! কিন্তু এখন একেবারে চুপ ! তোমাকে চিঠিপত্র কিছু দেয় ?

মুখখানা ম্লান করে ললিত বলল : কিচ্ছু না ! আমি ত চিঠি দিয়েছিলুম, কিন্তু তার জবাব কি পেয়েছি ? বাবাকে দেবীর কথা লিখতে জানালেন—

এখন খালি পড়াশোনা কর, ওরাও পড়াশোনা করছে। এ সময় চিঠি লেখালিখি ঠিক নয়। সেই জন্যে ত চিঠি লিখি না।

: আচ্ছা, দেবীকে তোমার মনে আছে? দেখলে চিনতে পার?

: তুমি বলছ কি? দেবীকে আমার মনে নেই! জানো, চোখ বুজালেই তাকে দেখতে পাই!

প্রশ্নের জবাবটি শুনে রাধা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে, বিস্ময়ে মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়। তাকে নির্বাক দেখে ললিত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গলায় একটু জোর দিয়ে বলতে থাকে: চুপ করে রইলে যে—বিশ্বাস হলো না? জানো, সারা রাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি দেবীকে স্বপ্ন দেখি! কত কথা হয়, দুজনে হাত ধরাধরি করে কত জায়গায় আমরা ঘুরে বেড়াই! তাহলেই বল—তাকে ভুলতে পারি?

রাধা বলে: ভারি তাজ্জবের কথা ত! স্বপ্নে দেবীকে দেখ, তার সঙ্গে বেড়াও, গল্প কর—বা! তাহলে ত তুমি দিব্যি আছ ললিতদা! ওদিকে, দেবীও যদি এমনি করে তোমাকে স্বপ্নে দেখে, তাহলে ত—

রাধার কথায় বাধা দিয়ে ললিত বলল: এ হচ্ছে এক রকম সাধনা—বুঝেছ? প্রিয়জনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেও, যদি তাকে একাগ্রচিত্তে ভাবা যায়, তার মূর্তি—চেহারা মন থেকে না মুছতে চায়, তাহলে আমাদের অবচেতন মন জুড়ে সে ত থাকবেই। জেনো, আমাদের ছেলেবেলাকার ভালবাসা বাজে নয়, মিছে নয়, ছেলেখেলা নয়। তুমি ত জানো, শুনেছ—হরগৌরীর মন্দিরে আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে হরগৌরীকে বলেছি—যেন আমাদেরও এমনি মিলন হয়। ছেলেবেলার সে কথা আমি কোন দিন ভুলিনি।

: তুমি ত ভোলনি বুঝছি, কিন্তু দেবী যদি ভুলে যায়? সে যদি তোমার কথা মনে না রাখে?

: সে হতেই পারে না; তবে আমি কিসের সাধনা করছি? আমাকে সে ভুলতে পারে না।

ললিতের মুখে দৃঢ়তার ভংগি দেখে রাধা পুনরায় বিস্ময়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাকে নিরুত্তর দেখে ললিত বলল: বুঝতে পারছি, আমার

কথাগুলো তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা আমি তোমাকে এমন কতকগুলি জিনিস দেখাব, তুমি তাহলে বুঝতে পারবে—আমি বাজে কথা বলি না। কাশীতে গিয়ে অবধি আমি দেবীকে নিয়ে কি রকম সাধনা করেছি, তাও বুঝতে পারবে। অথচ, বাবার কথারও অবাধ্য হইনি—পড়াশোনায় ফাঁকি দিইনি। যদিও আমি ওখানকার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশতাম না, তবুও ওখানে আমি ভাল ছেলে বলেই সুনাম পেয়েছি। সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতরা আমাকে দেখলেই বলেন—সত্য যুগের ছেলে।

রাধা বলল : কি জিনিস সব দেখাবে বললে ?

তাড়াতাড়ি উঠে ললিত বলল : দেখাচ্ছি। দেখ, আমার মনটা ভারি ভুলো—খালি খালি ভুলে যাই। দেবীর কথা হলেই এ রকম হয়। দাঁড়াও, সুটকেসটা আনি—ওরই মধ্যে সেগুলো আছে।

ঘরের দেওয়ালের দিকে থাক দিয়ে সাজানো ঘেরাটপ দেওয়া তোরঙ্গগুলির উপর ললিতের প্রকাণ্ড সুটকেসটি ছিল। সেটি সেখান থেকে তুলে বিছানায় এনে রাখল। গায়ের ফতুয়ার পকেট থেকে চাবিটি বার করে ডালাটি খুলতেই বিঘত পরিমিত একই আকারে বোর্ডে আঁকা ছবির বাণ্ডিলগুলি দেখা গেল। বেছে বেছে বিভিন্ন বাণ্ডিল থেকে কিছু-কিছু আঁকা ছবি রাধার সামনে বিছানার উপর বিছিয়ে দিয়ে ললিত বলল : যার ছবি তাকে ত পাচ্ছি না—তুমিই দেখ।

সামনে সাজানো ছবিগুলি এক একখানি তুলে রাধা দেখতে থাকে। দেবীর শৈশব কালের সেই বয়সের ছবি—যখন ললিতের সঙ্গে তার নানা রকম খেলা-ধূলা চলত। যদিও তখনকার ছবিগুলি খুব সুন্দর বা চোখে লাগবার মত হয়নি, তথাপি ছবি দেখেই চেনা যায় যে—মেয়েটি আর কেউ নয়, দেবী। বিস্মিত হয়ে চোখ দুটো বড় করে ললিতের দিকে চেয়ে রাধা বলে : তুমি এঁকেছ ললিতদা ? কি করে আঁকলে বল না ? ওখানে গিয়ে ছবি আঁকার বিদ্যে শিখেছিলে বুঝি কোন ইস্কুলে গিয়ে ?

মুখখানা বিকৃত করে ললিত বলে : দূর ! ইস্কুলে গিয়ে আবার আঁকা শিখলুম কবে ? এ সব আমার নিজের আঁকা, অবিশ্যি দেবীর যে

ফটোখানা পেয়েছিলাম—সেইটিই হচ্ছে আমার আদর্শ, তাই দেখে এই ছবি এঁকেছি।

ললিত পর পর সাজিয়ে দেয় ছবিগুলি—রাধার সুবিধার জন্য। পরের ছবি দেখে সে আরো বেশী রকম বিস্মিত হয়ে ওঠে—এ ছবিতে আঁকা দেবীর চেহারা আরও স্পষ্ট মনে হয়। সেই ডাগর ডাগর চোখ, হাসিমাখা মুখ, টিকালো নাক, এক মাথা চুল! রাধা বিস্ময়োল্লাসে গলায় জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: কিন্তু সে কলকাতায়, তুমি কাশীতে, দেখা সাক্ষাৎ নেই—কি করে তবে আঁকলে তার ছবি? ভারি আশ্চর্য ত!

ললিত বলল: তবে বলছিলাম কি? সে কলকাতায় গেলেও, আমি ত তাকে ভুলে যাইনি! আমার বুকের ভিতরে সে থাকে; স্বপ্নে তাকে দেখি! আমি কি ভাবতুম জানো—আমার মতন দেবীও ছেলেবেলার সব কথা মনে করে রেখেছে। তা হলে বড় হলেও কিছুই ভুলবে না।

এমনি করে পরে আঁকা ছবিগুলিও ললিত রাধাকে দেখায়। রাধার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে-থাকে; মনে মনে ভাবে—এ কি অদ্ভুত মানুষ ললিত দা, এমন তো কখনো দেখিনি! চোখে না দেখে, শুধু অনুমান করে মনে ভেবে ছবি আঁকা! সত্যিই, ললিতদা বাড়িয়ে কিছু বলেনি—সাধনা ছাড়া এ সব হয় না। শেষের ছবিগুলি দেখতে দেখতে রাধা মুখখানি ম্লান করে বলল: ইচ্ছে করছে ছবিগুলি নিয়ে কলকাতায় যাই—দেবীকে দেখাই, তার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি ঠিক হয়েছে কি না! কিন্তু সে ত হবার নয়—সেদিকটা যে এখন অন্ধকার!

কথাটা শুনেই ললিত জিজ্ঞাসা করল: কেন—অন্ধকার বলবার মানে? হবার নয় বললে কেন, এক দিন ত হবেই—তবে?

রাধা বলল: এমনি বলছিলুম। দেবীর বাবা ত গিয়ে অবধি গাঁয়ের খোঁজখবর রাখেন না; দেবী কিম্বা রাণী গ্রামের কাউকে কোন চিঠিপত্রও দেয় না। তোমার বাবাকেই যা কালে ভদ্রে কখনো কিছু কিছু খবর দিয়েছেন। তাতেও না কি দেমাক দেখিয়েছিলেন শুনতে পাই। তাঁর এত কাজ যে নিজের গাঁয়ের খবর রাখেন, তার অবসরও নেই! মেয়েরাও দিনরাত

পড়া নিয়ে আছে, তিনি তাদের আধুনিকা না করে ছাড়বেন না। তাহলে এখন বোঝ—তোমার দেবী আধুনিকা হচ্ছেন।

ললিত একাগ্রমনে কথাগুলি শুনছিল, শেষের 'আধুনিকা' কথাটার উপর জোর দিয়ে রাধা বলতে, সেও গলায় জোর দিয়ে বলল: সে ত ভাল কথা গো, যদি সে আধুনিকা হতে পারে! আধুনিকা হওয়াকে তোমরা কি খারাপ বলতে চাও? আধুনিকা মেয়ে বলতে কি তোমরা সেই সব মেয়েদের বোঝ—যারা সাজ-পোশাকের বাহার তুলে হুল্লোড় করে বেড়ায়? না, তা নয়—আধুনিকা বলতে আমি তাকেই বুঝি—মনের জোরে যে নতুন কিছু করে তাক লাগিয়ে দেয়; নিজের মনে যেটি ভাল ভাবে, তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে; নিজের বুদ্ধিতে যে ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বুঝে নিতে পারে; সেই ত সত্যকার আধুনিকা।

কথাগুলি রাধার ভাল লাগল না; মৃদু হেসে বলল: শুনিছি, তুমিও অনেক পড়া-শোনা করে পণ্ডিত হয়েছ, আধুনিকা মেয়েদের সম্বন্ধে তাই ওকালতি করলে; কিন্তু এখানে সবাই জানে, খুব লেখা-পড়া শিখে লজ্জা-সরম কাটিয়ে যারা স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়, গুরুজনদের কোন তোয়াক্কাই রাখে না—তারাই হচ্ছে আধুনিকা।

ললিত মৃদু হেসে বলল: এ নিয়ে তর্ক করে ফল নেই। দেবীর সম্বন্ধে তুমি যাই বল না কেন, আমি কিন্তু মনে মনে জেনে রেখেছি, লেখা পড়া শিখে খুব যদি বিদুষীও সে হয়, আমাদের ছেলে-বয়সের সে-সব কথা কিছুতেই সে ভুলবে না।

রাধা বলল: তাহলে এক কাজ কর ললিতদা, কলকাতায় নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা কর। তোমাকে দেখলে দেবী কি বলে, তোমার সম্বন্ধে তার মনের কি ভাব, নিজে জেনে এস। আর যদি দেখ তোমার কথা মনে নেই তার, ভুলে গেছে, তখন ছবিগুলি তাকে দেখাবে, তাহলেই—

রাধার কথায় বাধা দিয়ে ললিত বলল: না, আমি নিজে থেকে ওদের খোঁজ-খবর নিই, বাবা সেটা পছন্দ করেন না। বাবার অমতে আমি কিছু করতে চাই না। তবে বাবাকে একবার কলকাতায় যাবার কথা বলব;

কেন না, এ পর্যন্ত কখনো কলকাতা আমার দেখা হয়নি। বঁধূ বলেন, তাহলে রথ দেখা আর কলা বেচা দুটো কাজই হবে—কি বল ?

একটু মুচকি হেসে রাধা বলল : রসিকতাও জান দেখছি। আমি এতক্ষণ ভাবছিলুম, পশ্চিমে-পাহাড়ে দেশে থেকে মনটাকেও পাথর করে ফেলেছ— দেবী ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু জানো না, কিন্তু দেখছি—তা নয়।

ললিত বলল : তা যদি বল—এক দিক দিয়ে আমিও আধুনিক। কথা অনেক জানি, কিন্তু সেগুলি স্থান-কাল-পাত্র বুঝে হিসেব করে বলি। কথার মত কথা শুনলে জবাব দিই, নতুবা মুখ বুজিয়ে থাকি, আমি যতদূর জানি, তাতে মনে হয়—দেবীর স্বভাবটিও এমনি, আর সেও এমনি আধুনিকা।

রাধা বলল : সে হিসেব ত কবিনি ; কিন্তু একই মানুষকে নিয়ে একই ভাবে তোমার মত কাউকে বাপু ঘ্যানোর ঘ্যানোর করতে দেখিনি। এসে অবধিই ত খালি—দেবী, দেবী, দেবী ! বলি, এই যে এতগুলো ছবি এঁকেছ, সবই ত দেখছি দেবীর ! দেবী ছাড়া গাঁয়ের আব কোন ছেলে মেয়ের সঙ্গে মেশোনি কোন দিন ? চেন না আর কাউকে ? কই, তাদের কারও ছবি ত একখানাও দেখতে পেলুম না ? ভেবেছিলুম, হয়ত আমার ছবিও অন্ততঃ একখানা এঁকেছ দেখব ! কিন্তু পোড়া কপাল আমার—সে গুড়ে বালি !

ললিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তার পর ধীরে ধীরে বলল : এর জন্যে আমাকে তুমি বৃথাই দুষছ ! গোড়াতেই ত বলেছি, এ আমার সাধনা। দেবী ছাড়া আর কারও ছবি আমি আঁকতে পারি না—কিছুতেই না ; তাহলে আমার সাধনা যে পণ্ড হবে।

রাধা একটু উষ্ণ হয়ে জিজ্ঞাসা করল : কেন ?

ললিত এর উত্তর দিল : জানো, রাবণ সীতাকে ধরে নিয়ে গিয়ে অশোক-বনে লুকিয়ে রাখেন, তার পর সীতার জন্যে রাম-রাবণে লড়াই বাধে, আর রাবণের সেরা সেরা সেনাপতিরা একে একে রামের হাতে প্রাণ দিতে থাকে ; তখন নিরুপায় হয়ে রাবণ অকাল নিদ্রা থেকে দুর্দ্ধর্ষ ভাই কুম্ভকর্ণকে না জাগিয়ে আর পারলেন না। কুম্ভকর্ণ তখন রাবণকে বললেন—এত সব হাঙ্গামায় কি দরকার ছিল দাদা ! তুমি ত পরম মায়াবী, ইচ্ছা করলেই রামরূপ ধরে সীতাকে

বাধ্য করতে পারতে! সে কথা শুনে রাবণ উত্তর দিলেন—'কথাটা বলেছ ঠিক, কিন্তু ভাই, ভাবনায় চিন্তায় আর ভোগে এখন আমার পক্ষে ওটা সম্ভব নয়। রাম-মূর্তি ধরতে হলে রামের রূপ নিয়ে সাধনা করতে হয়, কিন্তু সেই সাধনার শক্তি যে আমি হারিয়ে ফেলেছি ভাই।' আমিও তাই বলি—যারই ছবি এভাবে আঁকতে বসবো, তারই মূর্তি আমাকে ধ্যান করতে হবে। কিন্তু এক দেবী ছাড়া আর কারও মূর্তি আমি কি ধ্যান করতে পারি, না উচিত? দেবী যে আমার সমস্ত অন্তরটা জুড়ে বসে আছে, সেখানে অন্যের স্থান ত নেই। সেই জন্যই আর কারও ছবির কথা আমি ভাবিনি।

রাধারও সমস্ত অন্তরটি কেঁপে ওঠল। সত্যই ত—ললিতদা কত বড় কথা বলেছেন! তাঁর মনে-প্রাণে চলেছে দেবীর জন্যে সাধনা, সেখানে কি তিনি আর কাউকে স্থান দিতে পারেন? পরক্ষণে আঁচলটি গলায় দিয়ে রাধা পূর্ববৎ মেঝের উপর মাথাটি ঠেকিয়ে প্রণাম করতে করতে বলল: আবার তোমাকে প্রণাম করছি ললিতদা, তুমি মস্ত জ্ঞানের কথা বলেছ; এখন বুঝছি—সত্যই তুমি সাধনা কর, তুমি সত্যিকার সাধক, তোমার এই মহা সাধনা সার্থক হোক।

১২

বহু দিন পরে গ্রামে এসে ললিত গ্রামাঞ্চলের সকল সমাজেই যথাযথ ভাবে আদর স্নেহ শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করল। অপরাহ্নে চণ্ডীমণ্ডপে এখন জনসমাগম অনেক অধিক হয়; ললিত সেখানে সকলের সামনে কাশীর কথা বলে। যদিও ললিতের কাশীর জীবনযাত্রার বেশীর ভাগ সময় দেবীর চিত্রচর্চায় অতিবাহিত হয়েছে, তাহলেও তার প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য কাশী সম্বন্ধে শোনা কথা কোনটিই ভুলে নাই, সেগুলি গুছিয়ে বলে যায়; শ্রোতারা অবাক হয়ে শোনেন। যেমন: রামাপুরায় এক অগ্নিহোত্রী-পরিবার আছেন—সেই বংশের যিনি কর্তা,

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, পুরুষানুক্রমে এঁরা বাড়ীর অগ্নিহোত্র-গৃহে বরাবর অগ্নি রক্ষা করে আসছেন। একজন ভবঘুরে ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বৈদ্যবিদ্যা শিক্ষা করে কোনও প্রতিষ্ঠা পান না; তিনি শেষে—যেষামন্যাগতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ—এই সাধুবাক্যের অনুসরণ করে সপরিবার কাশীবাসী হন। রাত্রি শেষ হতেই তাঁর সাধনা চলে—সে কি কঠোর সাধনা, সমস্ত দিন সস্ত্রীক গঙ্গার ঘাটে ইষ্ট অর্চনার পর, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দেন। সায়াহ্নে বাড়ী ফিরে আহার করেন। সারা দিনের মধ্যে যত আকর্ষণই আসুক, স্বার্থের দিকে তাকান না। সন্ধ্যার পর সায়ংকৃত্য সেরে, বাইরের ছোট ঘরখানিতে এসে বসেন—উপার্জনের আশায়। আশ্চর্য এই যে, দেখতে দেখতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে; ঘরে লোক ধরে না, সবাই প্রার্থী—রীতিমত দর্শনী দিয়ে কবিরাজ মশাইকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য। সারারাত ধরে রোগীর বাড়ী-বাড়ী তাঁর চিকিৎসা চলে; প্রত্যেকেই সাগ্রহে বসে থাকে প্রতীক্ষায়। প্রথমে পাঁওদলে বেরুতেন রোগী দেখতে, তার পর পাল্কী এলো, শেষে ল্যাণ্ডো জুড়ি। তাঁর বিশাল ঔষধালয়ের সামনে বিশিষ্ট প্রার্থীদের গাড়ী পাল্কী সারি দিয়ে দাঁড়ায়। গঙ্গার উপর নিজস্ব প্রাসাদতুল্য সু-উচ্চ অট্টালিকা তাঁর নাম ঘোষণা করে। সবার ধারণা, শুধু সাধনার বলেই তিনি অল্প দিনে এত বড় হয়েছেন!

এই সব বাস্তব গল্প ভণিতা করে ললিত বলে যায়, তন্ময় হয়ে সকলে শোনেন—ভদ্র, অভদ্র, সুধী, সজ্জন, চাষী, শ্রমিক—বিভিন্ন সমাজের কত লোক। সেই সঙ্গে কাশীখণ্ড থেকেও এক একটি উপাখ্যান শুনিয়ে তাঁদের প্রচুর আনন্দ দেয়। সত্য ঘোষাল হুঁকায় সুখ-টান দিয়ে পাশে উপবিষ্ট পশুপতিকে বলেন: শুনছ হে পশু, কাশীতে থেকে ছেলে তোমার সত্যিই লায়েক হয়েছে; একেই কয়—স্থান-মাহিত্ম্যো।

পশুপতি বলেন: সেইজন্যেই ত অনেক ভেবে-চিন্তে ওকে কাশীধামে পাঠাই বিদ্যানুশীলন করতে। সংস্কৃতে তিনটে পরীক্ষা দিয়ে বাবাজী ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখন শেষ পরীক্ষাটিই বাকী। যদি ওর মুখে সংস্কৃত শ্লোক শোনেন ত···

একটা নিশ্বাস ফেলে সত্তা ঘোষাল বলেন : কি হবে বল বেণা-বনে মুক্তো ছড়িয়ে—তার চেয়ে এই ভাল।

কিন্তু বাড়ীতে বেণা-বনেই ললিতকে স্বতন্ত্র ভাবে মুক্তো ছড়াতে হচ্ছে ইদানীং। ছবির যে বৃহৎ বাণ্ডিল এনেছিল সঙ্গে করে ললিত, সে সবই দেখা শেষ হয়ে গেছে রাধার। ললিতের কাছেও সেগুলি ক্রমশঃ পুরানো মনে হয়। তাই ললিত স্থির করে—নবপরিকল্পনায় দেবীর ছবি নতুন করে আঁকবে। রাধার কাছেও কথাটা তোলে : আচ্ছা, ঐ যে সব ছবি এঁকেছি, দেবীর বয়স ত এখন ওর চেয়েও বেড়ে গেছে।

মুখ টিপে হেসে রাধা বলে : তা ত বেড়েছেই। তুমি বাড়ছ, আমি বাড়ছি, আর দেবী বুঝি বাড়ছে না?

উত্তেজিত ভাবে ললিত বলে উঠল : ঠিক বলেছ, ঐ ছবিগুলোর মধ্যেই ডুবেছিলুম বলে, এটা আমার মাথায় আসেনি। এখন দেবীর বয়স ঠিক করে ছবি আঁকবার একটা উপায় আছে। কিন্তু সেটি তোমার হাতে, তুমি মনে কর ত হয়।

রাধার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে, সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ললিতের দিকে চেয়ে তখনি বলল : আমি মনে করলেই যদি হয়, তবে চুপ করে আছ কেন? বলই না—আমাকে কি করতে হবে শুনি?

ললিত বলল : শুনবে? আচ্ছা, ছেলেবেলার খেলাঘরের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে? খেলতে খেলতে একদিন কথা ওঠে, আমাদের তিন জনের মধ্যে মাথায় কে বড়? তখনি সার দিয়ে তিন জনে দাঁড়াই, আমি হলাম সবার চেয়ে এক বিঘত মাপে বড়, আর তোমরা দুজনে হলে সমান সমান—মনে পড়ে?

উৎসাহের সুরে রাধা বলে উঠল : পড়ে—খুব পড়ে। তাই নিয়ে দেবীর কি রাগ—আমাকে নিয়ে মাপা কেন?

ললিত বলল : তাহলে দেবীও এখন মাথায় তোমার মতন হয়েছে। শুনেছিলুম—তোমাদের বয়সও সমান। তাহলে তোমাকে সামনে রেখেই দেবীর চেহারা সম্পর্কে একটা structural আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে।

তুমি যেমন রোজ খাওয়া-দাওয়ার পর এখানে আসছ, তেমনি আসবে—লক্ষ্মীটি!

রাধা একটু গম্ভীর হয়ে বলল: তোমার এ খেলা চমৎকার! আবার ছেলেবেলাকার খেলাঘরের কথা মনে পড়ছে। তখনো দেবীর ওপরেই তোমার যত কিছু টান ছিল, এখনো দেখছি। পাকে-প্রকারে তাই করতে চাও, দেবী এখানে না থাকলেও। কিন্তু আমি তোমার কি করেছি! বারে বারে আমাকে এ ভাবে হেনস্তা আর অপমান করে তোমার কি লাভ বল ত শুনি?

ললিত থতমত হয়ে অপরাধীর মত মুখখানার ভঙ্গি করে বলতে লাগল: আমার মনে পড়ে, দেবীর সঙ্গে বেশী মিশতুম বলে তুমি রাগ করতে, জোর করে এক একদিন আমাকে ধরে নিয়ে যেতে, কিন্তু দেবীও ছিল নাছোড়বান্দা—এই নিয়ে কত ঝগড়া! তবে ছেলেবেলার সেই সব কথা তুলে এখন দুঃখ করা কি তোমারও ছেলেমানুষী নয়? আচ্ছা, একটা কাজ করব, তোমারও না হয় একখানা ছবি—

এ পর্যন্ত বলেই ললিত হঠাৎ থেমে গেল। রাধা জিজ্ঞাসা করল: থামলে যে—কি হলো?

ললিত বলল: তোমার ছবি তোলায় ত আবার নানান ফ্যাসাদ, তুমি চাও—দেবীর মত তোমার ছেলেবেলাকার ছবি আঁকি। কিন্তু আগে ত বলেছি, সে হবে না। জান ত, ছবি আঁকায় আমি আনাড়ি, কোন শিক্ষা পাইনি। তবে যদি বল কি করে ওসব এঁকেছি, সে হচ্ছে ধ্যানের ব্যাপার; আর কেউ বুঝবে না। কিন্তু তুমি ত অবুঝ নও, তুমি ত জানো—দেবী ছাড়া আর কোন মেয়েকে আমি ধ্যানে আনতে পারি না। তবে তুমি যদি বল, দিন দুই সময় করে এখানে বসলেই, আমি সত্ত সত্ত তোমার এখনকার ছবি একখানা এঁকে দিতে পারি। এর পর, দেবীর যে ছবি কল্পনায় আঁকব, তাতে কালিদাসের কাব্যের নায়িকাদের ভাবভঙ্গি থাকবে—কবির কথাগুলোও ছবির নিচে লিখে দেব।

রাধা বুঝল, দেবীর চিন্তায় এখনো ললিত তন্ময় হয়ে আছে। দেবী ছাড়া আর কিছু সে জানে না। অগত্যা তাকে বলতে হলো—বেশ, এর মধ্যে

একদিন এখানে বসব, তুমি আমার ছবি এঁকে দিও। আমি সেখানা বন্ধ করে রাখব। আর, আমাকে দেখে দেবীর জন্যে ছবি যে ভাবে আঁকতে চাও—এঁকো, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।

উৎফুল্ল হয়ে ললিত বলল: এই ত লক্ষ্মী মেয়ের মতন কথা। বেশ, তুমি স্থির হয়ে একটু দাঁড়াও ত, আমি গোটাকতক রেখা টেনে স্ট্রাকচারটা ঠিক করে ফেলি!

ললিতের নির্দেশ মত রাধা ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়াল, ললিতও তার আঁকার সাজ-সরঞ্জামগুলি বার করে তৈরি হয়ে বসল।

১৩

আগেই বলা হয়েছে, নিত্যানন্দ চৌধুরী ও অরবিন্দ রায় নামে দুজন আধুনিক ধনী শিল্পপতির আহ্বানে দেবী ও রাণীর পিতা, পশুপতির পরম বন্ধু বগলাপদ কলকাতায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সরকারী পণ্য সরবরাহের ব্যাপারে যোগ দেন এবং সম্বৎসরের মধ্যেই তাঁর 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হয়ে ওঠে। নিত্যানন্দ বাবুর পুত্র অজিত ও কন্যা অরুণা এ বাড়ীতে ঘন ঘন আসায় রাণীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়, বগলাপদ বাবু এভাবে বিখ্যাত ধনী ও তাঁর মুরুব্বীস্থানীয় নিত্যানন্দ চৌধুরীর ছেলে-মেয়েকে তাঁর বাড়ীতে যেচে আসতে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং স্ত্রীকে বলে দেন, আদর আপ্যায়নে ছেলে-মেয়ে দুটিকে যেন আপনার করে নেন। দেবী তখন প্রবল জ্বরে ভুগছিল; রাণীর সঙ্গেই ভাই-বোনের ভাব হয়ে গেল। রাণীকেও তাঁরা নিজেদের প্রাসাদোপম বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আদর যত্নে অভিভূত করে দেন। নিত্যানন্দ বাবুর বিরাট বাড়ী, ব্যয়বহুল সমৃদ্ধ পরিবেশ, বহু দাসদাসী সত্ত্বেও গৃহিণী অভাবে গৃহস্বামীর দৃষ্টিতে সবই যেন এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ও শোভাহীন। তাঁর বর্ষীয়সী বিধবা

ভগিনীকে দূরসম্পর্কের কতিপয় আশ্রিতা আত্মীয়া এবং পাচক, পাচিকা ও দাস-দাসীদের নিয়ে ভ্রাতার রুচি-প্রবৃত্তি অনুসারে বাহ্যিক আধুনিক আদব-কায়দা বজায় রেখে, এক কথায় যাকে বলা যায়—'রাজার হালে' সংসারটি চালাতে হয়। কোথায়ও কোন দিক দিয়ে পাণ থেকে একটু চুণ খসলেই মুশকিল। প্রথম দিনেই রাণীকে দেখে নিত্যানন্দ বাবু মনে মনে একটা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন, কিন্তু বগলার তাৎকালীন অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করে, ভবিষ্যতের খাতে সেই কল্পনাটিকে মুলতুবী রাখতে অগত্যা বাধ্য হন। তবে বগলা বাবুর কন্যা ও পরিবারবর্গ যে তাঁর আত্মীয়ের শামিল, তাঁদের প্রতি যেন আদর-যত্নের ত্রুটি হয় না—এই ভাবে জরুরী নির্দেশ দিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে সতর্ক ও সচেতন করে রাখেন। তাঁরই নির্দেশে বগলাকেও কন্যাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত ও উৎসাহী হ'তে হয়। সেই সময়ই ও-বাড়ীর ভ্রাতা ভগিনীর দেখাদেখি, এ-বাড়ীতে রাণীও পায়রা নিয়ে নতুন ধরণের ব্যয়সাধ্য খেলায় মেতে ওঠে। এমন কি, দেবী সেরে উঠলে তাকেও এই খেলায় যোগ দিতে প্রলুব্ধ করে। অজিত এবং অরুণার সঙ্গেও ক্রমে দেবীর আলাপ-পরিচয় হয়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুত্র-কন্যার আদর্শে নিত্যানন্দ বাবু বগলাপদর কন্যাদের উচ্চ শিক্ষায় প্ররোচিত করেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য দেবীর স্কুলে যাওয়া হয় না, সে মায়ের কাছেই পাঠাভ্যাস করে। রাণী কিন্তু অজিতের সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত পদে শিক্ষার পথে এগিয়ে চলে। একটা মাত্র বছরের আড়াআড়িতে তিন জনেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অজিত দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে। অরুণা ও রাণী পর বছর পরীক্ষা দেয়; ফল বেরুলে দেখা গেল যে, অরুণা কোন রকমে তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে, রাণী কিন্তু মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে বৃত্তি লাভের যোগ্যতা পেয়েছে। নিত্যানন্দ বাবু অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন রাণীর সম্বন্ধে।

বগলাপদর তখন অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। বাড়ি, গাড়ী, মান, সম্ভ্রম, লোকজন, সেই সঙ্গে প্রচুর উপার্জন তাঁকে ভাগ্যবান বলে চিহ্নিত করেছে। এখন নিত্যানন্দ বাবু মনের মধ্যে মুলতুবী কল্পনাটি স্পষ্ট করে বলেন

বগলাপদকে—ইনিও এমনি একটা উচ্চ আশার দিকে বরাবর লক্ষ্য রেখে-ছিলেন। সে আশা এত সহজে এভাবে ফলবতী হওয়ায় এবং নিত্যানন্দ বাবুর পক্ষ থেকেই শুভ প্রস্তাবটি আসায়, তাঁর আর আনন্দ ধরে না। অবশ্য, তখন পূর্ণোৎসাহে উচ্চ শিক্ষা লাভের সাধনা চালাবার কথা, প্রয়োজন বুঝলে পাত্র-পাত্রীর বিদেশ যাত্রাও অসম্ভব নয়, সুতরাং বিবাহ ব্যবস্থা বহু দূরে। তথাপি, এমন একটি সম্ভাবনা এবং সে সম্বন্ধে কথাটা ওঠাকেই উপলক্ষ করে দুই বাড়িতে পর পর দুটো বড় রকমের ভোজ হয়ে যায়। সে সময় কিন্তু বগলাপদ ওরফে বোগলা সাহেব পল্লী-বন্ধু পশুপতিকে স্মরণ করাও প্রয়োজন বোধ করেন নি। বরং তিনি এখন অতিমাত্রায় ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন যে, পশুপতির মত পল্লীগ্রামবাসী সেকেলে প্রকৃতির আহাম্মুখ ধরণের মানুষটির সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ও ঘনিষ্ঠতার কথা এই বিশিষ্ট ধনী-সমাজে কোন প্রকারে যাতে জানাজানি না হয়।

পক্ষান্তরে, পত্নী সুলোচনা দেবী প্রায়ই স্বামীকে তাড়া দিতেন, গ্রামের সঙ্গে পূর্বের মধুর সম্পর্কটা যাতে বজায় থাকে। মাঝে মাঝে পশুপতি বাবুকে চিঠিপত্র লিখে ওঁদের খোঁজ খবর নিতে বলেন, তাঁর সইয়ের পরলোক গমনের পর কি ভাবে ওঁদের সংসার চলেছে, ললিতের পড়া-শোনা কত দূর এগিয়েছে, পাড়ার সকলে কে কেমন আছে—এ সব জানতেও যে তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। সই বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই চিঠি লিখে খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু সইয়ের অভাবে কাউকে কিছু লিখতে মন চায় না, তাই স্বামীকেই বলেন। গ্রামের ব্যাপারে স্বামীর মনোবৃত্তির কথা আগেই বলা হয়েছে। স্ত্রী এখনো দেশের কথা ভুলেন নাই, সেজন্য বগলাপদ মনে মনে খুবই বিরক্ত হন; স্ত্রীকে সেজন্য নিজেদের বর্তমান পরিবেশের কথা ভেবে দেশের কথা ভুলবার জন্যে নানা যুক্তি দেন। স্ত্রী কিন্তু প্রতিবাদ তুলে স্বামীর যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে দেন। অগত্যা তাঁকে নিজের পেঁচোয়া বুদ্ধিতে মিথ্যার ব্যাপার সাজিয়ে ধাপ্পা দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে উপযাচক হয়ে দেশের কথা নিজের মনগড়া করে শুনিয়ে দেন পশুপতির লেখা চিঠিকেই উপলক্ষ করে।

স্বামী যে, কন্যা রাণীকে এ যুগের আধুনিকা মেয়ে তৈরি করবার জন্য

কলেজে পড়াচ্ছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন, আর এর পিছনে নিত্যানন্দ বাবুর রীতিমত প্ররোচনা রয়েছে জেনে—সুলোচনা দেবী সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। কেন না, নিত্যানন্দ বাবুর পুত্র অজিতের সঙ্গে রাণীর বিয়ের কথা এক রকম পাকা হয়ে আছে। তিনি কেবল এই ভেবে ঠাকুর-দেবতার উদ্দেশে মাথা খোঁড়েন যে, দেবী সে সময় অসুখে পড়েছিল—অজিতের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ তখন হয়নি! নতুবা দেবীকে দেখলে এবং বয়সের দিক দিয়ে সে বড় বলে তারই ওপরে ও পক্ষের প্রথমেই নজর পড়ে যেত। তিনি সাশ্রুলোচনে ঠাকুরের উদ্দেশে বলেন—এই জন্যেই কথা আছে, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে! ভাগ্যিস, দেবী অসুখে পড়েছিল! অসুখের পর দেবীর পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হওয়ায়, স্বামী মনে মনে প্রফুল্ল হলেও সুলোচনা দেবী কিন্তু অতীতের কথা—গ্রামের হরগৌরী মন্দিরে দুই সইয়ের সর্বসমক্ষে স্ব স্ব ছেলেমেয়েকে উপলক্ষ করে বাগদানের কথা—ভুলেন নাই। ঠাকুরঘরে ইষ্টের সামনে বসে পূজা আহ্নিকের পর তিনি প্রায়ই গ্রামের সেই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে স্বামীর সুমতি প্রার্থনা করেন। অথচ, দেবীর পূর্বস্মৃতির উদ্ধার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকেন। তার কারণ, যদি অতীতের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় স্বামীকে একান্তই উদাসীন দেখা যায়, কিম্বা ও-পক্ষও বিশেষ আগ্রহান্বিত না থাকেন, তাহলে আগে থেকে দেবীকে অতীত সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য ব্যস্ত না করাই সঙ্গত। বিশেষতঃ, দেবীর পূর্বস্মৃতি লাভে সহায়তা করতে স্বামী এ-সংসারের প্রত্যেককে বিশেষ ভাবে নিষেধ করে রেখেছেন। তবে ইদানীং শিক্ষাপ্রাপ্তি ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই দেবীর বিনষ্ট পূর্বস্মৃতি যে একটু একটু করে বিকশিত হচ্ছে, তিনি সেটা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করেছেন। তাই, ইদানীং অনেক ভেবে চিন্তেই তাঁকে ভবিতব্যের উপর নির্ভর করে এ ব্যাপারটির নিষ্পত্তির ভার ছেড়ে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত থাকতে হয়েছে।

কিন্তু নিত্যানন্দ বাবুর পরিবারবর্গের সঙ্গে এ বাড়ির ঘনিষ্ঠতা ক্রমে ক্রমে যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, উভয় বাড়ির পুত্র-কন্যাদের বয়সও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অজিত মোটামুটি ভাবে বি, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে, নিত্যানন্দ

বাবু অজিতকে চাটার্ড একাউন্টসিপ শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠিয়ে দিলেন। রাণীও তখন আই, এ পরীক্ষাতে বৃত্তিলাভ করে স্কটিসচার্চ কলেজে বি, এ পড়বার জন্য যোগ দিয়েছে। দেবীও বাড়িতে মায়ের কাছে বাংলা পড়ে, শাস্ত্র পুরাণগুলির সঙ্গে ভাল ভাবেই পরিচিতা হয়ে ওঠে। তার উপর পিতার আগ্রহে রাণীর কাছে ম্যাট্রিকের বই সব পড়ে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেয়। ফল বেরুলে জানা গেল, দেবী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হয়ে বাংলায় বিশেষ পটুতার জন্য লেটার পেয়েছে। অজিতের ভগিনী অরুণা বছর খানেক আই, এ ক্লাশে পড়ে তার পর কলেজ ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এদিকে তার বিশেষ অনুরাগ দেখে নিত্যানন্দ বাবু বাধা দেন নাই। অজিতের বিলাত যাত্রার পরেও বিকালে দুই বাড়ি থেকে পায়রা নিয়ে এদের খেলা সমান ভাবেই চলতে থাকে, বরং আরো কিছু উৎকর্ষ হয়। এই সময় আর একটা ব্যাপার যেন বাঁধাধরা পরিকল্পনার মতই উপস্থিত হয়ে দু'টি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে একটা যোগসূত্র রচনা করল।

আগেই বলা হয়েছে, অরবিন্দ রায় নামে আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিত্যানন্দ বাবুর সহকর্মী থাকায় বগলাপদ তাঁরও সঙ্গে কর্মসূত্রে সংশ্লিষ্ট হন। নিত্যানন্দ বাবুর বিশাল বসতবাড়ির নিকটেই অরবিন্দ বাবুও তাঁর অট্টালিকা নির্মাণ করান। উভয় বন্ধুর কর্মশালা চৌরঙ্গী অঞ্চলে নিজস্ব বাড়িতে কেতাদুরস্ত ভাবে চলে আসছিল। বগলাও যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে দুই মুরুব্বীর আদর্শে তাঁদের আফিসের কাছে নিজেরও স্বতন্ত্র কার্যালয় নির্মাণে উদ্যত হন, সেই সময় অরবিন্দ বাবু তাঁকে বাধা দিলেন। তার কারণ, ওঁর এক মাত্র ছেলে শশাঙ্ক আর এক ভাগনে প্রশান্ত ইউরোপে রয়েছে। ছেলের ক্ষয় রোগ, এখানে এলেই বাড়ে, তাই সুইজারল্যাণ্ডে একটা নার্সিং-হোমে তাকে রেখেছেন। ভাগনে প্রশান্ত ইংলণ্ডে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং তথা স্থপতিশিল্প শিখছে। প্রশান্ত কৃতবিদ্য হয়ে ফিরে এলে ইমারত নির্মাণের ব্যবসায় তিনি আরম্ভ করবেন। এ-সব সরবরাহ ব্যাপারে লেগে থাকতে তাঁর আর ইচ্ছা নেই। তাই তিনি বগলাপদকে বলেন: আমিও সস্ত্রীক ইউরোপে যাব ঠিক করেছি। আমার স্ত্রী ছেলেকে দেখবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। আমারও দেখা দরকার, প্রশান্ত

ছেলেটার পড়াশোনা কি রকম হোচ্ছে। কাজেই আমাকে হয়ত কিছু বেশী দিন ওদেশে থাকতে হবে। আর, আপনারা ত জানেন, সরবরাহের কাজ আমি বন্ধ করে নতুন কাজ করতে চাই। কাজেই, আমার অফিস চালু অবস্থায় নিয়ে আপনি নিজেই মালিক হয়ে চালাতে পারেন। খরচপত্র করে নাই বা আলাদা অফিসের পত্তন করলেন।

অরবিন্দ বাবুর প্রস্তাবটি বগলাপদর মনে লাগে। তিনি তখন অরবিন্দ বাবুর চলতি অফিসের মালপত্র সাজ-সরঞ্জাম সব সুবিধা দরে কিনে নিয়ে এবং দেনা-পাওনার দিক দিয়েও একটা বন্দোবস্ত করে, তাঁকে নিশ্চিন্ত করলেন। অরবিন্দ বাবুর প্রাপ্য টাকা সমস্তই চুকিয়ে দিলেন। বাড়ীর ভাড়ার একটা হার নির্দিষ্ট রইল, অরবিন্দ লিখলে সে-টাকা বিদেশে পাঠাবেন, নতুবা তাঁর কাছেই জমা থাকবে, ফিরে এসে নেবেন। নিত্যানন্দ বাবু স্বয়ং মধ্যস্থ থেকে এই ব্যবস্থা পাকা করে দিলেন।

অজিতের বিলাত যাত্রার অল্প কয়েক দিন পরেই অরবিন্দ বাবু ভাগনে প্রশান্তকে নিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউর বসত বাড়ীতে ফিরে এলেন। নিত্যানন্দ ও বগলাপদ এ পর্যন্ত তাঁর কোন চিঠি পাননি। অরবিন্দ স্বয়ং যে দু'টি খবর দিলেন, শুনে তাঁরা যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়লেন। তাঁর পুত্র শশাঙ্ক সেখানে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যায়, তারই কিছু দিন পরে একটা মোটর দুর্ঘটনায় তাঁরা স্বামী-স্ত্রী সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে তিনি বেঁচে ওঠেন, কিন্তু স্ত্রী সেখানেই দেহ রাখেন। সেই থেকে তাঁরও বুকের অবস্থা ভাল নয়—যে কোন মুহূর্তে তাঁরও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হতে পারে। এখন একমাত্র সান্ত্বনার কথা—ভাগনে প্রশান্ত বেশ কৃতবিদ্য হয়েছে, তিনি নতুন করে ইমারত তৈরির কারবার করবেন বলেই প্রশান্তকে ঐ সম্পর্কে বিল্‌ডিং ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শিখতে বিলেতে রাখেন। ওখানকার কলেজ থেকে সে পাস করেছে। এখন সে যদি কাজ-কারবার করে, নিত্যানন্দ ও বগলা বাবু দু'জন মাথার ওপর থেকে ওকে চালাবেন। এর জন্য উপস্থিত আলাদা অফিসের দরকার নেই, এখানকার বাড়ি থেকেই প্রশান্ত বিজনেস চালাতে পারে, সুতরাং বগলা বাবু ও-বাড়িতে যেমন আফিস চালাচ্ছেন, চালিয়ে যান।

উভয়েই অরবিন্দ বাবুকে সান্ত্বনা দিলেন। নিত্যানন্দ বাবুর সঙ্গে অরবিন্দের আত্মীয়তা থাকায়, নিত্যানন্দের কন্যা অরুণাও সেখানে এসে সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের তিন জনকেই বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। প্রশান্ত অজিতের চেয়ে বছর দু'য়েকের বড় এবং অজিতের মতই উন্নত দেহ সুপুরুষ। বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকায়, তাকে হঠাৎ দেখলে সাহেব বলেই ভ্রম হয়। তাই অরুণা ঠাট্টা করে তাকে বলে: প্রশান্ত-দা, তুমি অনেক দিন ওদেশে থেকে ঠিক সাহেব হয়ে এসেছ, এখন দিন-কতক ও পোষাক ছেড়ে ধুতি-চাদর পরতে সুরু কর।

প্রশান্ত প্রস্তাবটি শুনে জিজ্ঞাসা করে: কোন উদ্দেশ্য আছে না কি—যার জন্যে বহু দিনের অভ্যাস বদলাতে হবে?

অরুনা একটু মুচকে হেসে বলল: নিশ্চয়ই! আমাদের যে নতুন কাকা-বাবুটির সঙ্গে প্রথম আলাপ হোল, ওঁর বাড়িতে ত এখনো যাওনি! সেখানে অপূর্ব দু'টি কন্যারত্ন আছে। একটির সঙ্গে দাদার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে, আর একটি যেন তোমার জন্যেই এত দিন সাধনা করছিল; সেটিই হচ্ছে বড়, আর ছোটটির চেয়েও রূপসী! তবে কিন্তু ভারি রুক্ষশীলা, ঠিক যেন কালিদাসের শকুন্তলা; আমি জোর করে বলতে পারি, প্রথম তাকে দেখলেই—রাজা দুষ্মন্তের মত তোমারও অবস্থা হবে।

অরুণার কথা বগলাপদ, অরবিন্দ ও নিত্যানন্দ তিন জনেই উপভোগ করে পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করেন। এর পর অরুণা সহাস্যে ওঁদের পানে চেয়ে বলল: আপনারা বসুন, আমি এখনি চা জলখাবার আনছি, 'আর দেবীদি' সম্বন্ধে আমি যা বললুম, আপনারা সেটার কথাও ভাবুন। প্রশান্তদা', তুমি ভিতরে চল, আমাদের একটা নতুন খেলা তোমাকে দেখাব।

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অরুণা প্রশান্তকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। বগলাপদ নিত্যানন্দ বাবুর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাপার কি দাদা? আপনার মেয়ের কথা শুনে মনে হলো, যেন সে ও-ব্যাপারটা পাকা করে রেখেছে!

অরবিন্দ বললেন: আপনার সঙ্গে আমাদের এখন যে রকম ঘনিষ্ঠতা,

আর—আপনার এক মেয়ের সঙ্গে যদি অজিতের বিয়ের কথা পাকা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার অপর মেয়েটিকে না দেখেই আমি কথা দিচ্ছি—প্রশান্তর জন্যে আমি তাকে আপনার কাছে ভিক্ষা চাইব।

বগলাপদ খুবই সঙ্কুচিত ও অপ্রস্তুতের মত হয়ে বললেন: এ আপনি কি বলছেন? আমি যে শুনে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ছি। আমার কন্যাকে যদি আপনি কৃপা করে গ্রহণ করেন, সে ত আমারই পরম সৌভাগ্য!

নিত্যানন্দ প্রসঙ্গটির নিষ্পত্তি করে দিলেন: আমি গোড়া থেকেই মেয়ে দুটিকে ঠিক করে রাখি। অজিতের চেয়ে প্রশান্ত দু'বছরের বড়, বড়টিই ওকে মানাবে। বাড়িতে এই নিয়ে অরুর সঙ্গে প্রায়ই আমাদের কথা হত কি না!

এই সময় চা ও জলখাবার এসে পড়ল। সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে এর পর আরও আলোচনা চলল।

ওদিকে অরুণা প্রশান্তকে ছাদে নিয়ে গিয়ে তাদের পারাবত দৌত্য সম্পর্কে নতুন ধরণের খেলা দেখাল। প্রশান্ত পারাবত খেলার কথা শুনেছিল, কিন্তু কখনো দেখেনি। অরুণা বলল: এ-খেলার মজা তোমাকে দেখাচ্ছি; আমাদের খেলার ঠিক সময় হয়েছে! এই পায়রাটির পায়ে চিঠি বেঁধে আমি ছেড়ে দেব, আর দেখবে, একটু পরে ও-বাড়ি থেকে রাণীর লেখা আমার পত্রের জবাব নিয়ে পায়রা ফিরে আসবে।

প্রশান্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, অরুণার কাণ্ড দেখে, তার মুখ থেকে প্রশ্ন উঠল: সত্যি?

অরুণা বলল: আরও একটা মজা করা যাক তোমাকে নিয়ে। রাণীর বড় বোন দেবীর নামে তুমি একখানা পত্র লেখ। সব ত শুনলে, যা তোমার ইচ্ছা তাই লেখ, সেটাও দাদার পায়রার পায়ে বেঁধে দিই; একসঙ্গে উড়বে, একসঙ্গেই জবাব আসবে।

যেমন প্রস্তাব সেই মত কাজ হয়। প্রশান্ত দেবীর কথা অরুর মুখে শুনেই প্রলুব্ধ হয়েছিল; এখন অনাহূত ভাবে পরিচয় দেওয়ার একটা মজা আছে বৈ কি! পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বার করে অরুণার দেওয়া কাগজে কয়েক লাইন লিখেই সেখানা মুড়ে অরুণার হাতে দিল; অরুণা তাকে মাদুলীর

আকারে এনে অপর পারাবতটির পায়ে বাঁধতে লাগল। এর পর কি ভাবে পায়রা ছাড়তে হবে, সেটি দেখিয়ে দিয়ে একসঙ্গেই দু'জনে পায়রা দু'টিকে আকাশ পথে উড়িয়ে দিল।

একটা মধুর শব্দ করে একই আকৃতি ও বর্ণের পারাবত দু'টি পাশাপাশি উত্তর দিকে যুগপৎ উড়ে চলল।

১৪

রাণী তার দিদি দেবীকে নিয়ে ঝুল বারাণ্ডায় এসে অরুণার পায়রার প্রতীক্ষা করছিল। পালা অনুসারে এ দিন অরুণাই প্রথমে পায়রা ছাড়বে, আর সেই পায়রার মারফত তারা জবাব পাঠাবে—এই রকম ব্যবস্থা স্থির করা আছে। আগামী কাল আবার এই সময় রাণী ও দেবী তাদের শিখানো পায়রা ছাড়বে চিঠি দিয়ে। দু'জনেই আকাশ পথে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে—রাণীর চোখে চশমা; অতিরিক্ত পড়াশোনায় তার চোখের দোষ হওয়ায় চশমা ব্যবহার করতে হয়েছে। সুশ্রী অথচ নতুন ধরণের চশমা চোখে ওঠায়, রাণীর মুখের সৌন্দর্য যেন কিছুটা বেড়ে গেছে। দেবীর এ-সব বালাই নেই। সেই যা কলকাতায় প্রথম এসে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি তাকে ভুগিয়েছিল—যে জন্য তার স্মৃতিভ্রংশ হয়। তাছাড়া, বর্তমানে সে সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাস্থ্যবতী এবং তার চোখের দৃষ্টিও প্রখর। দুই ভগিনীই আকাশের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। দেবীই প্রথমে আনন্দে করতালি দিয়ে বলল: ঐ আসছে—ঐ দেখ্—ঐ যে রে!

রাণী প্রথমে দেখতে পায়নি, দেবীর নির্দেশ মত এখন দেখতে পেল এবং তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আরও আবিষ্কার করল—একটি নয়, দু'টি! অজিতের বিলাত যাত্রার পর থেকে অরুণা একাই তার পালার দিনে পায়রা পাঠিয়ে

আসছে। আজ আগুপেছু হু'টি পায়রা আসছে দেখে সে একটু বিস্মিত হলো। দেবীও জানে, শুধু অরুণার পায়রা পত্র বহন করে আনে। একটা পায়রার চিন্তাই তার মাথায় ঘুরছিল—পিছনে যে আর একটি পায়রা আসছে, সেটা দেখেনি। এখন ভালো করে তাকাতেই দেখতে পেয়ে বলল: ওটা বোধ হয় আর কারো পায়রা!

রাণী বলল: না, আমাদের শিক্ষিত পায়রা বাইরের পায়রার সঙ্গে মেশে না। ঐ দেখ না—এদিকেই আসছে, আর—এলো বলে।

একটু পরেই হু'টি পায়রা পর পর এসে বারাণ্ডার নির্দিষ্ট জায়গাটির উপরে পাশাপাশি বসল। দেবীই বলল: আরে, ওটা যে অজিত বাবুর পায়রা! সে তো বিলেত গেছে—তবে?

রাণী বলল: হাতে পাঁজী মঙ্গলবারে কি দরকার—দেখাই যাক্ না।

কথার সঙ্গেই সে এগিয়ে গিয়ে হুটো পায়রার পায়ের দিকে তাকাল; দেখল, হুটোই চিঠি এনেছে। অত্যন্ত কৌশলে পায়রা হুটোর পা থেকে পাকানো পত্র হু'খানা খুলে উপরের লেখা পড়েই সে উল্লাসের স্বরে বলল: তোর নামে চিঠিরে দিদি!

দেবী বলল: অরুণা তো আমাকে চিঠি দেয় না—তবে?

রাণী বলল: অরুণার চিঠি নয়—হাতের লেখা আলাদা, এখন পড়ে দেখ—কে দিলে!

রাণীর নামের চিঠিখানা তাকে দিয়ে দেবী তার চিঠিখানা খুলতে লাগল। চিঠির গোড়াটা পড়েই দেবী চিৎকার করে উঠল ক্রুদ্ধকণ্ঠে: কি রকম আস্পর্দ্ধা দেখ্ রাণী, চিঠিতে আমাকে কি সব নোংরা কথা লিখেছে!

নিজের চিঠি থেকে কৌতূহলাক্রান্ত মুখখানা তুলে রাণী জিজ্ঞাসা করল: সে কিরে—কে লিখেছে?

চিঠিখানা রাণীর মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেবী বলল: দেখ তো তুই—পোড়ারমুখোটা কে?

রাণীর চিঠি তখন পড়া হয়ে এসেছে, চাপা গলায় দিদিকে সতর্ক করবার

উদ্দেশ্যে বলল: চুপ চুপ, মস্ত লোকের ছেলে রে—গাল দিস্‌নি; অরু ওর কথা আমাকে লিখেছে।

দেবী মুখখানা মুচকে বলল: গাল দেব না তো কি! আমাকে কি সব লিখেছে দেখ্‌ না—জানা নেই, শোনা নেই, কোথাকার কে—

রাণী তার চিঠিখানা নিয়ে দেবীর সামনে এসে বলল: এই শোন্‌—অরু লিখছে—আমাদের নিকট-আত্মীয়, সম্পর্কে জেঠাবাবু—যাঁর বাড়ীতে তোমাদের অফিসগো; বিলেত গিয়েছিলেন জান ত? তিনি স্ত্রী-পুত্র সব হারিয়ে তাঁর ভাগনে প্রশান্তকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। ভাগনেটির সঙ্গে দেবীর বিয়ের কথা হোচ্ছে। প্রশান্তদা' রাজী, খাসা ছেলে তিনি। নিজেই উপযাচক হয়ে দেবীর সঙ্গে আলাপ করবার আশায় দাদার পায়রাকে দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছেন। দেবীকে বলিস্‌ জবাব দিতে। প্রশান্তদা' ভারি ভালো ছেলে; চিঠিতে আজ ত জানাশোনা হোক, তার পর আমি তাকে নিয়ে গিয়ে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেব।

চিঠি শুনতে শুনতেই দেবী অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। রাণীর পড়া শেষ হতেই রুক্ষ মেজাজে বলল: ভালো ছেলে হোলে বুঝি এমনি করে অভদ্রের মত লেখে—মাই ডিয়ার দেবী, যদিও তোমার সঙ্গে আলাপ নেই, কিন্তু এখানে এসেই আমার প্রিয় ভগিনী অরুণার মুখে তোমার কথা শুনেই তোমাকে আমার মন-মন্দিরে দেবীর আসনে বসিয়েছি। দেবী-দর্শনের জন্যে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি, চিঠির উত্তর পেলেই···মাগো মা! লেখবার শ্রী দেখছ! লজ্জায়, ঘেন্নায় আমার দেহ রী-রী করছে, আমি মাকে সব বলছি—

চিঠিখানা নিয়ে দেবী মায়ের কাছে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই রাণী বাধা দিয়ে বলল: এ তো আমাদের খেলা, ভালো না লাগে খেলিসনি; কিন্তু মাকে ব'লে কি হবে? যাস্‌নি দিদি—

কিন্তু দেবীর অন্তর্নিহিত নারী-সত্তা তখন সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশুদ্ধা কুমারীর প্রতি অপরিচিত পুরুষের প্রেরিত এরূপ লিপি যে অবৈধ এবং এটা গোপন করা অসঙ্গত, মায়ের কাছে লব্ধ শিক্ষাই তাকে এ সম্বন্ধে প্ররোচিত

করতে থাকে। সুতরাং রাণীর বাধা অগ্রাহ্য করে সে ভিতরে ছুটল মাকে চিঠিখানা দেখিয়ে নালিশ করবার উদ্দেশ্যে।

বোগলা-ভিলার বা'র মহলে পাশ্চাত্য আদর্শে সাজসজ্জা ও আদব-কায়দা দেখলে যেমন গৃহস্বামীর আধুনিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, অন্দর-মহলে একেবারে তা'র বিপরীত। গৃহকর্ত্রী যে অত্যন্ত রক্ষণশীলা—সেকালের রীতি-নীতি এবং কৌলিক ক্রিয়া-কর্মাদি নিষ্ঠা সহকারে এখানে প্রতিপালিত হয়ে থাকে, বাইরের এলাকা পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করবামাত্র সেটি যেমন জানা যায়, পক্ষান্তরে, তেমনি এক পবিত্র ভাবধারায় আগন্তুকের চিত্তও আবিষ্ট হয়ে ওঠে। চৌরঙ্গী অঞ্চলের বড় বড় হোটেলগুলি থেকে সরাসরি দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে এলে মনোভাবের যেমন একটা পরিবর্তন ঘটে, বোগলা-ভবনের বহির্মহল থেকে ভিতর মহলে এলেও চিত্তের তেমনি অবস্থান্তর হয়ে থাকে। আধুনিকতার একান্ত পক্ষপাতী গৃহস্বামীর প্রতাপ-প্রতিপত্তিও এখানে যেন সসম্ভ্রমে অবনত। এ মহলের ঠাকুরঘর, পাকশালা, পাঠাগার, ভোজনকক্ষ, ভাঁড়ারঘর, বসবার স্থান, এমন কি শয্যাগৃহগুলি পর্যন্ত প্রাচীন আদর্শবতী গৃহকর্ত্রীর রুচির নিদর্শন বহন করে।

দেবীকে উত্তেজিত ভাবে ছুটে আসতে দেখেই সুলোচনা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে রে—হাতে কার চিঠি?

হাঁফাতে হাঁফাতে দেবী উত্তর দিল: দেখ মা—পায়রার পায়ে বেঁধে ও-বাড়ীর প্রশান্ত নামে একটা ছোঁড়া আমাকে এই চিঠি দিয়েছে।

সুলোচনা দেবীর চোখ-মুখ রাঙা হয়ে ওঠে মেয়ের কথা শুনে। চিঠিখানা তার হাত থেকে নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেন। দেবী এই সময় বলল: জানো মা, রাণী বললে, এ চিঠির জবাব দিতে হবে। আমি বলি—মাকে আগে দেখাই; সে কি আসতে দেয়! আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি।

যৌবনে পদার্পণ করলেও, দেবীর কথার মধ্যে বালিকা-সুলভ টান ও সারল্যের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মায়ের প্রতিটি কথা ও উপদেশ তার কণ্ঠস্থ; মাকে জিজ্ঞাসা না করে সে কোন কাজই করে না, কোথাও যায় না, কারও সঙ্গে কথা বলে না। মাকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর মত নিয়ে তবে সে

রাণীর সঙ্গে পায়রা নিয়ে খেলায় যোগ দিয়েছিল, সেই খেলা থেকে আজ এই অশান্তির উৎপত্তি!

মা বললেন: এর পর আর তুমি রাণীর সঙ্গে মিশে এ খেলা খেলো না। আর, তুমি নিজেই ভেবে দেখ, এ চিঠির কি জবাব দেওয়া উচিত। এমন শক্ত জবাব দাও, ঐ প্রশান্ত ছেলেটা আর কোন দিন যাতে চিঠি লিখতে ভরসা না করে, সে-ও ঢিট হয়ে যায়! আমার সামনে বসেই লেখ।

এই ঘরেই দেবী মায়ের কাছে পড়াশোনা করে। পড়ার যাবতীয় বই ও লেখবার উপাদান সবই গৃহমধ্যে সাজানো রয়েছে। ঘরের দেওয়ালে পুরাণের দেব-দেবী এবং এ যুগের মহাপুরুষদের আলেখ্যগুলি শোভা পাচ্ছে।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই কয়েক ছত্রে দেবী চিঠিখানার জবাব এই ভাবে লিখে মাকে দেখতে দিল। দেবী লিখেছে—

"জানা নেই, পরিচয় 'নেই, অথচ এক ভদ্রকন্যাকে এভাবে বেহায়ার মত চিঠি লিখে আপনি গুরুতর অন্যায় করেছেন। এমন কুকর্ম আর করবেন না। ইতি—"

চিঠিখানা পড়ে মা বললেন: ঠিক লিখেছ, রাণী যখন বলছে—তার হাতে দাও, সে পাঠিয়ে দিক।

দেবী বলল: চিঠিতে আমার নাম লিখিনি মা, ঠিক করিনি?

মা বললেন: ঠিক করেছ। আমি তোমার লেখা দেখে খুশি হয়েছি। আমার মনে হয়, রাণীও এমন করে লিখতে পারত না। যাও মা, দিয়ে এস তাকে।

দেবীর আচরণটা রাণীর ভাল লাগেনি। প্রশান্ত বাবু এমন কিছু খারাপ কথা লেখেন নি, যার জন্যে দেবী ও-ভাবে রেগে উঠবে। বাবার ইচ্ছে, তারা আধুনিকা হয়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু মা যেভাবে দেবীকে নিয়ে পড়েছেন, তাতে তার উন্নতির কোন আশাই নেই। অরুণার চিঠির জবাব লিখে, রাণীই দেবীর হোয়ে প্রশান্তকেও এক চিঠি লিখেছে এই ভাবে: অরুণার চিঠিতে আপনার কথা জানলাম। আপনি আমার দিদিকে চিঠি লিখলেও সে জবাব দিতে অনিচ্ছুক। সে বলে—আগে আলাপ-পরিচয় হোক,

তার পর চিঠি। দিদির একটু লজ্জা বেশী। যাই হোক, আপনি কিছু মনে করবেন না। দিদির হোয়ে আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি—সন্ধ্যার পর অরুণার সঙ্গে এ বাড়ী আসবেন, দিদির সঙ্গে আমি আপনার আলাপ করিয়ে দেব।

শিক্ষিত পায়রা দু'টি এতক্ষণ যথাস্থানে বসে রাণীর দেওয়া পাকা ফল টুকছিল। বড়লোকের বাড়ীর পোষা পায়রা, ফল, মেওয়া, ক্ষীর, ছানা খেতে অভ্যস্ত, রাণীও এ সব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত—পাণ থেকে চুণটুকু খসতে দেয় না। পায়রা দুটোও জানে, জবাব নিয়ে তাদের যেতে হবে। খেতে খেতে এক এক বার মুখ তুলেও মুখ দিয়ে একটা মিষ্টি স্বরে যেন জানাচ্ছিল—তাড়াতাড়ি কর।

দুটো পায়রার পায়েই চিঠি দু'খানা বেঁধে দিয়েছে রাণী, এমন সময় দেবী এসে তার চিঠিখানা দিল রাণীর হাতে। বলল: এই চিঠি পাঠিয়ে দে। আর, শোন্—কাল থেকে আমি এ খেলার মধ্যে আর থাকছি না।

এক নিশ্বাসে কথা কটা বলেই সে চলে গেল। রাণী চিঠিখানা পড়ে নাক-মুখ সিঁটকে কুচি-কুচি বরে ছিড়ে ফেলল, সেই সঙ্গে পায়রা দুটোকেও উড়িয়ে দিল।

বাড়ির বারমহল ও অন্দর মহলের মাঝখানে পাশাপাশি সুসজ্জিত ঘর দু'খানি গৃহস্বামী ব্যবহার করেন এবং তাঁর প্রবেশপথের পরিধি এই পর্যন্ত। অন্দর মহলে জুতা পায়ে দিয়ে কিম্বা কোন রকম স্বেচ্ছাচারের উপায় নেই নিষ্ঠাবতী গৃহিণীর দপদপায়। বহির্মহলে অতিথি সৎকারকল্পে বিদেশীয় ব্যবস্থায় ড্রয়িংরুম ও পান-ভোজনের বৃহৎ হল থাকা সত্ত্বেও ভিতর মহলে পরিজন বা অন্তরঙ্গ দু'চার জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে এখানেই ভোজনপর্ব চলে। সংলগ্ন কক্ষান্তরে শয়নের ব্যবস্থা। গৃহিণীর প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মিল না হলেও তিনি তাঁর এলাকায় কোন দিনই অনধিকার প্রবেশ করেন না। এই ক্ষুদ্র মহলটিই মধ্যস্থরূপে গৃহিণীর সঙ্গে গৃহস্বামীর যোগসূত্র বজায় রাখে।

এ দিনও নিত্যানন্দ বাবুর বাড়ি থেকে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে বগলাপদ বাড়ী ফিরলেন—তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অন্যান্য দিন বাড়ী ফিরে প্রথমে বহির্মহলে তাঁর কক্ষেই প্রবেশ করেন বগলাপদ। এ দিন একেবারে মধ্যম মহলে তাঁর শয়নকক্ষে সরাসরি ঢুকেই গৃহিণীকে আহ্বান করলেন। গৃহিণীও

ও-বাড়ীর প্রশান্ত নামে ফাজিল ছোকরাটির আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত ভাবেই কর্তার আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। পরিচারিকাকে পর্যন্ত বলে রেখেছেন—কর্তা ফিরেছেন শোনবামাত্র যেন তাঁকে জানায়। এখন কর্তা সরাসরি তাঁর ঘরে এসে তাঁকেই ডাকছেন শুনে একটু বিস্মিত হলেও তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন।

গৃহিণী সুলোচনা দেবীই উষ্ণ ভাবে প্রথমে স্বামীকে শুধালেন: হ্যাগা, ও বাড়ীতে প্রশান্ত বলে কে একটা ছেলে এসেছে জান?

বগলাপদ স্মিতমুখে বললেন: কেন, তাকে নিয়ে কি হলো?

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সুলোচনা দেবী বললেন: বিকালে ঐ ছোঁড়া এমন এক কাণ্ড করেছে, শুনে অবধি রাগে আমার সর্বশরীর নিসপিস্ করছে, তোমাকে বলবার জন্যে।

বলই না—কি হয়েছে তাকে নিয়ে?

তোমার আধুনিকা কন্যে রাণী ও-বাড়ীর অরুণার পাল্লায় পড়ে পায়রা দিয়ে চিঠি চালাচালি করে জানো তো? বাপের জন্মে কখনো এ রকম খেলা দেখিনি, নামও শুনিনি। এদানি, দেবীকেও ঐ খেলায় নামিয়েছে। আজ বিকেলে দেবী তো হন্তদন্ত হয়ে আমাকে এক চিঠি দেখালে, বললে—ও-বাড়ী থেকে প্রশান্ত তাকে এই চিঠি দিয়েছে, অথচ সে তাকে চেনেও না, জানেও না।

বগলাপদ বেশ সহজ ভাবেই বললেন: বটে! তা সে চিঠি কোথায়?

আঁচলের খুঁট থেকে চিঠিখানি খুলে সুলোচনা দেবী স্বামীর হাতে দিলেন। পকেট থেকে চশমা বা'র করে চোখে লাগিয়ে বগলাপদ সে চিঠি পড়তে লাগলেন। পড়ার পর হো-হো শব্দে হেসে বললেন: এই ব্যাপার?

বিস্ময় ও বিরক্তিতে ভ্রু-কুঞ্চিত করে সুলোচনা দেবী স্বামীকে শুধালেন: যার জন্যে আমি বিকেল থেকে রেগে জলে মরছি, তুমি তাকে উপহাস করে হাসছ?

বগলাপদ বললেন: ব্যাপারটা শুনলে, তুমিও আমার মতন হাসবে—আর সেই কথা বলবার জন্য আমি বাড়ী ঢুকেই বরাবর তোমার এলাকায়

কাছেই এসেছি। ঐ যে প্রশান্তর কথা বললে, জানো ও কে? অরবিন্দ বাবুর ভাগনে, তা ছাড়া ঐ এখন তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

সুলোচনা দেবী বললেন: কেন, ওঁর ছেলে থাকতে—

সে ছেলে নেই। বলেই বগলাপদ ইউরোপে দুর্ঘটনার কথা যেমন শুনেছিলেন, স্ত্রীকেও শুনিয়ে দিলেন এবং প্রশান্তকে উপলক্ষ করে দেবীর সম্বন্ধে যে কথাবার্তা এক রকম পাকা হয়ে গেছে, সে সবও বিস্তারিত ভাবে বললেন।

অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী-পুত্রের অকাল বিয়োগের বার্তায় অভিভূত হয়ে শোক প্রকাশ স্বাভাবিক—বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। কিন্তু তারই পরের খবর—অত বড় একটা সর্বনাশের পরেই বিয়ের প্রসঙ্গ সুলোচনার পক্ষে যেমন অশোভন মনে হলো, তেমনি তাঁর এই বড় আদরের মেয়েটিকে নিয়ে প্রায় এক যুগ আগে হরগৌরীপুরে নীলের উৎসবের দিন শিবের ঘরে সবার সামনে ললিতের মায়ের সঙ্গে যে বাগ্দান হয়ে আছে, সে দৃশ্যটিও চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি কথা দিয়ে এসেছ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বগলাপদ বললেন: নিশ্চয়ই; এমন সুযোগ কখনো ছাড়া যায়? আমি প্রশান্তকে এখানে আসবার জন্যে বলেছি—

কথাটা শুনে সুলোচনা দেবী রীতিমত গম্ভীর হয়ে শুধালেন: দেশে ললিতের বাবাকে সেদিন কি বলেছিলে?

উপহাসের ভঙ্গিতে হেসে বগলাপদ বললেন: আবার সেই পুরানো কাসুন্দি টেনে আনছ? আগেই তো বলেছি তোমাকে, বার বছর আগে কি ছিলুম, আর এখন কি হয়েছি—দুটো অবস্থা মিলিয়ে দেখে বাস্তব দৃষ্টিতে স্থির করতে হবে—এখন কি কর্তব্য।

সুলোচনা দেবী সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: এ অবস্থায় বিবেক যা বলে, সেইটিই মেনে চলা কি উচিত নয়?

দৃঢ়স্বরে বগলাপদ বললেন: সবার বিবেক তো সমান নয়? ভিখিরীর বিবেক ভিক্ষার নির্দেশ দেয়, দস্যুর বিবেক ডাকাতি করতে বলে, বুদ্ধিমানের

বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে বলে। আমার বিবেক বলছে—এ ঠিক, যা স্থির করেছি। তার পর, মেয়ে যখন আগেকার কথা সব ভুলে গেছে। আমি জোর করে বলতে পারি, প্রশান্তকে দেখলে, তার সঙ্গে মিশলে দেবীও তাকে মেনে নেবে।

সুলোচনা দেবী বললেন: তা হয় না। তুমি যে বলছ দেবী সব ভুলে গেছে, কিন্তু আগেকার দেখা বা জানা কোন কিছু যদি ওর মনে জাগে, তখনি ওর বিবেক, নাগিনীর মত ফণা তুলে উঠবে, কেউ ওকে—

রুদ্ধস্বরে বাধা দিয়ে বগলাপদ বললেন: থামো। যদি সে নাগিনীকে কেউ ক্ষেপিয়ে তোলে, সে তুমি। কিন্তু তাকে বশ করবার দাওয়াইও আমার জানা আছে।

কণ্ঠস্বর গাঢ় করে সুলোচনা দেবী বললেন: তুমি আমার ওপর বৃথা সন্দেহ করছ। যে দিন থেকে তুমি আমাকে বারণ করেছ, আমি দেবীকে আগের কথা বলে জাগাতে কোন চেষ্টা করিনি। তার কারণ, আমি জানি যে, ওর বিবেকই ওকে জাগাবে—একটা পীঠস্থান আর পুণ্যদিনের কথা কখনো মিছে হ'তে পারে না, যদি অন্তর থেকে সে কথা বেরিয়ে থাকে। তোমার যা ইচ্ছা হয় কর, আমি শুধু মায়ের প্রাপ্য অধিকারটুকু নিয়ে ওর দিকে নজর রাখব—যাতে ও পথ থেকে পা পিছলে না পড়ে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে চোখ দু'টি মুছতে মুছতে সুলোচনা দেবী তাঁর মহলে চলে গেলেন। বগলাপদ অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আপন মনে বললেন: ননসেন্স!

সুলোচনা দেবীও তখন রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের এই দীর্ঘ পথ সদ্ভাবে এগিয়ে এসে এখন স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখী অবস্থায় বাগ্‌যুদ্ধ অত্যন্ত অন্যায় ও অপ্রীতিকর ভেবে তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করে ইষ্টদেবীর চরণে শরণ নিলেন। কিঞ্চিৎ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে কক্ষের দেওয়ালে একটি বিশেষ স্থলে সংস্থিতা ইষ্টদেবীর আলেখ্য লক্ষ্য ক'রে মিনতি জানালেন: ইচ্ছাময়ী তুমি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে জানি। তবুও বলি—অন্তর্যামিনীরূপে জানছ ত, যত বড় সুযোগ-সুবিধাই আসুক, তার

মোহে সত্যকে হেলা করবার প্রবৃত্তি আমার যেমন নেই, স্বামীর মনেও আঘাত দিয়ে তাঁকে নীচু করবার প্রবৃত্তিও যেন আমাকে না পেয়ে বসে। মন বুঝে তুমিই বুদ্ধি দিও মা—মুখ রক্ষা ক'রো!

পিছন থেকে দেবী এসে বলল: মা তুমি কাঁদছ?

আঁচলে চোখ দু'টি মুছতে মুছতে মা বললেন: ঠাকুর-দেবতাকে মন দিয়ে ডাকলেই চোখ দিয়ে জল পড়ে মা—তাকে কান্না বলে না। কোথায় যাচ্ছ তুমি?

দেবী বলল: ঠাকুরঘরে ধুনো-গঙ্গাজল দেব ব'লে যাচ্ছি।

যাও—কাপড় ছেড়ে আমিও যাচ্ছি।

বলেই মা নিজের কক্ষে যাবার জন্য সেখান থেকে চলে গেলেন।

১৫

ওদিকে বগলাপদ বহির্মহলে এসেই রাণীকে ডাকতে ডাকতে দ্রুতপদে মেয়েদের পড়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। দেবীও এখানে এতক্ষণ ছিল, কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ায় অভ্যাস মত এইমাত্র তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়েছে। রাণী বুঝতে পারে, মায়ের শিক্ষামত দেবীর টনক নড়েছে—ঠাকুর-ঘরের মোহ তাকে টানছে। কিছু না ব'লে মুখ টিপে শুধু সে হাসল। বাবা ও মায়ের বিভিন্নমুখী প্রকৃতি তার অজ্ঞাত নয়। বাবার কাছে ধর্মকর্ম ঠাকুর-দেবতা, পূজা-পাঠ এ সবের কোন মূল্য বা মর্যাদা নেই—এ সব নিয়ে সময় ও অর্থনষ্ট করবার কোন সার্থকতা আছে বলে তিনি মনে করেন না! অথচ, মায়ের কাছে এগুলির প্রতিটি অপরিহার্য, ঠাকুর-দেবতার প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধার অন্ত নেই। সেইজন্য বাড়ীতে ধর্মানুষ্ঠান হ'লে বাবার পক্ষ থেকে কখনো কোনরূপ বাধা ত' আসেই না, বরং তার ক্রটিহীন সমাপ্তির জন্যে তাঁকেও

উৎসুক দেখা যায় এবং বন্ধুবান্ধব সে সময় উপস্থিত থাকলে, ভুয়িংরুমে প্রসাদের ডিস পাঠাবার জন্য তাগিদও পড়ে। পিতা-মাতার প্রকৃতিগত এরূপ বৈষম্য কন্যার অন্তরে যে সমস্যা তোলে, তাতে সে নির্লিপ্ত থাকাই সঙ্গত মনে করে। দেবীর অনুকরণে রাণী যে ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুর-দেবতার উদ্দেশে মাথা খুঁড়তে অভ্যস্ত নয়, এ সংবাদ পিতাকে যেন রীতিমত উৎসাহ দেয়—সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিনি কন্যার দিকে তাকান, সেই দৃষ্টি থেকেই রাণী বুঝতে পারে যে, পিতা তার ব্যবহারে প্রসন্ন হয়েছেন। এ অবস্থায় রাণী ভাবে, পিতা যেমন তাঁর কর্মের মধ্যেই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করেন—লোকদেখানো ধর্মাচরণে তাঁর প্রবৃত্তি নেই, সে-ও তেমনি পিতাকেই অনুসরণ করে নির্লিপ্ত থাকবে। অবশ্য, মা বা ভগিনী যাতে তার আচরণে অসন্তুষ্ট না হন, সে দিকটা বজায় রাখবার জন্য সে স্থির করেছে, এ সব অনুষ্ঠান নিয়ে কখনো তর্ক তুলবে না বা ধর্মকর্ম ও ঠাকুর-দেবতার প্রতি তার যে বিশ্বাস নেই, মাতা বা ভগিনীকে জানতেও দেবে না। যদি ধর্ম বলে কিছু থাকে, ঠাকুর-দেবতা সত্য হন, তাহলে এক দিন তাঁরাই চোখে আঙুল দিয়ে জানিয়ে দেবেন, সত্যই তাঁদের অস্তিত্ব আছে। পড়ার মধ্যে কিঞ্চিৎ অবসর পেলেই রাণীর মনে এই চিন্তা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় এবং এরই মধ্যে সে ধড়মড় করে উঠে নিজেকে শক্ত করে নিজের মনেই বলতে থাকে—এ সব চিন্তা আমার পক্ষে ঠিক নয়, আমি যে—আধুনিকা।

পড়ার ঘরে বসে সন্ধ্যা সমাগম দেখে দেবী তাড়াতাড়ি উঠে যেতেই রাণীর মনে দিদির সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তাটি আবার জাগ্রত হয়ে ওঠে। এমনি সময় বগলাপদ তাকেই ডাকতে ডাকতে কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাণী তাড়াতাড়ি উঠে নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: ডাকছেন বাবা?

বগলাপদ একটা কেদারায় বসতে বসতে বললেন: হ্যাঁ, ব'স—কথা আছে।

রাণী আস্তে আস্তে তার স্থানটিতে পুনরায় বসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে তাকাতেই বগলাপদ বললেন: তোমার অরবিন্দ জ্যেঠামণি বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন, তাঁর ভাগনে প্রশান্তকে নিয়ে। ঐ ছোকরাই এখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

এই প্রসঙ্গে বগলাপদ বিদেশে ওঁদের বিপত্তির কথা বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। রাণীও সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্ত কণ্ঠে বলল: অরুণা আমাকে চিঠিতে সে সব কথা লিখেছে। খুবই দুঃখের কথা। এখন ঐ ভাগনেই ওঁর ভরসা। অরুণা লিখেছে, আজই সন্ধ্যার পর প্রশান্তবাবুকে নিয়ে এখানে আসবে।

বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন: ও! তুমি তাহলে খবরটা এরই মধ্যে পেয়ে গেছ? অরুণা-মা'র পায়রাই বোধ হয় খবরটা এখানে সরবরাহ করেছে?

রাণী মুখখানি নিচু করে মৃদু হেসে ঘাড়টি ঈষৎ দুলিয়ে বলল: হ্যাঁ।

বগলাপদ একটু থেমে, কন্যার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আর একবার তাকিয়ে বললেন: তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান হয়েছে? প্রশান্ত সম্বন্ধে অরবিন্দ দা'র সঙ্গে আমার যে সব কথা হয়েছে, অরুণা শুনেছিল মনে হচ্ছে, তাহলে ও তার আভাসও যে—

রাণী পিতাকে আর প্রশ্নটি নতুন করে বলবার অবসর না দিয়েই ক্ষিপ্র ভাবে নিজেই বলল: হ্যাঁ বাবা, অরুণার চিঠিতে আমরা সবই জেনেছি, দিদিও—

কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বগলাপদ বললেন: দেবীও শুনেছে? তার পর?

পরের ঘটনা রাণী খুব সংক্ষেপেই বলল: প্রশান্তবাবু নিজেই তাঁর পরিচয় দিয়ে দিদিকে একখানা চিঠি দেন—অজিতবাবুর পায়রার পায়ে বেঁধে। দিদি তো সে চিঠি পড়ে রেগেই অস্থির, তখনি সেখানা নিয়ে মা'র কাছে নালিশ করতে যায়। মা-ও সেই চিঠি পড়ে খুব চটে যান, তারপর দিদিকে দিয়েই সে চিঠির জবাব লিখিয়ে পাঠিয়ে দিতে বলেন।

ব্যগ্র কণ্ঠে বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন: সে জবাব নিয়ে অজিতের পায়রা তাহলে চলে গেছে নিশ্চয়ই! আর তুমি আশা করছ—অরুণা এখনি প্রশান্তকে নিয়ে আসবে? তোমার মা তো তাদের আশার পথে কাঁটা দিয়েছেন। তুমি সে জবাবটা পড়েছিলে?

অপাঙ্গে পিতার উগ্র মুখখানির দিকে একটি বার চেয়ে তাঁর মনের ভাবটুকু বুঝে নিয়ে রাণী বলল: পড়েছি, আর সেটা কড়া হয়েছে বুঝতে পেরে দিদিকে ঠকিয়েছিলুম,] সে চিঠি ও-বাড়ীতে যায়নি।

উল্লাসের সুরে বগলাপদ বললেন : বল কি ! তাহলে ?

রাণী বললে : অরুণা আমাকে সব কথাই সংক্ষেপে লিখেছিল। দিদি সে-সব কথা জানত না বলেই, রেগে উঠে মা'র কাছে যায়। চিঠিখানা পড়ে আমার মনে হয়—কিছুতেই পাঠানো উচিত নয়। দিদি অবশ্য জানে না যে, চিঠিখানা পাঠানো হয়নি, ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

প্রসন্ন মনে বগলাপদ বললেন : তুমি বুদ্ধিমতী, ঐ বিশ্রী সিচুয়েসনটাকে সেভ করে খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ। এই তো চাই ! তোমার মা তো দেবীকে সত্যযুগের মেয়ে করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কিন্তু এটা যে আধুনিক যুগ, এখানে আধুনিকাদেরই কদর বেশী, উনি তা বুঝবেন না। সেই জন্যেই দেবীর শিক্ষাভার তোমার ওপর চাপিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। জানি, তোমার চেষ্টায় দেবীও এক দিন আধুনিকা হয়ে উঠবে।

রাণী মনে মনে ভাবে, আধুনিকা বলতে বাবা কি বোঝেন ? কলেজে কতিপয় সহপাঠিনীর সঙ্গেও রাণীর এই 'আধুনিকা' সম্বন্ধে কথা হয়। তারাও রাণীর মত ভেবে স্থির করতে পারে না--'আধুনিকা' এই কথাটি শুনলেই এক শ্রেণীর রক্ষণশীল সমাজে চাঞ্চল্য ওঠে কেন ? কলেজে পড়লে, কোন পুরুষ-তত্ত্বাবধায়ক সঙ্গে না নিয়ে পদব্রজে কিম্বা ট্রামে-বাসে বা রিক্সায় স্বচ্ছন্দ ভাবে একাকিনী যাতায়াত করলে এবং তৎকালে প্রয়োজন স্থলে অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে অসংকোচে আলাপ-আলোচনা চালালেই কি 'আধুনিকা' বলে চিহ্নিত হওয়া যায় ? শুধু কি বাহ্যিক ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করেই রক্ষণশীল সমাজ অধ্যয়নশীলা তরুণীদিগকে উক্ত আখ্যায় অভিহিত করে থাকেন ? অনেক সময় পড়ার ঘরে বসে রাণী এ সম্পর্কে নিজের মনেই আলোচনা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তার ইচ্ছা হয় যে, উপযুক্ত প্রমাণ ও নজীর সব সংগ্রহ করে সমাজপতিদের সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রতিপন্ন করবে--আধুনিকার প্রকৃত সংজ্ঞা কি এবং সেই সংজ্ঞা অনুসারে আধুনিকা নারী ভারতীয় সমাজে শ্রদ্ধেয়া কি না ! অবশ্য, সে এক কঠোর পরীক্ষা এবং দীর্ঘ সময় ও সাধনা সাপেক্ষ।

বেয়ারা এসে খবর দিল, ও-বাড়ীর দিদিমণির সঙ্গে নতুন এক দাদাবাবু

এসেছেন। কিন্তু তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে . অরুণা রাণীর সন্ধানে দ্রুতপদে পড়বার ঘরে ঢুকেই গৃহস্বামীকেও সেখানে দেখে চমকে উঠল। সে ভেবেছিল, পড়ার ঘরে এ সময় রাণী ও দেবীকে দেখতে পাবে। তখনই সঙ্কুচিত হয়ে বলল: আপনি এখানে জানতুম না কাকাবাবু, হয়ত প্রাইভেট কথা হচ্ছিল আপনাদের, আমাকে মাপ করবেন।

বগলাপদ হেসে ফেলে বললেন: কথা শোন পাগলী মেয়ের! নিজের মেয়ে আর তুমি—আমার চোখে দু'জনেই সমান, তোমাদের কাছে আবার প্রাইভেট কি? ব'স মা!

অরুণা একটু ব্যস্ত ভাবেই বলল: তাহলে এখানে আর বসব না কাকাবাবু, প্রশান্ত দা' এসেছেন কি না, ড্রয়িং-রুমে তাঁকে—

তাই বল! প্রশান্ত বাবাজীকে সঙ্গে করে এনেছ—চল মা, তার সঙ্গে আলাপ করি। আর রাণী, তোমার দিদিকে ড্রয়িং-রুমে ডেকে আনো। সেই সঙ্গে দিশি খাবার-দাবার যা তৈরি আছে, তোমার মাকে পাঠাতে বলবে।

অরুণা জিজ্ঞাসা করল: কাকাবাবুর বাড়ীতে কি দিশি-বিলিতি খাবার-দাবার হামেশাই তৈরি থাকে?

বগলাপদ বললেন: রুচি ত সবার এক রকম নয় মা! প্রশান্ত সন্ত বিলেত থেকে আসছে, দিশি খাবার ওর মুখে এখন ভালোই লাগবে বলে ব্যবস্থা করতে বললাম। আর তোমার কাকীমার একটা মস্ত শখ—বাড়ীতে নিজের হাতে খাবার তৈরি করা চাই-ই, আর সে খাবারগুলোও চপ-কাটলেট-পুডিং-এর সঙ্গে আমাদের না খাইয়ে ওঁর তৃপ্তি নেই।

অরুণা সহাস্যে বলল: কাকীমার হাতের খাবার সত্যিই উপাদেয়, আমি ত যখনই আসি আপনার বাবুর্চির চপ-কাটলেট ফেলে রেখে কাকীমার হাতের কচুরী, গোকুল পিঠে, মোহনপুরী, পাটিসাপটা তোয়াজ করে খাই।

বগলাপদ বেয়ারার পানে চেয়ে হুকুম দিলেন: আবদুলকে বল, দু'জন গেষ্ট এসেছেন, চা, টোষ্ট, রোষ্ট শীগ্‌গির যেন হাজির করে। চলো মা, আমরা ও-ঘরে যাই।

রাণী অন্য দরজা দিয়ে ভিতরে গেল। বগলাপদ অরুণাকে নিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে চললেন।

সাহেবী কায়দায় ইভিনিং ড্রেস পরে প্রশান্ত এ-বাড়ীতে এসেছে। তার মুখে পাইপ, সেই অবস্থায় ড্রয়িংরুমে আবৃত কার্পেটের উপর ফাঁক ফাঁক করে পা ফেলে, সে বিভিন্ন আধারে সাজানো ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি, দেওয়ালে টাঙানো সারি সারি অয়েল-পেন্টিং ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। অরুণাকে নিয়ে বগলাপদ প্রবেশ করতেই প্রশান্ত পাইপটা লুকিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিল, বগলাপদ সানন্দে সেই প্রসারিত হাতে হাত দিয়ে বিলাতী কায়দায় সাদর আপ্যায়ন করতে করতে বললেন: তোমার মামাবাবু এলে আরো খুসি হতাম।

প্রশান্ত বলল: আপনি ত তাঁর দেহের অবস্থা দেখে এসেছেন। বাইরে বেরুবার শক্তি নেই, বেশী নড়া-চড়া হোলেই হার্টের ট্রাবল বাড়ে। অত বড় শোক, তার ওপর অ্যাকসিডেন্টের ধাক্কা সামলাতে এখনো পারেন নি।

সহানুভূতির স্বরে বগলাপদ বললেন: সবই জানি বাবা, বুঝিও সব, তবু মন কেমন করে—শুভ কথা আজ হলো, বাড়ীতে তাঁর পায়ের ধুলো পড়লে সেটা যেন সার্থক হোত, আমরাও তৃপ্তি পেতাম। তবু বলব বাবাজী, ওঁর মনের খুব জোর—অত বড় দুটো ঘা খেয়েও শয্যা নেন নি, উঠে দাঁড়িয়ে বেড়াচ্ছেন! যাক্, তুমি যে সঙ্গে এসেছ, তবু ওঁর পক্ষে অনেকখানি ভরসার কথা।

প্রশান্ত বলল: আমার ইচ্ছা ছিল, আরো বছর খানেক ওখানে থেকে আজকালের ফ্যাসানের কতকগুলো বাড়ী তৈরির কাজ-কর্মগুলো করে দেখব। কিন্তু মামাবাবুর অবস্থা দেখে আর সে সব হলো না, কিছুতেই উনি আর ওদেশে থাকতে চাইছিলেন না, তাই তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে হল।

এই সময় রাণীর সঙ্গে দেবীও ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল। বগলাপদ বললেন: আমার ছেলে-পুলে বলতে এই দু'টিকে নিয়েই সব। এইটি বড় নাম—দেবী; আর ছোটটি—রাণী।

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাতখানা বাড়িয়ে দিলে রাণী সহাস্যে

নিজের হাতখানিও বাড়িয়ে দিয়ে সম্ভাষণ-পর্ব শেষ করল। কিন্তু দেবীর দিকে হাত বাড়াতেই সে দু'পা পিছিয়ে এসে নিজের হাত দু'খানি যুক্ত করে কপালে ঠেকাল। এ শিক্ষা সুলোচনা দেবীই কন্যাকে দিয়েছিলেন। দেবীর দেখাদেখি প্রশান্তও যুক্ত করে নমস্কার করতে বাধ্য হলো। বগলাপদ দেবীর আচরণে বিরক্ত হয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। পরক্ষণে প্রশান্তকে বললেন: দেবী বয়সে বড় হলেও পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়েছিল অসুখের জন্যে। নৈলে ওরও মেধা কম নয়। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেছে।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল: এখনো পড়ছেন?

রাণী কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বগলাপদ খপ করে বললেন: পড়ছে বৈ কি; ওর অবিশ্যি ইচ্ছা ছিল, আগের মত প্রাইভেটে কলেজের পড়া পড়ে, কিন্তু আমার মনে হয় তাতে স্মার্ট-নেসটা ফুটে ওঠে না। সাধারণতঃ আমার ও মেয়েটি যত গুণের হোক, এদিকে কিন্তু 'সাই'। আমার ছোট মেয়ের মত স্মার্ট নয়। কিন্তু এ যুগে মেয়েদের লজ্জাটা অনেকে পছন্দ করে না। সেই জন্যেই ওকে রাণীর মতই কলেজে ভর্তি করে দিয়েছি।

প্রশান্ত প্রসন্ন ভাবেই বলল: ভালই করেছেন। আমারও ধারণা—কলেজে না পড়লে যেমন চালাক-চতুর হওয়া যায় না, তেমনি আউট নলেজও হয় না। তা ছাড়াও আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমি ওঁকে হিষ্ট্রি য়্যাণ্ড কালচার সম্বন্ধে পড়াতে পারি।

উৎফুল্ল মুখে বগলাপদ বললেন: আপত্তি কেন হবে, খুব ভালো প্রস্তাব। অজিত এখানে থাকতে প্রত্যেক দিনই অরুণাকে নিয়ে আসত; কত কথা, গান গল্প, পড়াশোনা নিয়ে চর্চা; লজ্জা, সংকোচ ব'লে কিছুই ছিল না। তুমিও বাবা, তেমনি আসবে, আলাপ-আলোচনা করবে, তার ওপর—যদি দেবীকে পড়াও তো কথাই নেই। আর—অরুণা-মা, তোমারও ঐ সঙ্গে আসা চাই, তুমি না এলে রাণীর দিকটা হাল্কা হবে, ও আনন্দ পাবে না।

অরুণার আগেই প্রশান্ত বলল: আসবে বৈ কি, ঐ তো আমার গেট-পাস্—আমি নিজেই ধরে নিয়ে আসব। তারপর—ওকে আনবার আরো উদ্দেশ্য আছে, সে সব কথা পরে বলব। মোট কথা, আপনারা আমাকে

ছেলের মতই ভাববেন, অজিতকে যে চোখে দেখেছেন, আমার ওপরে সেই দৃষ্টি রাখলেই আমি ধন্য হবো।

অরুণা বলল : দেখছেন কাকাবাবু, এক দিনেই এ ছেলে নিজের কোলে ঝোল টানবার কায়দাগুলো কেমন জেনে নিয়েছে। কিন্তু দেবীদি', তুমি যে এ-ঘরে এসে অবধি মুখ বুজিয়ে আছ—প্রশান্তদা'র সঙ্গে আলাপ কর, জিজ্ঞাসা কর অ্যাদ্দিন বিলেতে কি ভাবে কাটিয়েছেন—

রাণী খিল্-খিল্ করে হেসে বলল : তাহলে কণিক নিয়ে ওঁর সঙ্গে দিদিকে বোঝাপড়া করতে হয়। দিদি কিন্তু স্থপতি-বিজ্ঞানের বদলে চিত্র-বিজ্ঞানটাকে সেকেণ্ডারী শিক্ষারূপে বেছে নিয়েছেন।

অরুণা সোৎসাহে বলল : তাই না কি? কিন্তু কৈ শুনিনি তো, আরও বিস্তার কোন নমুনা দেখেছি বলে ত মনে হয় না?

বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন : দেবী ছবি-আঁকা শিখছে? বটে!

প্রশান্ত বলল : ও দেশের মেয়েরা, কিন্তু আর্টের ভারি ভক্ত; যাঁরা ছবি আঁকেন, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাও তাঁদের খুব। তা' ইনি শিখছেন কোথায়? আর্ট কলেজে?

এই সময় দেবীই আস্তে আস্তে বলল : ও আমার ছেলে খেলা। ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরের ছবি দেখতে দেখতে ছবি আঁকবার শখ হয়। তারপর ম্যাট্রিক পড়ার সময় গঙ্গা দেবী নামে একটি মেয়ে অঙ্ক আর জ্যামিতি শেখাতেন আমাকে। তিনি ছবিও আঁকতেন। আমি চুপি চুপি ঠাকুর-দেবতার ছবি আঁকি জানতে পেরে, তিনি সেই ছেলেমানুষী আঁকা শুধরে দিয়ে হাতে ধরে ধরে কিছু দিন শিখিয়েছিলেন। এই আমার পুঁজি।

প্রশান্ত বলল : বেশ ত, আপনার পুঁজির দফ্তরটি আনুন না, আমরা সকলে দেখি।

দেবী ঘাড় নেড়ে বলল : হাতে-খড়ি দিয়েই কেউ যদি কাঁচা হাতের দাগা বুলানো দেখিয়ে বাহাদুরি নিতে চায়, লোকে তাকে নিশ্চয়ই পাগল বলবে। আমি তো এখনো পাগল হইনি।

এই সময় বাড়ীর ভিতর থেকে কাঁসার রেকাবিতে পাঠানো বাড়ীতে

প্রস্তুত সাত্ত্বিক ধরণের খাদ্যসম্ভার এসে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চিখানার আবদুলের তৈরি পোরসিলিনের ডিসে-ভরা চপ-কাটলেট, অমলেট, মোগলাই প্রভৃতি তামসিক খাদ্যগুলিও যেন পাল্লা দিতে এলো। ওদিকে টেলিফোন বেজে ওঠায় সে-ঘরের কেরাণী ছুটে এসে খবর দিতেই বগলাপদকে উঠতে হলো। যাবার সময় তিনি দেবী ও রাণীকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা দুই বোনে মিলে যত্ন করে এঁদের খাওয়াও। আমি কলটা ধরেই আসছি।

শ্রদ্ধাভাজন গৃহস্বামী উপস্থিত থাকায়, রাণী ও অরুণা এতক্ষণ যেন লাগাম দিয়ে মুখ কষে রেখেছিল, এখন লাগাম সরতেই—তারাও বে-পরোয়া হয়ে উঠল। প্রশান্তও যে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে ও আবোল-তাবোল কথা বলে বাহাদুরি দেখাতে খুব পটু, বিকেলের শিষ্টাচারবর্জিত চিঠিখানা থেকেই দেবী সেটা উপলব্ধি করেছে। সেই লোক সন্ধ্যার পর এ-বাড়িতে আসায় পিতার আদেশ মত রাণী, বাইরের ড্রয়িং-রুমে আসবার জন্য দেবীকে বলতেই সে মাকে জিজ্ঞাসা করল: কি করব মা? বিকেলে ও-ভাবে যে লোক চিঠি লিখেছিল, সে এসেছে এবং বাবা ডাকছেন ওখানে যাবার জন্যে।

বুদ্ধিমতী সুলোচনা দেবী স্বামীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি রেখে কন্যাকে বললেন: উনি যখন ডাকছেন, যাবে বৈ কি। ছেলেটি যা জিজ্ঞাসা করবে, জানা থাকলে বলবে। নিজে থেকে কোন কথা জানতে চাইবে না। হাজার পীড়াপীড়ি করলেও ওঁদের সঙ্গে খাবে না, কোন কথা নিয়ে হাসাহাসি করবে না।

রাণীকে তিনি কিছুই বলেন নি। কর্তা তাকে আধুনিকা করবেন, বিদেশী আদব-কায়দা শিখাচ্ছেন, কলেজে সহ-শিক্ষা পেয়েছে, সে বি-এ পাস করে এম এ পড়ছে, কাজেই তাকে বলবার তাঁর কিছু নেই। তবে একটি কথা তিনি রাণীকে একদা বলেছিলেন: দেখ মা, ইংরেজরাও সপ্তাহে একটা দিন সকাল বেলায় বাড়িশুদ্ধ সবাই মিলে গীর্জায় যায়—ঈশ্বরকে ডাকে, তাঁর উপাসনা করে। অন্ততঃ সেই নজিরটাও যদি নাও, একটা দিন অন্ততঃ সকাল বেলায় ঠাকুরঘরে বসে খানিকটা সময়—তোমার ইচ্ছামত যে কোন ঠাকুরকে যদি ডাক, নিজের যা কামনা জানাও, তা হলে মা, কেউ নিন্দা করবে না। করলেও

সাহেবদের কথা বলবে। তখন দেখবে—জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। মায়ের সেই কথার মধ্যে রাণী একটা যুক্তি পায়, তাই অবহেলা করতে পারেনি। প্রথম প্রথম বাধ-বাধ ঠেকলেও ক্রমশঃ সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়—মন্দ লাগে না ঠাকুরঘরে বসে খানিকক্ষণ তার বাঞ্ছিত কোন ঠাকুরকে নিজের মনের কথা জানানো। কিম্বা একান্ত অভিলষিত কোন কিছু চাওয়া। মা বলেছেন, ঠাকুর-দেবতার নাম রূপ প্রকৃতি আলাদা হ'লেও আসলে তাঁরা এক। এমন কি, নিজের পিতা কিম্বা মাতাকে অথবা পিতা-মাতা উভয়কে যদি নিজের ঈপ্সিত দেব-দেবীর প্রতীক করে ভক্তিভরে অর্চনা করা যায়, তাও ব্যর্থ হয় না—সর্বরূপ সর্বশক্তি সর্বপ্রকৃতির আধার যে পরমেশ্বর, তাঁকেই তাতে ডাকা হয় এবং তিনি সে অর্চনা গ্রহণ করেন, প্রার্থনা শোনেন। মায়ের এই উক্তি উদ্ভট হ'লেও বিদুষী মেয়ে রাণীর অন্তরে এমন গভীর ভাবে দাগ কেটে বসে যে, মুছবার বা ভুলবার উপায় থাকে না। তার একবার মনে হয়—বাবা মা দু'জনকে সামনে বসিয়ে সে পরীক্ষা করে দেখে মায়ের এই উপদেশ, কিন্তু লজ্জায় বাধে। হয়ত, মা আপত্তি করবেন না, কিন্তু দুরন্ত ও নাস্তিক দেবতার প্রতীকরূপে পিতাই কথা শুনে ক্ষেপে উঠবেন—নস্যাৎ করে দেবেন মায়ের এত বড় অভিনব 'থিওরী'টা। যাই হোক, অতি বড় নাস্তিকের সংস্পর্শে থেকে, তাঁর আদর্শ উপলব্ধি ক'রে, তাঁর আদরিণী কন্যা হয়েও রাণী কিন্তু মায়ের কাছে পাওয়া অতি সহজ ও সাদাসিধে এই নির্দেশটির প্রতি এমনি আস্থাবতী হয়ে পড়েছে যে, সবার অজ্ঞাতে সংগোপনেও তাকে অন্ততঃ পনের মিনিটের জন্যও সে নির্দেশ পালন করতেই হবে। ঠাকুরের কাছে তার কামনা প্রার্থনা শুধু একটি দুর্লভ বস্তু, সেটি হ'চ্ছে—শক্তি। তার বিদ্যা, তার কথা, তার ইচ্ছা, তার প্রেরণা—প্রত্যেকটি যেন শক্তিময়ী হয়ে ওঠে, এই প্রার্থনাটুকু শক্তিরূপা দেবীর কাছে তাকে জানাতেই হবে। বাস্তব-জগতে কেউ যেন তাকে হারিয়ে দিতে না পারে—সে যেন হয় সর্বত্র ও সবার কাছে অজেয়া, এর বেশী কোন কামনাই তার নেই।

বগলাপদ ড্রয়িং-রুম থেকে উঠে যেতেই অরুণা খিল-খিল করে হেসে বলে উঠল: কথা বলবার জন্যে পেট ফুলে জয়ঢাক হয়ে উঠছিল, অথচ কাকাবাবুর

রঙ্গে স্পীকটি নট্—এখন চিচিং-ফাঁক। দেবীদি,' তুমি যে অমন করে আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব নিয়ে থাকবে, সেটি হ'চ্ছে না—প্রশান্তদা'র পাশে বসে পড়, ওঁর পার্টনার হও।

প্রশান্ত তখন অপর ডিস থেকে কাঁটা-চামচ তুলে বাড়ির ভিতর থেকে প্রেরিত খাদ্যগুলির উপর চালিয়ে তাদের আস্বাদ নিতে পরমোৎসাহে ব্যস্ত। অরুণার প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রীত হয়ে দেবীকে আহ্বান করল: আসুন, আসুন। আপনি এ ব্যাপারে পার্টনার হ'লে হয়ত এমনি আর এক নতুন আনন্দ পাব।

মৃদু হেসে রাণী জিজ্ঞাসা করল: আপনার কথাটাও যে নতুন, মানে বুঝিয়ে দিন।

প্রশান্ত বলল: এই দেখুন না—ঐ ডিসখানার মোগুলো কত জানা-শোনা, কিন্তু এখানকার খাদ্যগুলি নতুন ধরণের দেখে, আগেই আলাপ সুরু করি। এখন স্বাদ পেয়ে আর ছাড়তে পারছি না—এমনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। বুঝলেন মানেটা?

অরুণা বলল: দেবীদি,' প্রশান্তদা'র আর একটা মস্ত গুণ—খুব হাসাতে পারেন, খুব রসিক পুরুষ। কিন্তু ও কি! দেবীদি, ওঠ!—

দেবী দিব্য সহজ কণ্ঠে বলল: আপনারা দু'জনে এখানে অভ্যাগত, আপনাদের অভ্যর্থনার জন্যই মা নিজের হাতে ঐ রেকাবীর খাবারগুলি তৈরি করেছেন। ওঁর ভাল লেগেছে শুনলে, মায়ের মনে বেশী আনন্দ হবে। আপনারা খান, আমরা দুই বোন আপনাদের পরিচর্যা করব।

প্রশান্ত মুগ্ধের মত দেবীর মিষ্ট কথাগুলি শুনছিল। অরুণা একটু বিস্মিত ভাবেই বলল: বা রে, আমরা দু'জনে খাব—আর তোমরা দেখবে! আমি ভেবেছিলুম—চার জনের জন্যই খাবার এসেছে।

রাণী বলল: এ সময় ত' আমরা খাই না; আর খানিক পরে আমরা খাব।

প্রশান্ত বলল: তাহলে আর খানিক পরেই এগুলো পাঠালে ভাল হোত। আমরা ততক্ষণ গল্প করতাম, তারপর একসঙ্গেই খেতাম। অবিশ্যি, মনের ক্ষুধা তাতে তৃপ্তি পেত বটে, কিন্তু পেটের ক্ষুধা রেগে তখনি বাপান্ত করত—

এমন ভঙ্গিতে ভোজ্য-ভক্ষণ করতে করতে প্রশান্ত কথাগুলি বলল যে, শুনে তিন জনেই হেসে ফেলল। দেবী কিন্তু তৎক্ষণাৎ মায়ের নির্দেশটি মনে পড়ায় মুখখানা সহজ করে রাণীকে অনুচ্চ স্বরে বলল: ওঁর রেকাবী খালি হয়ে গেছে; বিলাসী গেল কোথায়? আচ্ছা, আমিই আনছি।

কিন্তু দেবী উঠতে না উঠতেই গৃহিণী সুলোচনা দেবী নিজেই ভোজ্যপাত্র নিয়ে দ্রুতক্রমে এলেন। তাঁকে দেখেই অরুণা তাড়াতাড়ি উঠে বলল: কাকীমা, আপনি নিজে এসেছেন পরিবেশন করতে, কি আশ্চর্য!

সুলোচনা দেবী বললেন: আশ্চর্য নয় মা। আমারই উচিত ছিল আগে আসা। কিন্তু নিজে তৈরি করছিলাম, গরম-গরম তোমরা খাবে, তাই আসতে পারিনি। তুমি ব'স মা ব'স। খাবারগুলি যে তোমাদের ভাল লেগেছে, এতেই আমার আনন্দ। খাও বাবা!

প্রশান্ত উঠছিল, কিন্তু সুলোচনা দেবী বাধা দিয়ে বললেন: থাক থাক বাবা, উঠতে হবে না, খাও তো—

প্রশান্তর খালি রেকাবীখানি তিনি পুনরায় ভরিয়ে দিয়ে বললেন: তোমার কথা শুনিছি, কিন্তু দেখা তো হয়নি।

খেতে খেতেই প্রশান্ত বলল: অরুর কাছে আপনার আদর-যত্নর কথা শুনিছি। আর, আপনার হাতের তৈরি খাবার খেয়ে বুঝিছি কাকীমা, মিষ্টি মন না হলে এমন মিষ্টি খাবার তৈরি করা যায় না। এই দেখুন না, আমরা দু'জনেই এক নম্বর ডিস শেষ করে ফেলেছি। অথচ, বাবুর্চির ডিসে এখনো হাতই দিইনি। মায়েদের হাতের তৈরি খাবার যে এত ভালো হয়, তা জানা ছিল না কাকীমা! এর পর, কিন্তু প্রায়ই এসে উপদ্রব করব।

সুলোচনা দেবী বললেন: ভালোই ত বাবা, বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই তো মায়ের কাছে খাবার জন্যে আবদার করে। কিন্তু মায়েরা কি তাকে উপদ্রব মনে করে বাবা? যত কিছু আনন্দ তো ওরই মধ্যে। আসবে বৈ কি বাবা, মনে করবে এ তোমাদের নিজের ঘর-বাড়ী, আর এরা তোমার বোন। খাও বাবা তুমি, কারও মুখ চেয়ে লজ্জা ক'র না, ভাল করে খেতে পারাই তো মায়ের কাছে ছেলের বাহাদুরী।

প্রশান্তর রেকাবীতে সুলোচনা দেবী পাত্র থেকে আরও কতকগুলি খাদ্য দিতে থাকেন। ওদিকে তার ভোজনের ঘটা দেখে রাণী ও অরুণা মুখ টিপেও হাসি সম্বরণ করতে পারছিল না। সুলোচনা দেবী সেজন্য অরুণাকে ধমক দিয়ে বললেন: তোমাদের তো জানতে বাকী নেই—পাখীর আহার তোমাদের! কেউ ভালো করে খেলেও ঠাট্টা করবে, এ কি ভালো কথা? সেই জন্যই তো এই রকম লিকলিকে দেহ হচ্ছে। তুমি খাও বাবা, কারও পানে চেও না, খাও।

ফলতঃ প্রচুর ভাবে খেয়ে এবং সেই সঙ্গে দু'-চারটে সরল কথা বলেই একদিনে প্রশান্ত যেন এ বাড়ীতে তার ঠাঁই করে নিল।

১৬

রাধার অবয়বের আয়তনের পটভূমিকায় দেবীর বর্তমান বয়সের আলেখ্যটির চিত্রাঙ্কন শেষ করেই ললিত আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে আপন মনে বলল: অপূর্ব, সত্যই অপূর্ব!

অমনি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার একটি শ্লোক তার মনে পড়ে গেল; শকুন্তলার রূপমুগ্ধ রাজা দুষ্মন্ত যেখানে বয়স্যকে তাঁর প্রিয়ার রূপের পরিচয় দেন:

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

সদ্য-সমাপ্ত ছবিখানির উপর মুগ্ধদৃষ্টি নিবদ্ধ করে উদাত্ত কণ্ঠে সুললিত স্বরে ললিত সংস্কৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করতে লাগল। দেবীর ফটো দেখে

এর আগে তার বালিকা বয়সের কত ছবিই সে এঁকেছে, কিন্তু সে সব ছবি ললিতের অন্তরে কোনরূপ কাব্যিক ভাব জাগ্রত করে নাই। কিন্তু রাধার আকৃতির অনুমানে দেবীর নব যৌবনের ছবি আঁকবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের নায়ক নায়িকার সংলাপ পূর্বরাগের অনুরণন তুলে তাকে উৎফুল্ল করে। সংস্কৃত-সাহিত্যে ললিতের বিশেষ অধিকার। অধ্যাপকগণ তার আবৃত্তির প্রশংসা করেন। রাধা, ললিতের বাবার কাছে এ সব কথা আগেই শুনেছিল, কিন্তু ললিতের মুখে সংস্কৃত শ্লোক কোন দিন শুনে নাই। এই সময় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেই সঙ্গীতের চেয়েও মধুর শব্দলহরী শুনে প্রথমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তারপর যেই বুঝল—ললিতের ঘর থেকেই সেই মধুর স্বর ভেসে আসছে, তখন তার স্তব্ধতা ভেঙে গেল, তাড়াতাড়ি দ্রুত পদক্ষেপে সে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তখনও ললিতের কণ্ঠ থেকে স্বরের ঝংকার চলেছে।

পরমোল্লাসে সশব্দে করতালি দিয়ে রাধা বলল : বাঃ! সত্যই সুধাবর্ষণ করছ ললিতদা, কিন্তু কানে মিষ্টি লাগলেও মানে একটি বর্ণও বুঝতে পারছি না।

রাধাকে দেখেই ললিত অপ্রতিভ ভাবে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে তারপর বলল : তোমার কাছে কথা লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়; তাহলে বলি—তোমাকে সামনে রেখে দেবীর দেহের আদলটা যে ভাবে ছকেছিলাম, তারই ওপরে এখনকার বয়সের এক ছবি এই মাত্র এঁকে ফেলিছি, আর সেখানা দেখে—নিজের সৃষ্টিতে নিজেই এমনি মোহিত হয়ে পড়ি যে, কবি কালিদাসের একটা ছড়া আপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। তুমি তাই শুনেছ।—

দেবীর সে-ছবি আঁকা হ'য়ে গেছে? দেখি, দেখি—

বলতে বলতে রাধা ললিতের কাছে এগিয়ে গেল এবং ছবিখানা নেবার জন্ম হাত বাড়াল। ললিত ছবিখানা সরিয়ে নিয়ে বলল : রঙটা এখনো কাঁচা আছে, ওখান থেকেই দেখ, ভাল-মন্দ বুঝতে পারবে।

ছবিখানা রাধার সামনেই উঁচু করে দু'হাতে তুলে ধরল ললিত। ছবিখানা তার নাগালের বাইরে সরিয়ে নেওয়ায় রাধা যেটুকু ক্ষুব্ধ হয়েছিল, ছবিখানা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার উপর আহ্লাদে ফেটে পড়ার

মত হ'য়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল : ওমা, এ কি ! দেবীর বয়স এত বেড়ে গেছে—এত বড়টি এখন হয়েছে সে ? সত্যি কি চমৎকার ছবি তুমি এঁকেছ ললিতদা' ! যদিও তোমার মত আমিও তাকে তখন থেকে আর দেখিনি, কিন্তু ছোট বয়সের চেহারা যেটুকু মনে আছে, তাতে দেবীরই এখনকার ছবি ব'লে মনে হচ্ছে। সেই টানা-টানা চোখ, উঁচু নাক, হাসি-হাসি মুখ—হুবহু দেবী !

ললিত বলল : তাহলে তোমার ভাল লেগেছে ?

রাধা এবার ঝংকার দিয়ে বলল : ভাল না লাগলে এমন করে তারিফ করি ? সত্যি বলছি ললিতদা', ভালবাসার রঙ দিয়ে তার সঙ্গে প্রাণের দরদ মিশিয়ে তুমি দেবীর ছবি এঁকেছ। নিজেও বুঝেছ, ঠিক হয়েছে। এখন মানছি, সত্যিই তুমি দেবীকে ধ্যানে দেখতে পাও। ইচ্ছে করছে, ছবিখানা নিয়ে ছুটে তার কাছে যাই, সামনে দেখে মিলিয়ে নিই !

কথাটা বুঝি ললিতের উৎসাহ বাড়িয়ে দিল, তাই সেটা সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে বলল : এখন বোঝ ! আমি মিথ্যে বলবার ছেলে নই। বলেছি ত, দেবীর কথা ভাবলেই আমি তাকে স্পষ্ট দেখি—তবে সেই ছোট্ট মেয়েটি। ভাগ্যিস্ এখানে এসেছিলুম—তোমার সঙ্গে দেখা হলো, দেবী যে তোমার মত আমার মত বড় হয়েছে—এ কথা কিন্তু আমি ভাবিনি, তুমিই আমার ভুল ভেঙে দিলে। সত্যি বলছি রাধু, সামনে তুমি না থাকলে হয়ত দেবীর দেহের আদলটা ঠিক ধরতে পারতুম না, তুমি এর জন্যে আমাকে ঋণী করে রাখলে।

মুচকি হেসে রাধা বলল : তাহলে আমার ঋণটাও ত' শোধ করতে হবে ?

ললিত গম্ভীর হয়ে বলল : নিশ্চয়। দেবীর ছবি যখন হয়ে গেল, এবার তোমার ছবি ধরব। ছবি হয়ে গেলে তুমিও তখন তারিফ করবে।

রাধা মুখখানা ম্লান করে বলল : কিন্তু তোমার মতন ত' আর কবি কালিদাসের ছড়া এ পোড়া মুখ দিয়ে বেরুবে না। হ্যাঁ, ভাল কথা ললিতদা', ছড়াটি আমার ভারি মিষ্টি লেগেছে, এখন সেটি আর এক বার শুনিয়ে দাও, আর তার মানেটিও বাংলা করে বল—যেন মনে রাখতে পারি।

ললিত শকুন্তলার সেই ছত্র ক'টি আর এক বার আবৃত্তি করল। তারপর

বলল: এর মানে হোচ্ছে—রাজা দুষ্মন্ত তাঁর বয়স্যকে শকুন্তলার রূপের কথা বলতে গিয়ে ছবির কথা তোলেন। বলেন: তার অঙ্গ দেখে মনে হয়, বিধাতা বুঝি প্রথমে চিত্রপটে এঁকে তারপর সেই চিত্রকে প্রাণবন্ত করেছিলেন। কিম্বা এ কথাও মনে করা যায়—মনে মনে মনের মতন উপকরণগুলি সংগ্রহ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেমনটি প্রয়োজন, ঠিক সেই ভাবে তাঁর অবয়বটি মনে মনেই নির্মাণ করেছিলেন—হাত দিয়ে গড়লে অমনটি হোতে পারে না।

রাধা হাসিমুখে বলল: বা! কবির কবিতার সঙ্গে তোমার মনের কথাও দিব্যি মিলে গেছে। দেবীর দেখা যদি পাই কোন দিন—আমিই তাকে জলের মতন তোমার কেরামতি বুঝিয়ে দেব। যাক্, এর পর কি হবে শুনি?

ললিত বলল: তোমার ছবিখানা এবার শেষ করে ফেলব। তারপর তোমাকে প্রেজেন্ট করব। কিন্তু দেবীর ছবি এঁকে যে আনন্দ পেয়েছি, তোমার ছবিতে সেটা ত' পাব না—ভগবান যে বাদ সেধেছেন এখানে।

একটা নিশ্বাস ফেলে রাধা বলল: অদৃষ্টের ওপর ত' মানুষের হাত নেই ললিতদা'! তাই এক এক সময় ভাবি, মামা যদি নিজে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে আমার বিয়ে না দিতেন—আইবুড়ী হয়ে তাঁর সংসারে থাকতাম, কি মন্দ হোত! এক সময় পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ডাকাবুকো-মেয়ে বলে আমার নাম করত সবাই। কাউকে ভয়-ডর করতুম না, সব কাজে এগিয়ে যেতুম কোমরে আঁচলখানা জড়িয়ে, কিন্তু এখনকার অবস্থা যা হয়েছে—একেবারে আলাদা! সেই আমি—আর সব দিকে ঠিক আছি, শুধু সিঁথের সিঁদুরটুকু নেই—এতেই আমার আজ এই দুর্দশা। একখানা ধোপ-দুরস্ত ফরসা কাপড় যদি পরি, মুখখানা যদি একটু ঘষি-মাজি, অমনি সবার চোখ বড় হয়ে উঠবে, কেউ ভাল বলবে না, মুখের ওপর শুনিয়ে দেবে ছ্যার-ছ্যার করে—বিধবার এত শখ কেন বাপু, ঢং দেখে আর বাঁচিনে!

বলতে বলতে রাধার চোখ দু'টি ছল-ছল করতে লাগল, মুখখানা ম্লান হয়ে এল। ললিতও রীতিমত ব্যথা পেয়ে গাঢ় স্বরে বলল: তোমার

প্রত্যেক কথাটি তোমাদের মত ভাগ্যহারাদের ব্যর্থ জীবনের এক একটা বড় রকমের অধ্যায়। কিন্তু জান ত বোন, এর কোন উপায় নেই। একেই বলে অদৃষ্টের লেখা, সারাজীবন ধরে সইতেই হবে। তবে, তোমাদের ওপর বিধি-নিষেধের এই সব কড়াকড়ি আমি অত্যাচার বলে মনে করি। জীবনের একটা দিক তার ব্যর্থ হয়েছে, এক দিকে আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে, তাই ব'লে তাকে জীবন্মৃত করে রাখাও ত' ঠিক নয়! তাকে দিয়ে কাজ করাতে বাধে না, মানুষ থেকে ঠাকুরের সেবাতেও লাগিয়ে শান্তি পায়, অথচ তার ব্যর্থ জীবনের মধ্যে তার মনটাকেও সব দিক দিয়ে ব্যর্থ করে রাখতে চায়! সারাজীবন ধরে সে বেচারা আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকলেই পরিজনরা যেন স্বস্তি পান। সে হাসবে না, বাইরের কিছুতেই এগিয়ে যাবে না, শিল্প কিম্বা কলাবিদ্যার অনুশীলন করবে না—কেন, কেন এ সব ধরাকাট বিধি-নিষেধ? এ অন্যায়!

রাধা বলল: একদিন সবাই বুঝবে এ সব অন্যায়; বুঝবে, বিধবা হলেও যখন তাকে বাঁচতে হবে—মোটামুটি বিধি-নিষেধগুলো মেনেও এমন অনেক কিছু করতে পারে, যাতে সে কতকটা তৃপ্তি পায়, আর নিজের পছন্দমত সেই সব কাজ অবলম্বন করে ব্যর্থ জীবনটাকেও সার্থক করতে পারে। শুনেছি, এ রকম অবস্থায় আজ-কাল সহরের মেয়েদের জন্যে অনেক উপায় হয়েছে, যাঁদের বিদ্যা আছে ছেলে মেয়েদের পড়ান, গান জানলে তাই শেখান, শিল্প নিয়েও শান্তি পান অনেকে। কিন্তু আমাদের পাড়াগাঁয়ে রান্না আর কান্না ছাড়া আর কি আছে বল? কাজেই একঘেয়ে কাজ করে মনটাও মুষড়ে পড়ে।

কথাগুলি ললিতের ভাবপ্রবণ মনে গভীর ভাবে আবেগের সৃষ্টি করল। তার মনে হতে লাগল, রাধার ব্যথা বেদনা ও অভাব সে যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করছে। পাড়া ও বাড়ীর সকলে দিনের যে সময় সব কাজকর্ম সেরে নিশ্চিন্ত হোয়ে বিশ্রাম করে বা নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেয়, সেই সময়টুকুর সাহায্য নিয়েই রাধা তার কাছে আসে চোরের মত অতি সন্তর্পণে—পাছে ঘন ঘন যাতায়াতে কথাটা জানাজানি হয়, এই নিয়ে

অন্য কথা ওঠে, প্রতিবাসীরা কটাক্ষ করে। রাধা মুখে না বললেও ললিত তার অসহায় অবস্থার ব্যথাটা বুঝতে পারে, অথচ পল্লীসমাজের চির-প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধেও মাথা তোলবার কোন সামর্থই তার নেই!

সে-দিনের কথা-প্রসঙ্গে ললিত হঠাৎ বলল: দেখ রাধু, দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাজ হবে—সমাজকে সংস্কার করে তাকে ঢেলে সাজা। কতকগুলো বিষয়ে আমরা বড় পিছিয়ে আছি, বিশেষ মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে। আমাদের সমাজপতিরা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দেন, কিন্তু শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্বন্ধই নেই। আমি যদি সংস্কৃত না পড়তুম, তাহলে আমাকেও অন্ধকারে থেকে হাতড়াতে হত, কিম্বা ওঁরা যে সব বিধি-নিষেধ শোনান, সেগুলিই অন্ধের মত মানতে হোত। আমি শাস্ত্র থেকেই দেখাব—সে যুগে আমাদের দেশের মেয়েদের কি রকম প্রতিষ্ঠা ছিল, তাঁদের সম্বন্ধে শাস্ত্র উদার ভাবে কত বিশিষ্ট উপায় দেখিয়েছেন, যাতে তাঁরা মর্য্যাদার সঙ্গে নিজেরা প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। সেকালে স্বাধীন ভারতের মেয়েদের দৃষ্টান্ত তুলে আমি এমন অনেক নজির দেখাতে পারি, একালের মেয়েরাও ততখানি এগিয়ে যেতে পারেন নি। আমাদের সমাজে যে সব মেয়ে একটু বেশী প্রগতিসম্পন্না হন, আমরা আধুনিকা বলে তাঁদের ছোট করতে চাই। কিন্তু প্রাচীন কালের মেয়েদের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বিচার করতে পারি—প্রকৃত আধুনিকা কারা, এবং আধুনিকার সংজ্ঞা কত বড়!

রাধা বলল: দেশে এসে তুমি কি করবে, আর তার ফলে আমাদের মত অভাগীদের কি সুখ-সৌভাগ্য বাড়বে, তা বলতে পারি না; তবে তুমি যে আমাদের দুঃখ দূর করবার জন্য ভাব, আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট। সে যাই হোক, এখন আমারও উচিত তোমার নিজের ভালর জন্য কিছু করা। বইয়ে আমরা পড়েছি, আর চোখেও দেখিছি—ছেলেবেলার ভাব পিটুলীর দাগ, সময় হোলেই উঠে যায়। কিন্তু দেবীর সঙ্গে তোমার ভাবটি যাতে সার্থক হয়, সে চেষ্টা আমাদের সবার করা উচিত। তার কারণ, ভাল অনেকেই বাসে, কিন্তু তোমার ভালবাসার তুলনা খুঁজে পাই না; বাড়ি

গিয়ে সব সময় আমি তোমার কথা ভাবি, তোমার আঁকা ছবিগুলি আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। বারো বছর ধরে দেবীর জন্যে তুমি এই সাধনা করেছ, এ যেন একটা তপস্যা। কিন্তু দেবীর কথা আমরা এখন কেউ জানি না, মামাবাবুও গা করেন না। তাঁর কথা হোচ্ছে, দেবীর বাবা সেই যে বলেছিলেন—বারো বছর ওরা দু'জনে বিদ্যার সাধনা করবে, তার পর হবে বিয়ের কথা। উনি সেই কথার ওপর বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু সত্য বলছি ললিতদা', তুমি এখানে আসার পর—দেবীর সম্বন্ধে তোমার মনের ভাব সব জেনে, ভাবনায় আমি ঘুমাতে পারি না। কেবলই ভাবি, দেবীর বাবা যদি কথা না রাখেন, যদি তুমি দেবীকে—এর পরের কথা বলতেও মুখে বাধছে আমার। ভগবান করুন, তোমরা সুখী হও। কিন্তু তবুও বলি, এখানে এসেছ যখন—তুমিই জিদ করে নিজে একবার কলকাতায় যাও, বগলা মামার বাড়ী গিয়ে দেবীর মনের খবরটা নাও।

ললিত সাগ্রহে রাধার কথাগুলি শুনল, তাদের মিলনে রাধার আগ্রহ জেনে সে প্রফুল্লও হলো, কিন্তু তার প্রস্তাবটি সমর্থন করতে পারল না। ললিত বলল: এ ক'দিন তোমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বুঝেছি রাধা, তোমার পড়াশোনা আছে, তা ছাড়া শুনেও অনেক শিখেছ। তাহলে বলতে পারি, আধ্যাত্মিক কথাটাও তুমি বোঝ। যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পেয়েও কেউ কেউ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন, তাঁর প্রতিভা দেখে বিশ্বপণ্ডিতরাও অবাক হন। এর কারণ হোচ্ছে, সহজাত একটা দুর্লভ শক্তি তাঁকে চালনা করে, সেটি হোচ্ছে ধীশক্তি বা অসামান্য প্রতিভা। সেই শক্তিই সহায় হয়ে তাঁকে দেয় সিদ্ধি। এমনি ছেলেবেলা থেকেই আমার ভালবাসার সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির সংযোগ ঘটেছিল, হয় ত' হরগৌরীর মন্দিরে আমাদের দু'টিকে উপলক্ষ করে আমাদের মায়েরা পণবদ্ধা হয়েছিলেন বলেই ঐ শক্তির প্রভাব পড়েছিল আমার মনে। আমি এটা বুঝতে পারি বলেই, ছেলেবেলাকার সব কথা আমার মনের পাতায় আগাগোড়া দাগ কেটে রেখেছে! তাই, আমার এ

ভালবাসা কখনো ব্যর্থ হোতে পারে না। একটা আধ্যাত্মিক শক্তি এখানে কাজ করছে, আমাকে চালাচ্ছে; সেই শক্তিই সহায় হোয়ে আমার তুলি দিয়ে দেবীর চিত্র এঁকেছে। আমার এ সাধনা ত ভণ্ডামী নয় রাধা, যে ব্যর্থ হবে! আমার বিশ্বাস যে, দেবীও ঠিক এই ভাবে আমার জন্য সাধনা করছে তাই আমি বলতে চাইছি, যে আধ্যাত্মিক শক্তি আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, আমি তাকেই নির্ভর করে প্রতীক্ষা করব; আমার বিশ্বাস—ঠিক সময় হোলেই আমাদের সংযোগ হবে।

রাধার মনে হলো, দেবীর কথা ভেবে ভেবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তার চিত্রাঙ্কনে লিপ্ত থেকে, ললিতদা' সাধারণ বৈষয়িকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। যে উদ্দেশ্যে সে কথাটা তুলেছিল, ললিতকে সে সম্বন্ধে উদাসীন দেখে সে স্থির করল—ললিত এখানে থাকতে থাকতে নিজেই মামাবাবুকে ধরে দেবীর বাবার সঙ্গে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা করবে; এমন কি, যদি সম্ভব হয়, ললিতকে কলকাতায় পাঠিয়ে ব্যাপারটিকে আরও সহজ করে তুলবে। এরপর, নিজের ছবিখানির সম্বন্ধে ললিতকে তাগিদ দিয়ে সে বাইরের ঘরে মামাবাবুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

১৭

বাড়ির বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে তখন বৈকালী আসর বসবার উপক্রম হয়েছে। পশুপতি হালদার পাঁজি খুলে বসেছেন। পল্লীর কতিপয় বিধবা একাদশীর সঠিক দিনটি জানতে এসেছেন। তাঁদের মৌখিক গণনায় যে দিনটি একাদশী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল, এখন কথা উঠেছে দশমীর কিছুটা সংযোগ থাকায় পরদিনে হবে একাদশীর উপবাস। পল্লীঅঞ্চলে আচারপরায়ণা শুচিস্মতী বিধবা মহলে একাদশী সম্পর্কে এ-হেন সমস্যাটির গুরুত্ব বড় কম নয়। এবং এরূপ সমস্যার উদ্ভব হলে

শাস্ত্রবিদ্ পশুপতি হালদারকে শ্লোক পড়ে তার অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে পাঁজির ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে হয়। হালদার মশায়ের উপর স্থানীয় প্রত্যেকেরই প্রচুর শ্রদ্ধা, দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও অনেকে প্রয়োজন সূত্রে ব্যবস্থাদি নিতে আসেন। বহুপূর্বে হরগৌরী-মন্দিরে একদা হালদার মশায়ের পুত্র এবং বগলা সমদ্দারের কন্যাকে উপলক্ষ করে যে কৌতুককর ব্যাপারটি সংঘটিত হয়, সে-কথা সে সময় মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় প্রৌঢ়া ও প্রবীণাদের প্রবল স্মৃতিশক্তি, এখনও ঘটনাটি অবলুপ্ত হতে দেয়নি। হরগৌরীপুরের চণ্ডীমণ্ডপে হালদার মশায়ের সংস্রবে এলেই তাঁরা সেই স্মরণীয় নীলের উৎসব-দিনের প্রসঙ্গটি তুলে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন—মন্দিরের সেই হরগৌরী মিলনটি কবে বাস্তবরূপ ধরে তাঁদের দীর্ঘকালের প্রত্যাশাকে সার্থক করবে? যাঁরা উভয় পক্ষের পত্রালাপ সূত্রে পাত্র-পাত্রীর পড়াশোনার কথা জ্ঞাত আছেন, ললিতের প্রত্যাগমনের পর তার পরিপুষ্ট অপরূপ দেহসৌষ্ঠব দেখে সোল্লাসে হালদার মশাইকে বলেন—কাশী থেকে ছেলে ত আপনার মহাদেব হয়েই এসেছে; এমন চেহারা হাজারে একটা মেলে কি না সন্দেহ। শুনিছি, বিদ্যেয়ও জাহাজের মতন। কনেও ত' আমাদেব দেখা—অ্যাদ্দিনে সে-ও গৌবীর মত হয়েছে, এখন ঘটা করে হরগৌরী মিলন করে দিন—দশখানা গাঁয়েব লোক যেন জানতে পারে।

এদিনও একাদশী-সমস্যার সমাধানের পর বহু-প্রত্যাশিত হরগৌরী মিলন সম্পর্কেই কথা ওঠে। সেদিনের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা্ গ্রামের সার্বজনীন পিতু পিসি একটু গম্ভীর ভাবেই বললেন: গাঁয়েব পাঁচ-জনেব পেয়োজনে পাঁজি পুঁথি দেখে দেখে ত বুড়িয়ে গেলেন হালদার মশাই, এখন নিজের তরে পাঁজি খুলে দিনটা দেখেন দিকি—কবে হরগৌরী মিলন করে বাড়িখানাকে কৈলাসপুরী করবেন। হর ত' হাজীর হয়েছে, এখন গৌরীকে আনিয়ে ফেলুন দেখি। লোকের মুখে যে আর থাবা দিয়ে পারিনে দাদা!

ইদানীং ললিতের আসার পর প্রায় প্রতিদিনই হালদার মশাইকে এই শ্রেণীর প্রশ্ন ও অনুরোধের সম্মুখীন হতে হয়। একই নির্দিষ্ট উত্তর শুনে এরা এখন শান্ত হতে চায় না; ছেলে যখন এসেছে, মেয়ের বাপের কি এমন

মোক যে, এগিয়ে আসতে চান না? তাঁরাও ত পর নয় গো—এই গাঁয়েরই লোক ত! শান্ত প্রকৃতি হালদার মশাইকে বিব্রত হতে হয়। তিনি জানেন, পিতু পিসি বড় সোজা মানুষ নন—লোকের আপদ বিপদে যেমন ছুটে এসে বুক দিয়ে পড়েন, কাজকর্মে কোমরে আঁচলখানা জড়িয়ে পুরুষের কাজের দোষ ত্রুটি শুধরে দেন, তেমনিই কোথাও কোন রকম গলদ হলে আর রক্ষা নেই—ছ্যার ছ্যার করে উচিত কথা শুনিয়ে দেবেন। এ জন্য তিনি কারও পরোয়া করেন না, কাউকে তাঁর ভয়-ডর নেই।

পাঁজিখানা বন্ধ করে হালদার মশাই বললেন: কথা যখন হয়ে আছে, কাজটাও হবে বৈ কি। ললিতের আর একটা পরীক্ষা দিতে বাকি; ওটা হয়ে গেলেই—

কথাটা শেষ করবার আগেই পিতু পিসি অধৈর্য ভাবে বললেন: এদিকে যে মেয়ে-মেয়ে বেলা বেড়ে যাচ্ছে, সে খোঁজও ত রাখতে হয়! আপনি হচ্ছেন ছেলের বাপ, ও পক্ষের ত গরজ বেশী হবার কথা, তার ত কোন সাড়া-শব্দই নেই। মানলুম, যেন বড়মানুষ হয়েছেন, কিন্তু এই গেরামেরই ত মানুষ—একবারে চুপচাপ বসে আছেন কেনে? সেই যে গেলেন, একটি দিনের তরেও গাঁয়ের মুখো হলেন না—ছ্যা, ছ্যা!

হালদার মশাই বিপন্নের মত কথাটা চাপা দিতে চান। তাঁর ইচ্ছা নয় যে, এ সব কথা ছেলের কানে ওঠে। গলায় একটু জোর দিয়ে বললেন: তারই বা দোষ কি, সে-ও আগে থেকেই বলে রেখেছে—বারোটা বছর ওরা পড়াশোনা করুক, একটু বড় সড় হোক, তার পর—

পিতু পিসিও তেতে উঠে বললেন: বড় সড় হতে কি আর বাকি আছে গা, নিজের ছেলের পানে চেয়ে দেখছো না? আর, লেকা-পড়া ত ছেলেরই করবার কথা! সমদ্দারের মেয়েও কি এই বারো বছর ধরে লেকা-পড়া করছে?

হালদার মশাই বললেন: সেটা আর আশ্চর্য কি? আজকাল সহরে মেয়েরাও ছেলেদের মতন সমান ভাবে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে যে পিসি; সে কাল আর নেই। তা যাই হোক, বগলার কথা মতই আমি চুপ করে আছি, আর ক'টা দিনই বা—আসছে রথের দিন বারো বছর ঠিক পূর্ণ হবে।

ঐ সময় একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। তোমরা যখন সে দিনের ব্যাপারটি মনে করে রেখেছ, আমরাও ভুলিনি, কথা মত কাজটা হবে বৈ কি! তবে এটাও মানতে হবে পিসি—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, ঠিক সময়টি এলেই হবে।

: যা ভাল বোঝ কর বাপু—আমাদের কি বল না? তবে ঠাকুর দেবতার সামনে কথা, আমরা শুনিছি, তাই বলি। অসৈরণ সইতে পারিনে যে!

কথাগুলি বলতে বলতে পিতু পিসি চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নেমে গেলেন। এমনি সময় রাধা আস্তে আস্তে পশুপতির পাশে এসে দাঁড়াল এবং একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল: পিসি কি বলছিলেন মামাবাবু?

সত্য ঘোষালের সম্পর্কে পড়শী সুবাদে রাধা পশুপতিকেও মামা বলে ডাকে। পশুপতিও এই ভাগ্যহীনা শান্তশিষ্টা মেয়েটিকে পরম স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি জানেন, তাঁর ছেলের মন গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ, আর পল্লী-অঞ্চলের ব্রাহ্মণের ঘরে আচারপরায়ণা বিধবাচিত্তে কোনরূপ চাঞ্চল্য বা আসক্তি আসতেই পারে না। এই সূত্রেই ললিতের সঙ্গে রাধার অবাধ মেলামেশায় তাঁর মনে সন্দেহের এতটুকু দাগও পড়েনি। রাধার প্রশ্ন শুনে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে পশুপতি বললেন: সেই যে একটা কথা আছে—যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর চোখে ঘুম নেই! এ-ও হয়েছে তাই মা! ললিত আর দেবীকে নিয়ে বছর বার আগে হরগৌরী-মন্দিরে যে সব কথা হয়েছিল, যাঁরা জানেন—তাঁরা সেই ব্যাপারটা নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছেন। প্রায়ই এসে জিজ্ঞাসা করেন, ওদের বিয়েটা কবে হোচ্ছে, কেন বিলম্ব করছি, ঠাকুর দেবতার সামনে যে সব কথা হয়েছে—নড়চড় ত হোতে পারে না। পিতু পিসি পাঁজি দেখাতে এসে শেষ কালে বলেই ফেললেন—পাঁজি খুলে বিয়ের দিনটা দেখিছি কি না! তুমিই বল ত মা, পুরানো কথা নিয়ে এ ভাবে হৈ-হুল্লোড় করা কি ভাল?

রাধাও যে একই প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁকে তাড়া দিতে এসেছে, হালদার মশাইও সেটি বুঝতে পারেন নি—তাহলে রাধাকেই এ ভাবে প্রশ্ন করে বসতেন না। কিন্তু রাধাও প্রস্তুত হয়ে এসেছিল; সে দেবীর সম্বন্ধে ললিতের মনোভাব ভাল

ভাবেই জেনেছে। এখন মামাবাবু যাতে অবিলম্বে এদের মধ্যে মিলন-গ্রন্থি বেঁধে দিতে উদ্যোগী হন, সে সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করাই ছিল তার অভিপ্রায়। কিন্তু পশুপতির কথায় এ ব্যাপারে তাঁর অনাসক্তির ঈষৎ আভাস পেয়ে রাধা মনে মনে কি ভেবে একটু থেমে হঠাৎ মামাবাবুকেই প্রতি প্রশ্ন করল: কিন্তু সেই পুরানো কথা ললিতদা'র সারা মনটির ওপর কি ভাবে শিকড় গেড়ে শক্ত হয়ে উঠেছে, সে খবর কি আপনি জানেন মামাবাবু?

রাধা যে এখানে এসেই এ ভাবে তাঁকে ললিতের সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, হালদার মশাই সেটা কল্পনাও করেননি। গম্ভীর ভাবে বললেন: কি রকম! হঠাৎ একথা বলবার মানে কি মা?

রাধা বেশ শক্ত হয়েই বলল: দেখুন মামাবাবু, আপনি পণ্ডিত লোক—অনেক বই পড়েছেন, অনেক পুরানো কথা শুনেছেন; ছেলেবেলায় পাড়ার ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঠাট্টার ছলে বিয়ের কথা হয়; তখন শুনতে বেশ ভাল লাগে, লোকে তাই নিয়ে রঙ্গ করে; আবার কালে সব ভুলে যায়। অনেকে ভাবে, ও-সব হোচ্ছে জলের আল্পনা—স্থায়ী হয় না। কিন্তু মামাবাবু, এদের মধ্যে এমন ছেলে-মেয়ে থাকে, সেই বয়সেই যাদের মনের দাগ কিছুতেই মুছে যায় না, বিধাতা পুরুষও তাদের মনগুলো এমন ভাবে গড়ে থাকেন, তার ওপর যে দাগ পড়ে—কিছুতেই ওঠে না, মোছে না, মনের সঙ্গে মিশে শিকড় গাড়তে থাকে। তাহলে বলি মামাবাবু, আমাদের ললিতদা' হচ্ছেন সেই ছেলে। ছেলেবেলায় দেবীকে যেমন ভালবাসতেন, দেবী চলে গেলে হেদিয়েছিলেন, তারপর কাশী গিয়ে পড়াশোনার মাঝে একই ভাবে দেবীর ধ্যান করেছেন, উনি কারও কাছে কোন দিন ছবি আঁকতে শেখেন নি, কিন্তু দেবীর ওপর ভালবাসার ভাব থেকে যে সব ছবি এঁকেছেন, আমি আপনাকে চুপি চুপি দেখাব মামাবাবু, আপনি তাহলে অবাক হয়ে শুধু ভাববেন—কেমন করে এটা হলো! কিন্তু সত্যিই হয়েছে মামাবাবু! ললিতদা' তাঁর পড়ার মধ্যে, ভাবনার মধ্যে, এমন কি ঘুমের মধ্যেও দেবীকে দেখেন। অথচ, বাইরের কেউ এ কথা জানে না, দেবীকেও জানাবার আগ্রহ নেই তাঁর। তিনি সংস্কৃত বই থেকে শ্লোক পড়ে কি বলেন জানেন—আমার এই ভালবাসাই

আমার সাধনাকে সিদ্ধি দেবে—একদিন দেবী আমার কাছে আসবে, আমি তাকে পাবই।

কথাগুলি বলতে বলতে রাধার চোখ দু'টি ছলছলিয়ে ওঠে, গলার স্বর ভারী হতে থাকে। নির্নিমেষ নয়নে পশুপতি হালদার রাধার মুখের পানে চেয়ে থাকেন।

এর পর রাধা এক সময় ললিতের আঁকা ছবিগুলি দেখিয়ে দিল পশুপতিকে। এর পরেই তার যৌবনোন্মুখী অপরূপ ছবি। তার নীচে মুক্তার মতো গোটা গোটা অক্ষরে মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন শ্লোক লিখে নিজের মনের অবস্থার সঙ্গে তুলনা-মূলক আলোচনা করেছে।

একখানা ছবির নীচে লেখা শ্লোকটি পশুপতি ভাবার্দ্র স্বরে আবৃত্তিই করে ফেললেন :

তুজঝণ আণে হিঅঅং মহ উণ কামো দিবা বি রত্তিং বি।

ণিগঘিণ তবই বলীঅং তুই বুত্তমণোরহাই অঙ্গাই।

রাধা সাগ্রহে বলল : ললিতদা' আরো মিষ্টি করে পড়েন, আমাকে মানে বুঝিয়ে দেন। এ শ্লোকটির মানে কি মামাবাবু?

পশুপতি পণ্ডিত ব্যক্তি; হাইস্কুলের ছেলেদের নিয়ে তাঁর শিক্ষার ব্যাপার চলে। এ সব শ্লোক সেখানে অপ্রচলিত। সুতরাং শ্লোকটির অর্থ তাঁকে মনে মনে হিসাব করে বলতে হলো। শ্লোক যখন আবৃত্তি করেছেন, অর্থ তাঁকে বুঝিয়ে দিতেই হবে। বললেন : তোমার মনে আমার কথা জাগছে কি না জানি না, কিন্তু আমার সারা অঙ্গ তোমার ধ্যানে মগ্ন, চোখ চায় তোমাকে দেখতে, হাত চায় তোমাকে স্পর্শ করতে, কান চায় তোমার মিষ্টি কথা শুনতে, আর মুখ চায় তোমার সম্বন্ধে আলাপ করতে—শেষের বাক্য দুটির অর্থ এরপর বলা চলে না, তাই এখানেই থেমে বললেন : সত্যিই, মনের ভাব বোঝাবার জন্যে ঠিক মত শ্লোকটি এখানে লেখায় ওর বাহাদুরী আছে বটে!

রাধা সহর্ষে বলল : এখন আমার কথা মিলিয়ে নিন মামাবাবু! আমিও ললিতদা'র সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলছিলাম। তাহলে বুঝুন, যদি দেবীর সঙ্গে ললিতদা'র বিয়ে না হয়, তাহলে উনি—

কথাটা শেষ না করে রাধা এমন ভাবে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মামাবাবুর দিকে তাকাল, যেন তার কথাটা ঐ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতেই শেষ হয়ে গেছে!

পশুপতিও রাধার মুখের উপর তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন: কেন মা, তুমিই ত একটু আগে বলেছিলে—ললিত নাকি তার এই অনুরাগকে সাধনা ভেবে নিশ্চিন্ত। তাহলে ত—তার এইভাবে সাধনাই তাকে সিদ্ধি দেবে।

কথাটা শুনেই রাধা চমকে উঠল, একটু আগে এই কথাই সে মামাবাবুকে বলেছিল বটে। কিন্তু সে-ও ছাড়বার পাত্রী নয়, মুখখানায় একটু হাসি ফুটিয়ে সে বলল: এ কথার পর আর কথা চলে না সত্যি। কিন্তু তবুও বলব মামাবাবু, ভগবানই সব করেন, এ কথা আমরা মানি। কিন্তু তবুও উপোস করে, পুজো-পাঠ ব্রতকর্ম করে তাঁকে ব্যস্ত করতে ভুলি না। এ-ও তাই। ছেলের অবস্থা ত দেখলেন, এখন চুপ করে থাকা ঠিক নয়। আমি বলি কি মামাবাবু, ললিতদা' যখন এসে গেছেন—ওঁকেই একবার কলকাতায় দেবীদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন না কেন?

পলকে পশুপতির মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল, সেই গম্ভীর মুখ থেকে স্বরটি বিকৃত হয়ে বেরুল: তাহলে ললিতেরও এই ইচ্ছা বল? আঁকা ছবিগুলো তাকে দেখিয়ে—

কথায় বাধা দিয়ে রাধা তাড়াতাড়ি বলল: না, না, মামাবাবু, কোন দিনই ওঁর মুখ থেকে ও-ধরণের কথা শুনিনি; জোর করে আমি বলছি—দেবীর ছবি আর তার নাম ছাড়া কারও কথা তিনি তোলেন না, জানতেও চান না।

পশুপতি বললেন: আমি জানি না, এ সম্বন্ধে আমার প্রতি ললিতের কি ধারণা। তবে সে যদি নিজে দেবীকে যাচাই করবার জন্যে কলকাতায় যেতে চায়, আমি বাধা দেব না। কিন্তু একদিন হরগৌরী-মন্দিরে ললিতের মায়ের সঙ্গে দেবীর মা যখন ওদের মিলন সম্বন্ধে বাগ-বদ্ধা হয়েছিলেন, দেবীর বাবা ও আমি সে কথার সমর্থন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আছি। এ অবস্থায় কি উচিত, ললিতই স্থির করুক। তার ইচ্ছার উপর আমি হাত দেব না, কথাটা তুমিও তাকে জানাতে পার।

এই সময় আরও কতিপয় প্রতিবাসীকে সোৎসাহে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসতে দেখা গেল। প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা দেবার উদ্দেশ্যে রাধা তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করল।

১৮

দিনের বেশীর ভাগটাই ললিত ছবির কাজে মশগুল হয়ে থাকে। নিত্যই চলে নতুনের সাধনা। ছেলেবেলার এক একটি ঘটনাকে তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সুস্পষ্ট করে তারই পটভূমিকায় দেবীকে ফুটিয়ে তোলে। সন্ধ্যার পর তাকে প্রতিবাসীদের সাগ্রহ আহ্বানে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসতে হয়। কাশীর কথা শেষ হলেও ললিতের নিষ্কৃতি নেই—সংস্কৃত সাহিত্যের গল্পগুলি তাকে শোনাতে হয়। সে সব গল্প শোনবার জন্য শুধু বয়স্করা কেন, বালক-বালিকারা পর্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে ভীড় জমায়। তাই দেখে সত্য ঘোষাল প্রায়ই বলেন—দেখ কাণ্ড, কাজের সময় ডাকাকাকি করেও যাদের টিকি পর্যন্ত দেখা যায় না, এখন গল্পের লালসে সাঁঝের আগেই চণ্ডীমণ্ডপ গুলজার করে বসেছে। ওদিকে ক্ষেত-খামারের কাজ সেরে চাষী ভায়াদের ঘরকে যাবারও সবুর সইত না!

কৃতবিদ্য পুত্রের প্রতি গ্রামবাসী সর্বসাধারণের অনুরাগ দেখে হালদার মশাইও মনে মনে পুলকিত হন। কিন্তু ললিতের মন পড়ে থাকে সদ্যোঅঙ্কিত ছবিখানির দিকে। প্রতিদিনের আঁকা ছবিখানি সমাপ্ত না করে তার যে স্বস্তি নেই! তবে দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করবার আগে সন্ধ্যা আসে নেমে, সেই সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত জনতার আকুল আহ্বান তার ধ্যান ভেঙে দেয়। রাধাই সেটা উপলব্ধি করে। সে জানে, ছবি আঁকবার সময় ললিত-দা'র বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তার সমস্ত মনটি একমুখী হয়ে দেবীকে ধ্যান করে।

ধ্যানের মূর্তিই রঙ-তুলি দিয়ে কাগজের উপর তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এখানে বাধা এলেই তার সমাধি ভেঙে যায়—তখন আর আঁকার কাজ চলে না। যত দূর সম্ভব, তাড়াতাড়ি বাড়ীর কাজকর্ম সেরে এবং জিজ্ঞাসার পথ বন্ধ করে রাধা এ বাড়ীতে এসে ললিতের সাধনার পথটি সতর্ক প্রহরিণীর মত আগলে থাকে। মধ্যাহ্নকালে স্নানাহারের সময় প্রায়ই সতর্ক করে দেয়—'সন্ধ্যের আগেই ছবি তোমার শেষ করে ফেলো ললিতদা', তারপর ভুলচুক শোধরাবার কাজ বরং চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ফিরে এসে ধীরে-সুস্থে ক'র।'

গাঢ় স্বরে ললিত বলে—'তোমার জন্যেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আঁকবার সময় পাই, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারে না। তুমি যেন সমস্ত মন দিয়ে আমাকে আগলে থাক।'

মৃদু হেসে রাধা বলে—'সাধ করে কি আগলে থাকি মশাই, পাওনাগণ্ডা যে আমাকেও বুঝে নিতে হয়। দেখে দেখে কত শিখি, আমারও যেন ঐ একটা ভাবনার ব্যাপার হয়ে পড়েছে! ইচ্ছা করে, তোমার শিষ্যা হই—তোমার কাছে বসে আঁকতে শিখি। কিন্তু তুমি যে একমুখী রুদ্রাক্ষ হয়ে আছ—দেবী ছাড়া আর কিছুই জান না!'

ললিত তার পটের উপর তুলির আঁচড় দিয়ে বলে—'কেন, তোমার ছবিও ত এঁকে দিয়েছি?'

'দিয়েছ দায়ে পড়ে, কিন্তু এক সময় ভাল করে দেখলেই বুঝবে, দেবীর মুখের আদল তাতে এসে পড়েছে। সেই জন্যেই ত তোমাকে আর ঘাঁটাতে চাই না। ভাবি, তোমারও দোষ নেই, তুমি করছ সাধনা—সেখানে বাধা হই কেন?

এই ভাবে উভয়ের মধ্যে সংলাপ চলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ললিতের কথা আর শোনা যায় না। রাধা বুঝতে পারে, ছবির মধ্যেই সে তন্ময় হয়ে পড়েছে। তখন আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে আসে। এই কথাটাই তখন সহজ ভাবে তার বোধগম্য হয় যে, দেবী সত্যই ভাগ্যবতী। তবে দুঃখ এই, সত্যকার প্রেমিকের এত বড় সাধনা সে জানতে পারল না।

সেদিন অপরাহ্ণের দিকে আকাশের বিক্ষিপ্ত মেঘগুলো দেখতে দেখতে গায়ে গায়ে মিশে অস্তগামী সূর্যকে আবৃত করতেই রীতিমত এক দুর্যোগ ঘনিয়ে এল—সেই সঙ্গে মৃদু বর্ষণ। বাদলের পাগল হাওয়ায় জলকণাগুলি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শিল্পীর মনও নেচে উঠল, এমনি নিসর্গের অক্ষয়-চিত্রপটে ভারতের মহাকবির আঁকা প্রকৃতির সময়োপযোগী রূপটি ফুটে উঠে আকুল করে তুলল তাকে। তুলি রেখে সুরু করল রূপের বন্দনা—

নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ
কুসুমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্।
জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ
পরিহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি॥
বহুগুণরমণীয়ঃ কামিনীচিত্তহারী
তরুবিটপীলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ।
জলদসময় এবঃ প্রাণীনাং প্রাণভূতো
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥

বাহিরে নববর্ষার ধারার মধুর ধ্বনির সঙ্গে ভিতরে ভাবুক শিল্পীকণ্ঠের সুরঝঙ্কার মিলিত হয়ে স্থানটিকে তখন মুখর করে তুলেছে। রাধাও এই সময় দালানে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ায়। ছবি আঁকতে আঁকতে সময় বিশেষে শিল্পী মনের আনন্দে সংস্কৃত মহাকাব্যের এমন কোন শ্লোক তার উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে, বাইরে থেকে তার অপূর্ব ঝঙ্কার শুনলে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকের মনেও ধারণা জাগে, কেউ বুঝি উচ্চাঙ্গের কোন গানের আলাপ করছে। রাধা প্রায়ই উন্মুখ হয়ে থাকে—কখন সেই বাঞ্ছিত ঝঙ্কারে তার কানের দু'টি পটহ কেঁপে ওঠে। কিন্তু শিল্পীই তাকে জানিয়েছে, মনে প্রেরণার সঞ্চার না হলে এটা সম্ভব নয়, সুতরাং অনুরোধ এখানে নিষ্ফল।

এ দিন অপরাহ্ণের দিকে আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমাগমে সেই বহু-বাঞ্ছিত সুযোগটি আসতেই আনন্দে উদ্দীপনায় বিহ্বল হয়ে রাধা দরজার আড়ালে দালানে নিষ্প্রাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে সেই সুরসুধা উপভোগ করতে

লাগল। এর অনেক আগে রাধা বাড়ীতে পূজাপাঠে কত সংস্কৃত স্তোত্র শুনেছে, কিছু কিছু কণ্ঠস্থও করেছে—ঠাকুরঘরে বসে ভক্তির আবেগে ব'লে যায়। কিন্তু শব্দঝঙ্কারের এমন সুধাস্রাবী রসের সন্ধানত পায়নি কোন দিনই! ললিতের আঁকা ছবি তাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে, কিন্তু তার কণ্ঠের এই আবৃত্তি তাকে বিহ্বল করে তোলে। এ সম্পর্কে কথা উঠলে সে ললিতকে বলে—'তুমি বল শ্লোক পড়ছ, কিন্তু আমার মনে হয়, অদ্ভুত এক গান শুনছি!'

তাই এ দিনও ভিতর থেকে ললিতের কণ্ঠ নিস্তব্ধ হতেই রাধাও আত্মস্থা হয়ে দরজাটি ঠেলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল। ললিত গম্ভীর ভাবে বলল: শ্লোক শুনেই হাজির হয়েছ দেখছি!

রাধা বলল: জান না বুঝি, চাতক পাখীর মত আমিও চেয়ে থাকি—কতক্ষণে বর্ষণ হয়। যতক্ষণ তাতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি, শুধু পাই আনন্দ। শেষ হলে তখন জানতে ইচ্ছা করে।

ললিত বলল: সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্যও এখানে। তার ওপর কবির সৃষ্টির গুণে অমৃত ঝরে, অর্থ বোধগম্য না হলেও মন আনন্দে ভরে ওঠে। আজ প্রথম বর্ষার বর্ষণে আমার মনেও মহাকবির 'ঋতু-সংহার' ঝঙ্কার দেয়। ঐ শ্লোক দুটোর অর্থ হচ্ছে—বর্ষার নতুন জলকণাগুলি বাতাসে মিশে প্রিয়া-বিরহের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। গাছের ফুল আর লতাগুলিও যেন বিরহ-বেদনায় শিউরে উঠছে। তোমাকে আর বেশী কি বলব প্রিয়ে, ফুল-লতার বন্ধু প্রাণীদের প্রাণতুল্য নারীদের হৃদয়জ্ঞান বিকারশূন্য এই জলদ-কালটি তোমার কামনা বাসনা সব সফল করুক, এই প্রার্থনাই করছি।

হঠাৎ রাধা বলে উঠল: আমি সংস্কৃত শিখব ললিতদা', তুমি আমাকে পড়াবে?

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রাধার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে ললিত বলল: তাহলে একটা টোল খুলতে হয়। তোমার মত আরও দু'-চারটি উৎসাহী ছাত্রী যদি পাই, তখন কোন দিক দিয়েই আপত্তি হবে না—বুঝেছ আমার কথা?

একটা নিশ্বাস ফেলে রাধা বলল: বুঝিছি। আচ্ছা, দেবীপর্ব আগে

শেষ হোক, তখন ছাত্রী যোগাড় করা যাবে। হ্যাঁ, তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি শোন। তুমি কি ভেবেছ, ঘরে বসে এই ভাবে দেবীকে ভাবলে, তার ছবি আঁকলে, তারই টানে সে এগিয়ে আসবে?

এ দিনের ছবিটির প্রসাধনের সঙ্গেই ললিত জিজ্ঞাসা করল: হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

রাধা বলল: সেই কবে দেবীর বাবা চিঠি দিয়েছিলেন,—তারপর ও পক্ষের আর কোন খবরই নেই। তাঁর শেষ কথা—ওরা এখন পড়াশোনা করুক। বারো বছরের মাথায় না কি মুখ খোলা হবে। মামাবাবুও ত সেই থেকে মুখ বুজিয়ে আছেন। আমি সেদিন তাঁর কাছে কথাটা পেড়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ললিতদা' যখন এসেছেন, একবার কলকাতায় ঘুরে আসুন না—ওঁর পরীক্ষাও ত প্রায় শেষ হয়ে এলো।

ললিতের মুখের পানে চেয়ে এখানে রাধা একটু থামল। কিন্তু দেখল, ললিত কিছু না বলে তার মুখের পানেই চেয়ে আছে—সে দৃষ্টিতে কৌতূহলের কোন চিহ্নই নেই। সুতরাং তাকেই পুনরায় বলতে হলো: তুমি কি মামাবাবুর মনের কথা জান? কিছু বললে না ত? দেবীকে দেখবার জন্য কলকাতায় যেতে তোমার মনে আগ্রহ হচ্ছে না?

শান্ত কণ্ঠে ললিত জবাব দিল: না। বাবা যা বলেছেন তাই হবে। তারপর, আমার একটা পরীক্ষা এখনো বাকী; বারো বছব এখনো পূর্ণ হয়নি। এর মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর দেবীকে দেখবার কথা বলছ? সে ত সর্বক্ষণই দেখছি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ললিতের মুখে নিবদ্ধ করে রাধা বলল: তুমি সত্যই অদ্ভুত! ভাব-জগতে দিন-রাত থেকে তুমি সংসারটার পানে তাকাতে ভুলে গেছ। শোন, মামাবাবু বলেছেন, তুমি যদি কলকাতায় যেতে চাও, তিনি কোন রকম আপত্তি করবেন না। আমার মনে হয়—

ললিত এবার একটু শক্ত হয়েই বলল: আমার কিন্তু মনে হয়, যাঁরা সংসারে পূজনীয়—তাঁদের কথার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চলা উচিত। আমার বাবা এবং দেবীর বাবা—দু'জনের ওপরেই আমি শ্রদ্ধাশীল; তা' ছাড়া

দেবীর প্রতিও আমি যথেষ্ট আস্থা রাখি। আমার এই সাধনা—চিত্তের সাধনা, এতে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।

এর পর রাধাকে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করে অন্য কথা তুলতে হল। শুধু এই কৌতূহলই তাকে আশ্বস্ত করল যে, এই বয়সেই দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছে, শুনেছে, উপলব্ধি করেছে। বেশ ত, ললিতদা'র আজকের কথাটাও তার মনে গেঁথে থাকুক, পরে মিলিয়ে নেবে। তখন হবে এর বোঝা-পড়া।

ঝাঁ করে এই সময় ছবিখানাকে লক্ষ্য করে রাধা জিজ্ঞাসা করল: আজকের আঁকা ছবি ত দেখা হলো না, কি আঁকলে?

ললিত বলল: ছেলেবেলাকার একটি স্মরণীয় দিনের ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ে যায়—সেই যে চড়িভাতি করতে জঙ্গলে গিয়েছিলে তোমরা? দেবী শেষে দল-ছাড়া হয়ে তার সাথীর হাতেই পড়ে! তারপর হরগৌরীর মন্দিরে এসে সাথী ঠাকুরের প্রসাদী-মালা তার গলায় পরিয়ে দেয়! সেইটিই আজ এঁকেছি, এই দেখ।

রাধা দেখল, হরগৌরীর মন্দিরে গৌরীপীঠের কাছেই দেবী দাঁড়িয়ে আছে, তার গলায় দুলছে এক ছড়া ফুলের মালা; মুখখানা হাসিতে ঝলমল করছে।

রাধা বলল: সত্যি, কি সুন্দর! কিন্তু এ কি করেছ, শুধুই দেবীকে দেখছি যে, তোমাকেও—

স্নিগ্ধ স্বরে ললিত বলল: আমার কোন ছবি কি দেখেছ? দেবীকেই সেই থেকে ভেবে এসেছি, তাকেই এঁকেছি। আমার কথা যদি বল—ওরই মধ্যে আমি আছি। আমার নিজের আলাদা কোন সত্তা নেই রাধা, দেবী প্রতিষ্ঠা কি সোজা কথা!

স্তব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে রাধা শুধু তাকিয়ে রইল, মুখ দিয়ে তার কোন কথা নির্গত হলো না।

১৯

আশৈশব অনুরক্ত কন্যাটির সম্পর্কে পুত্রের স্থির সিদ্ধান্ত এবং অভি-ভাবকের প্রতি তার সশ্রদ্ধ উক্তি রাধার মুখেই শুনলেন পশুপতি। ফলে, তিনি ত অভিভূত হলেনই, উপরন্ত এ যুগের শিক্ষিত পুত্রের পিতারূপে তিনি নিজেকে ধন্য ভেবে উল্লাসিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাধাকে বললেন: ললিত এ ক্ষেত্রে নিজেকে সংযত রেখে, আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে আরো তৎপর করে দিল। আমিও দিন গণনা করছি, সময় হলেই কলকাতায় নিজে যাব, সেখান থেকেই কথাটা পাকা করে আসব।

ললিতও রাধার কাছে বাবার অভিপ্রায়টি জেনে পুলকিত হয়ে বলল: তুমি কলকাতায় যাবার জন্য আমাকে কত বার বলেছ; আমি জানতাম—তাতে বাবাকে ছোট করা হবে। এখন বাবার কথা শুনলে ত? পূর্বরাগ নিয়ে এমন ঘটনা ত অনেক হয়, কিন্তু পাত্র-পাত্রী যেখানেই ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে যায়, সেখানেই এমন মধুর ব্যাপারটি বিশ্রী হয়ে অশান্তির সৃষ্টি করে। শিক্ষার দোষেই এ রকম প্রবৃত্তি হয়—অন্ধ ভাবে ওদেশের রীতি-নীতি এরা অনুকরণ ক'রে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি আস্থা রাখে না, তাই এমন হয়। কিন্তু আমি যে গোড়া থেকেই আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী।

ললিতের কথায় কৌতূহলী হয়ে রাধা জিজ্ঞাসা করল: তাহলে তোমার এই বিশ্বাস কি বলে?

কথা প্রসঙ্গে ললিতের হাত চলছিল দেবীর কোন ছবির প্রসাধনের কাজে। সেই অবস্থায় উত্তর দিল: চলতি কথা মনে নেই—'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূরে?'

রাধা তথাপি বলল: কিন্তু এমনও হতে পারে ত, তুমি ঐ বিশ্বাস নিয়ে বসে আছ, কিন্তু দেবীর বাবা যদি তাঁর কথা না রাখেন? তিনি এখন বড় লোক হয়েছেন, কলকাতায় জেঁকে বসেছেন, যদি পাড়াগাঁয়ে মেয়েকে পাঠাতে না চান?

কর্মলিপ্ত অবস্থাতেই ললিত বলল: আকর্ষণ কথাটার মানে যোগজ শক্তি থেকেই এই আকর্ষণ আসে। আমি বেশ বুঝতে পারি, আধ্যাত্মিক কোন শক্তি আমার অন্তর থেকে প্রেরণা যোগায়। সে শক্তির আকর্ষণ অসাধ্য সাধন করে। রামচন্দ্রের অজ্ঞাতে তাঁর আশ্রম থেকে সীতা অপহৃতা হবার পর এই শক্তিই তাঁর অন্তরে থেকে আশ্বাস দিয়েছিল—সীতাকে তিনি নির্মল অবস্থায় ফিরে পাবেন। আমি এই আধ্যাত্মিক শক্তিকে বিশ্বাস করি, রাধা!

তথাপি রাধার মনে সন্দেহ থেকে যায়; সে পুনরায় প্রশ্ন করল: কিন্তু ভবিতব্য বলে একটা কথা আছে ত? আগে থেকেই যদি ভবিতব্য স্থির করে রাখে—

রাধার বক্তব্য যেন বুঝতে পেরেই বাকিটুকু তাকে বলবার অবসর না দিয়েই ললিত বলল: তাহলেও ভবিতব্যের ব্যবস্থা বদলে যাবে—ঐ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে। সাবিত্রীর উপাখ্যান জান ত? ভবিতব্যের বিধানে সত্যবানের মৃত্যুযোগ ছিল, কিন্তু সাবিত্রী তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে সে বিধান উলটে দিয়েছিলেন। আমি এখানে আমার বিশ্বাসের কথা বলছি রাধা, তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে বলি না, আর—ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন ও-সব অপ্রিয় আলোচনা না করাই ভাল।

এর পর রাধার মুখ বন্ধ হয়ে যায়, আলোচনা করবার মত কথা আর খুঁজে পায় না; ললিত যেন জোর করেই দেবী-প্রসঙ্গটা বন্ধ করে দিল।

এদিকে ললিতেরও কলেজের ছুটি ফুরিয়ে এল এবং একদিন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সে পুনরায় কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ল। যাবার সময় রাধার সঙ্গে তার দেখা হলে রাধা চুপি চুপি ললিতকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তুমি যদি বল ললিত দা, তাহলে তোমার এ ভাবে সাধনার কথা দেবীকে লিখি। লিখব কি?'

ললিত কিন্তু তার প্রস্তাবে এই বলে আপত্তি তুলেছিল—'তোমার এত বড় বিপত্তির কথাও কোন দিন যখন বান্ধবী ভেবে দেবীকে জানাও নি,

এ সম্বন্ধ নিয়ে এত দিন পরে তার সঙ্গে আলাপ করবার কোন সার্থকতাই নেই। দেখই না—কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!'

এ কথার পর রাধাকে নিরস্ত থাকতে হয়। ললিতের স্পষ্ট কথা তার মনে ধরল। সত্যই ত' আজ দেবীকে চিঠি লিখবার মুখ তার কোথায়? মনে মনে ললিতকে সে শ্রদ্ধা জানাল।

পুত্রকে বিদায় দিবার সময় পশুপতি তাকে বলেছিলেন—'বগলার কথা আমি ভুলিনি; ঠিক সময়েই আমি তার কাছে গিয়ে সেটা স্মরণ করিয়ে দেব। তবে আমার মনে হচ্ছে—তার আগেই বগলার কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসবে। যাই হোক, তুমি সবই জানতে পারবে, ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই।'

কথার পীঠেই শেষের কথাটা বলে পশুপতি বোধ হয় প্রবাসযাত্রী পুত্রকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বল্পভাষী পুত্রের নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মুখখানি ভাল করে দেখলেই তিনি বুঝতে পারতেন যে, এভাবে তাকে আশ্বাস দিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কলকাতায় তার বাবার ইচ্ছা এবং বগলাপদর আমন্ত্রণ আসার সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে কথা তিনি বলেছিলেন, সেইটুকুই যথেষ্ট ছিল।

দেবীর বর্ত্তমান বয়স ও আকৃতি রাধার আকৃতির আদর্শে পরিকল্পনা করে ইদানীং যে ছবিগুলি ললিতের তুলিতে রূপায়িত হয়েছিল, সেগুলির অধিকাংশই ললিত কাশীতে নিয়ে যায়। রাধার একান্ত পীড়াপীড়িতে দেবীর বালিকা বয়সের বেশীর ভাগ ছবিই এখানে তারই কাছে গচ্ছিত রাখে—এই সর্ত্তে যে, প্রয়োজন হলে চিঠিতে জানালেই সে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবে।

ললিত এখানে যতদিন ছিল, রাধা তার দৈনন্দিন জীবনের দীর্ঘ সময় কাটাবার আনন্দময় একটা উপলক্ষ পেয়েছিল। এখন আবার নিঃসঙ্গ জীবনের নিরাশ পরিবেশ গভীর অন্ধকারের মত ঘনিয়ে এল। রাধা স্থির করে, ললিতের মত সেও এই রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকার সাধনা শুরু করলে কিছুটা শান্তি পাবার ও সময় কাটাবার প্রয়াস পাবে। সে শুনেছিল

ললিতের কাছে, প্রবল ভাবাবেগেই ললিত ছবি আঁকতে ঝুঁকেছিল, পরে তাতেই সিদ্ধি পায়। অবিশ্যি, মাঝখানে এক সহৃদয় চিত্রকরের সহায়তাও পেয়েছিল। ললিতের কাছে বসে তার সিদ্ধ হাতে রেখা টানা, অঙ্কনের প্রাথমিক কাজ, আরও কতকগুলি কৌশল যত্ন করেই সে দেখত, তার পর জিজ্ঞাসা করে অনেক কিছু জেনে নিত। ললিত তখন পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করেছিল—ব্যাপার কি, তুমিও ছবি আঁকা শিখবে নাকি?

রাধা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল—'ইচ্ছা ত করে, ব্যর্থ জীবনে তবু একটা অবলম্বন পাব। সত্যিই আমাকে সাহায্য করবে ললিতদা, শেখাবে?'

ললিত কথাটা শুনে মনে মনে ব্যথাও পায়। সত্যিই ত, রাধার মত ভাগ্যহারা নারীদের জীবনে বৈচিত্র্য বলেত কিছু থাকে না। গৃহকর্মেই তাদের জীবন কাটে, তার মধ্যে যার কিছু শিক্ষার আগ্রহ থাকে, সাধারণ সূচি কাজ বা গল্পের বই পড়ে অবসরটুকু কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ছবি আঁকার কাজ এখানে যে কত বড় সান্ত্বনা ও আনন্দের জিনিস, ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝবে কে? এ অবস্থায় রাধাকে সে কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারে! নিজেত ভাবের ঘরে ধর্ণা দিয়ে একাজে ঝুঁকেছিল—হাতুড়ে বদ্যির মত; সেও ঐ শ্রেণীর চিত্রকর। শুধু ভাবের জোরেই সে এ কাজটাকে শিক্ষার অঙ্গ করে নিয়েছে। কিন্তু নিজেকে সে কিছুতেই ত গুরু বলে ভাবতে পারবে না, যে রাধাকে শিখাবে, সে হবে তার শিষ্যা!

রাধাকে অকপটেই এসব কথা বলে ললিত। কিন্তু রাধা দমবার বা হঠবার মত মেয়ে নয়। সেও বলে—দেখ ললিতদা, শুনিছি—তাই বা বলি কেন, নিজের চোখে দেখিছি ত—কানার হাত ধরে কানা চলেছে, তারা কিন্তু ঠিক এগিয়ে যায়। ভাবব, এও তাই।

ললিত তখন বলতে বাধ্য হয়—এইভাবে যখন আমি শিখিছি, তুমিও চেষ্টা করে দেখতে পার। তবে আরো আগে যদি তোমার মাথায় এটা সেঁধুত—তাহলে আমি থাকতে থাকতে হয় ত তোমার অনেক সুবিধা হত—ঐ যা বললে, কানার হাত ধরে আর এক কানার পথ চলার মত।

বেশ, আগেকার ছবিগুলো ত থাকছে তোমার কাছে, ঐগুলো দেখেই হাত মক্স করতে থাক।

রাধা তখন খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। ললিতকে তার প্রস্তাবে সম্মত হতে দেখে খোস মেজাজে হঠাৎ বলেছিল—পেতাম যদি দেবীকে, তোমার সাধনা দেখে তাকেও সাধিকা করে নিতাম। দুই কানা মিলে এমন কাণ্ড বাধাতাম, তুমিও একদিন চমকে উঠতে।

কথাটা কিন্তু ললিতের মনে দোলা একটু দিয়েছিল বৈ কি! সত্যিই দেবী এখানে থাকলে, আর—এই ছবির কাণ্ড দেখলে, কখনই সে তফাতে থাকতে পারত না, রাধার চেয়েও বেশী আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসত।

ললিত চলে যাবার পর এবাড়িতে এসেই রাধা ছবিগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে আঁকার শক্ত কাগজ ও রঙ তুলি নিয়ে বসে। যাবার আগেই ললিত পুরানো ছবিগুলির সঙ্গে ছবি আঁকবার সরঞ্জামগুলি বেশী পরিমাণেই রাধাকে দিয়ে গিয়েছিল—যাতে তাকে কোন অসুবিধায় না পড়তে হয়।

ললিতও কাশীতে ফিরে গিয়ে নতুন উৎসাহে যেন দেবীকে আদর্শ করে ছবির পর ছবি আঁকতে থাকে, তেমনি প্রতিটি ছবির নীচে প্রাচীন কবিদের রচিত বিরহিনী নায়িকাদের মনের কথাগুলিও বেছে বেছে বিচার করে লেখে এবং লেখার পর পাঠ করে নিজেই অভিভূত হয়ে পড়ে। অবশ্য ওদিকে পরীক্ষার পড়ার ব্যাপারেও তার মনোযোগের কোনরূপ অভাব ঘটে না।

কাশীতে এসে ললিত শুনল যে, সম্প্রতি এক ভদ্রলোক তার সন্ধান করতে বিদ্যাপীঠে এসেছিলেন। ছেলেরা তাঁকে দেশের ঠিকানায় খবর নিতে বলে দেয়। তিনি ঠিকানা নিয়ে চলে যান। কিন্তু ছেলেগুলি যে ললিতের ভাবপ্রবণ চিত্তের কৌতুককর ঘটনাগুলি বেশ একটু রসান দিয়ে সেই ভদ্রলোককে শুনিয়ে দিয়ে আপ্যায়িত করেছিল, সে সম্বন্ধে কোন কথাই ললিতকে জানানো প্রয়োজন মনে করেনি। এর পর পিতাকে চিঠি দেবার সময়, সে খুব সংক্ষেপেই জানায় যে, তার দেশের বাড়িতে থাকার সময় এক ভদ্রলোক তার খোঁজ নিতে কাশীতে এসেছিলেন। সহপাঠিরা তাঁকে দেশের

ঠিকানা দিয়েছে। তিনি কি ওখানে কোন চিঠি দিয়েছেন? বলা বাহুল্য, তথাকথিত কোন পত্র পশুপতির হস্তগত হয় নাই, সেই কথাই তিনি পুত্রকে জানিয়ে দেন তাঁর পত্রের মাধ্যমে।

ব্যাপারটা কিন্তু কল্পিত নয়। বগলার নির্দেশমত তাঁর কোন বন্ধু একদিন হঠাৎ বিদ্যাপীঠের ছাত্রাবাসে এসে ছেলেদের কাছে ললিতের প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন করায় ছাত্রগণ কৌতূহলী হয়ে, ছাত্রজীবনে একটি খুকির ছবি নিয়ে তার ঢলাঢলির কথাটা তাঁকে বলে আনন্দ উপভোগ করে। এর পর সেই ভদ্রলোক কলকাতায় ফিরে এসে ছাত্রদের কাছে শোনা কথাগুলি হুবহু বগলাপদকে শুনিয়ে দেয়। ছবির কথা অনেক আগেই বগলা পশুপতির কাছেও শুনেছিলেন, সে ছবি তাঁর কন্যা দেবীর। এখনও ললিত ছবির মোহ ভুলে নাই! এমন সব কাণ্ড করে চলেছে এখনো দেবীর ছবি নিয়ে, হোস্টেলের ছেলেরাও যে ব্যাপারটাকে অশোভন ভেবে তার কুৎসা রটাতে কুণ্ঠিত নয়! অমনি তাঁর সমস্ত চিত্ত তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সময়মত এই কথাগুলো শিব্দ অস্ত্রের মত ঐ একান্ত অবাঞ্ছিত ললিত ছেলেটির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করে রাখেন।

২০

ইতিমধ্যে কলকাতায় বগলাপদর দুই মুরুব্বী অরবিন্দ রায় ও নিত্যানন্দ চৌধুরী অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে পরপারের যাত্রী হলে উভয় ক্ষেত্রেই তরুণ পরিচালকরূপে প্রশান্ত তাঁর সহযোগী ও সহকর্মীর স্থান দখল করে বসে। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরেই অরবিন্দ বাবু পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী অবস্থায় চিরমুক্তির প্রতীক্ষা করছিলেন। একদিন আকস্মিক ভাবে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। নিত্যানন্দ বাবুও ইদানীং অসুস্থ অবস্থায় শান্তির আশায়

আত্মীয় ও বন্ধুপুত্র প্রশান্তের উপর তাঁর বিরাট প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার দিয়েও অবসর জীবনটাকে দীর্ঘ করতে পারেননি। বন্ধু বিয়োগের পর তৃতীয় মাসেই তাঁরও উপর হঠাৎ পরলোকে পাড়ী দিবার পরোয়ানা আসে। অজিতের আসন্ন পরীক্ষায় ক্ষতি হতে পারে, এই আশঙ্কায় এত বড় দুঃসংবাদটি তাকে জানানো হয়নি। অবিবাহিতা কন্যা অরুণাই পিতার পারলৌকিক কাজ করে। এই মেয়েটির আন্তরিক ইচ্ছা—শান্তিনিকেতনে থেকে সেখানকার সাংস্কৃতিক শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু বৃদ্ধ পিতাই তার ইচ্ছার পথে বিঘ্নস্বরূপ ছিলেন। পিতৃবিয়োগে এদিক দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয় এবং এক মাসের মধ্যেই সব দিকের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে শান্তিনিকেতনে চলে যায়। রাণীকেও সঙ্গে নেবার জন্য অরুণা অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বগলাপদ তাতে এই বলে আপত্তি করেছিলেন—ওখানে গিয়ে এখন রাণীর শেখবার বিশেষ কিছু নেই, তবে অরুণা যদি দাদার মত বিলেতে যেতেন, তাহলে রাণী নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে যেত—ইত্যাদি।

এত বড় বড় দুটো দুর্ঘটনায় বাহিরের সংশ্লিষ্ট মহল বিশেষ ভাবে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হলেও প্রশান্তকে কিন্তু শোকার্ত বা বিচলিত হতে দেখা যায় নি। এক দিকে মামার সমস্ত সম্পত্তির সে একাই উত্তরাধিকারী, অন্য দিকে নিত্যানন্দ বাবুর প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ কর্মশালার সেই এখন সর্বময় কর্তা। নিত্যানন্দ বাবু ও তাঁর কন্যা অরুণা বিদ্যমানে যেটুকু সঙ্কোচ প্রশান্তর মধ্যে ছিল, তা-ও এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিলাতে ও শান্তিনিকেতনে প্রতি মাসে দু'দফায় নির্দিষ্ট অংকের টাকা পাঠানো ভিন্ন আর কোন দিকে বাধ্যবাধকতা তার রইল না—অজিত বিলেত থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত। অরবিন্দ বাবুর প্রবল ইচ্ছা ছিল, সঞ্চিত অর্থে হাত না দিয়ে প্রশান্ত স্বাধীন ভাবে ইমারৎ-তৈরির কারবারটি জাঁকিয়ে তোলে—স্বোপার্জিত অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই প্রশান্তর উপর নিজের প্রতিষ্ঠানটির ভার চাপিয়ে নিত্যানন্দ বাবু তার নিজের উপার্জনের পথটিও বন্ধ করে দেন। প্রশান্ত অবশ্য ব্যবস্থাটিকে তার ভাগ্যোদয়ের অরুণিমা ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে; যেহেতু নিজস্ব ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার মত মেধা ও উৎসাহের অভাবই সে

অনুভব করে। এদিকে বগলাও অভিভাবকহীন এই বিত্তবান ছেলেটির সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে নানা ভাবে তাকে তোয়াজ করতে থাকেন।

প্রথম দর্শনেই প্রশান্ত দেবীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এই সুন্দরী সুদর্শনা ও স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির সলজ্জ ভাবভঙ্গি ও সংযতাচার তাকে অভিভূত করে। কিশোর বয়স থেকেই মেয়েদের সম্বন্ধে প্রশান্তকে খুবই উৎসাহী এবং সপ্রতিভ দেখা যেত। গায়ে পড়ে অপরিচিতা মেয়েদের সঙ্গে মিলে-মিশে ভাব জমাতে তার ক্ষমতাও বিস্ময়াবহ। বিলেতের পরিবেশে এই দুর্বলতা নানা ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে। কিন্তু টাকার জোরে এই শ্রেণীর দুর্নীতির প্রবাহ সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হতে থাকায়, বেশী দূর আর গড়াবার অবসর পেত না। চাতুরীতেও সে পরিপক্ক। পাঠদ্দশায় মামার কাছ থেকে শিক্ষার অজুহাতে দফায় দফায় প্রচুর টাকা আদায় করে নিজের বাহাদুরীর জন্ম গর্ববোধ করত। তথাপি বিলাতে তার অবস্থা এমনই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল যে, সেখানকার পাট তুলে দেশে ফেরবার জন্ম মামার প্রস্তাবটি তার পক্ষে তখন শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। মামার কাছ থেকে বিলাতের দেনা-পত্র মিটিয়ে বাসা তোলবার জন্ম যথেষ্ট টাকা হস্তগত করলেও, দাবীদারদের ব্যাপারে হাত তার উপুড় হয় নি—এমন অখ্যাতিও শোনা যায়।

কলকাতায় এসেই স্বনামখ্যাত 'বোগলা' সাহেবের রূপসী কন্যা দেবীর সম্পর্ক তাকে বেশ প্রলুব্ধ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়ের অবকাশ ঘটায় সে উপলব্ধি করে যে, এ পর্যন্ত যে সব মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, দেবী মেয়েটি তাদের তুলনায় এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম! এমন মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাওয়া সত্যই ভাগ্যের কথা। এ অবস্থায় নিজের ব্যক্তিত্ব এবং স্বভাবসিদ্ধ চটুল বাক্-পটুতায় দেবীর অন্তর জয় করবার আশায় ঘন ঘন বোগলা-ভবনে যাতায়াত তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনা চক্রে এই সময় পর পর দু'টি দুর্ঘটনা এবং প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন পরিবেশের জন্ম প্রশান্তর উদ্দেশ্যটি বিলম্বিত হলেও, তার বর্তমান জীবনযাত্রার অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের যোগটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কাজ-কর্ম সব চুকে গেলে বোগলা-ভবনে সন্ধ্যার দিকে প্রশান্তর আবির্ভাব

আরম্ভ হয়। স্বয়ং বগলাপদ উদ্‌গ্রীব হয়ে তার প্রতীক্ষায় থাকেন এই সময়। গৃহিণী ও দুই কন্যাকে, এই বলে তিনি সতর্ক করে দেন: প্রশান্ত এলে যেন তার খাতির যত্নের কোনরূপ ত্রুটি না হয়—দেবীও যেন তার লজ্জা ও আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে মেলামেশা করে।

স্বামীর এ ধরণের কথা গৃহিণী সুলোচনা দেবীর ভাল না লাগায় তিনি প্রতিবাদ করেন। তাতে বগলা বলেন: যখন প্রশান্তর সঙ্গে দেবীর বিয়ে দেওয়া ঠিক করে ফেলেছি, মেলামেশায় কোন দোষ নেই। সহরে আজকাল এ-সব চালু হয়ে গেছে। জানো, প্রশান্তর আজ কত দর? মামার সব কিছু ত পেয়েছেই, তার উপর অরবিন্দ বাবুর হোল প্রপার্টির ও ডিরেক্টর। প্রশান্তর বাড়িতেই আমার অফিস; মনে করলেই তুলে দিতে পারে। যে ভাড়ায় অত বড় বাড়িতে আফিস চালাচ্ছি, পাঁচগুণ ভাড়া বেশি দিলেও অমন বাড়ি পাব না। আর দেবী ত রাণী হবে ওর হাতে পড়লে।

সুলোচনা দেবী গুম হয়ে স্বামীর কথা শোনেন, আপত্তি তুলে আর অশান্তি বাড়াতে চান না। প্রশান্তর সঙ্গে দেবীর বিয়ে হবে শুনলেই, অতীতের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়; হরগৌরী মন্দিরের সেই বিচিত্র দৃশ্য—তারপর ললিত ও দেবীর বাল্যলীলার প্রতিদিনের ঘটনা পর পর বায়স্কোপের ছবির মত তাঁর চোখের উপর যেন ফুটে ওঠে; সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মন ব্যথায় ভরে যায়।

এখন আর দেবীর বিবাহ নিয়ে তিনি স্বামীর সঙ্গে তর্ক বা কথা-কাটাকাটি করেন না, মুখখানা ম্লান করে নীরবেই শুনে যান। তার পর, এক সময় ঠাকুরঘরে গিয়ে হরগৌরীর সুবৃহৎ ছবির সামনে বসে ব্যাকুল কণ্ঠে অন্তরের আবেদন জানান: তোমাদের সামনে দুটি অবোধ শিশুকে নিয়ে খেলার ছলে সেদিন যে কাণ্ড হয়েছিল, আমি যে আজও তার সাক্ষী হয়ে আছি। এখন এ নিয়ে বাড়াবাড়ি যদি করি, লোকে পাগল বলবে; কিন্তু আমরা যে দুই সই এক হয়ে কথা দিয়েছিলুম! এক জনকে কাছে টেনে নিয়েছ; কিন্তু এ জন যে সাক্ষী হয়ে রয়েছে। সবই জানছ—এখন তোমরাই ভরসা। স্বামীকে আমি কিছু বলব না, তাঁর বিরুদ্ধে যাব না; তোমরা তাঁকে সুবুদ্ধি দাও, আমার মুখ রক্ষা কর।

সুলোচনা দেবী স্বামীর প্রকৃতি ভাল ভাবে জানেন। জানেন যে, প্রশান্তকে তিনি প্রথম দিনেই আশ্বাস দিয়েছেন। এখন সে বিত্তবান—প্রচুর সম্পত্তি তার হাতে। তাই তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন; প্রশান্তও দেবীকে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ছেলেটির বাহ্যিক সৌন্দর্যও সুলোচনা দেবীকে প্রসন্ন করতে পারেনি। প্রশান্তর চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভঙ্গি তাঁর ভাল লাগেনি। বিত্ত ও রূপ থাকলেই সুপাত্র হয় না—তার অন্তরের সৌন্দর্য যদি মানুষের মনকে মুগ্ধ না করে! কিন্তু সেই অন্তর্দৃষ্টি কি সকলেরই থাকে? তাই, বগলাপদ প্রশান্তকে সর্বাংশে দেবীর যোগ্য সাব্যস্ত করলেও, সুলোচনা দেবী তাকে অবাঞ্ছিত জেনেই দেবীর মুখ চেয়ে দেবতার দ্বারে প্রার্থনা জানিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, শুদ্ধ-চিত্তের সঙ্গত প্রার্থনা ব্যর্থ হতে পারে না।

এক এক বার তাঁর মনে দুঃখ হয়, দেশ থেকে ও-পক্ষও ত কোন তাগিদ দেন না! কিন্তু তাঁর সই বেঁচে থাকলে এভাবে কি চুপ করে থাকতে পারতেন পশুপতি বাবু? আবার মনে পড়ে যায়, ওঁদের ত দোষ নেই। তাঁর স্বামীই যে ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার ধুয়া ধরে ও-পক্ষকে নীরব থাকতে বাধ্য করেছেন! হাজার হোক, তিনি যেখানে ছেলের বাবা, এ ব্যাপারে তাঁর ত এগিয়ে আসবার কথা নয়, তবু তিনিই ওদিকে বার বার তাগিদ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামীই সেটা বন্ধ করে দেন। কৃতবিদ্য না হওয়া পর্যন্ত ছেলে মেয়ে উভয়েই শুধু পড়া শোনাই করবে, তার পরে বিয়ের কথা হবে, স্বামী এই ভাবে এক পত্র দিয়েছিলেন ললিতের বাবাকে তাঁর বেশ মনে পড়ে। কিন্তু সে-ও ত অনেক দিন হয়ে গেল। তার পর তিনি কি আর কোন পত্র দেননি? কে জানে! দিলেও তাঁর স্বামীর পক্ষে চেপে রাখা আশ্চর্য নয়। এখন যদি ললিতের বাবা সেই চিঠির কথা তুলে জানতে চান, উনি তাহলে কি করবেন? কোন্ মুখে উনি বলবেন—দেবীর বিয়ে ওখানে দেবেন না, এখানেই পাত্র স্থির করা হয়েছে!

এই সব চিন্তা করতে করতে সুলোচনা দেবী অস্থির হয়ে ওঠেন। মীমাংসার দিক দিয়ে কোন কূলকিনারা না পেয়ে শেষে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেবতার

চরণে আত্মসমর্পণ করেন—দেবতার কৃপায় যদি এই জটিল সমস্যাটির কোন সমাধান হয়।

প্রশান্তর একান্ত ইচ্ছা, এ-বাড়িতে এসে দেবীর সঙ্গে অবাধে মেলা মেশা করে, রাণীর মত দেবীও অসঙ্কোচে গানের আলাপ করে তাকে আনন্দ দেয়, তার পর দুজনে মোটরে খানিকটা পাড়ী দিয়ে আসে। কিন্তু দেবীর সমর্থন না পাওয়ায় তার প্রত্যেক ইচ্ছাটিই ব্যর্থ হয়ে জিদ আরো যেন বাড়িয়ে দেয়। অথচ, আলাপ-আলোচনার মধ্যেই, এমন কায়দায় দেবী হঠাৎ পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে রাণীকে এগিয়ে দেয় যে, প্রশান্ত বাধাও দিতে পারে না। আবার তাকে নতুন কোন সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হয়।

সেদিন এমনি একটা সুযোগ তার বরাতে ঘটে গেল। কি ভেবে প্রশান্ত একটু বেলা থাকতেই বোগলা-ভবনের ভিতরে গাড়িবারাণ্ডার নীচে মোটর থামিয়ে নামল। গাড়ি-বারাণ্ডা থেকে অলিন্দে উঠে বেহারাকে জিজ্ঞাসা করে জানল যে, রাণী এখনো কলেজ থেকে ফেরেনি, দেবী দু'টোর আগেই বাড়ি এসেছে। এই তথ্যটুকুই প্রশান্তকে প্রচুর আনন্দ দিল। প্রফুল্ল মুখে শীষ দিতে দিতে সে উপরে উঠে গিয়ে ভিতরে খবর দিল।

সুলোচনা দেবী তখন দালানে বসে দেবীর চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন। হাতের কাজ তাঁর শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বিলাসী নাম্নী পরিচারিকা ব্যস্ত ভাবে এসে জানাল: ও-বাড়ীর দাদাবাবু এসেছেন মা, বড় দিদিমণিকে তিনি ডাকছেন।

সুলোচনা দেবীর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। বুঝলেন, কর্তার কাছে আস্কারা পেয়ে প্রশান্ত এ-বাড়িতে এসেই দেবীকে ডেকে পাঠাতে ভরসা পেয়েছে! দেবীও কথাটা শুনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে মায়ের বিলম্ব হল না। তিনি বুঝেছেন, রাণী বাড়িতে না থাকায় দেবী সমস্যায় পড়েছে। সে জানে, রাণী বা আর কেউ কাছে না থাকলে একা প্রশান্তর কাছে যাওয়া মা পছন্দ করেন না। আজ রাণী নেই, অথচ অসময়ে প্রশান্ত এসেছে এবং এসেই তাকে ডাকছে। রাণী বাড়িতে থাকলে কোন কথা ছিল না, নাচতে নাচতে এখনি সে বাইরে ছুটত, মা

তাকে কিছু বলতেন না। দেবীর এ সব ভাল লাগে না। কিন্তু এর পর বাবা বাড়ি এসে যদি শোনেন—রাণী বাড়ি নেই বলে, সে-ও প্রশান্তর কাছে যায়নি, তখন তাকে বকুনি ত খেতে হবেই,—মা-ও রেহাই পাবেন না। এখন মা কি করবেন?

বুদ্ধিমতী মেয়ের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি থেকেই মা তার মনের কথাগুলি বুঝতে পেরে সস্নেহে বললেন: কাপড়খানা তাড়াতাড়ি বদলে বাইরের ঘরে যাও গে।

মা যে আজ এ কথা বলবেন, দেবী কল্পনাও করেনি। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: একলা যাব মা?

মা একটু শক্ত হয়েই বললেন: হ্যাঁ। বাইরের ঘরে আর কেউ নেই। প্রশান্ত একলা বসে আছে। আগে থেকেই তোমরা দু'বোন ওর সঙ্গে মিশেছ বলেই তোমাকে ডাকতে সাহস পেয়েছে! কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত—সে শিক্ষা ত তুমি পেয়েছ মা। তবে ভয় পাচ্ছ কেন একলা যেতে? বলেছি ত, আমাদের মধ্যেই ভগবতী আছেন—আমরা যদি ঠিক থাকি, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখি, অন্যায় না করি—কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মনে রেখো মা—এ-ও এক মস্ত পরীক্ষা। এখন থেকে তুমি নিজেই বিচার করে—নিজের ক্ষমতার দিকে চেয়ে কাজ করবে—লোকের সামনে জুজুবুড়ি হয়ে থাকাও ঠিক নয়, তাতে বুদ্ধি খোলে না, মনের আড়ষ্টতা কাটে না।

মায়ের কথাগুলি শুনতে শুনতে দেবীর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল—মনের মধ্যে সে যেন এক অপূর্ব তৃপ্তি পেল; সেই তৃপ্তিই তার দেহ ও মনকে রীতিমত শক্ত করে তুলছে, এটা সে বুঝতে পারল। তখনি তাড়াতাড়িই উঠে পড়ল দেবী। যে বয়সে ছেলেমেয়েরা হৈ-হল্লোড় ভালবাসে, বাড়িতে আড্ডা জমলে বাড়ির কুমারী কন্যারাও অসঙ্কোচে যোগ দিয়ে আসর গুলজার করে, সেই বয়সেই দেবীকে কিন্তু রীতিমত গম্ভীর, আত্মসচেতন ও নির্লিপ্ত দেখা যায়। ওদিকে, দেবীর এই স্থির শান্ত ও গম্ভীর মূর্তির মধ্যে কি অপরূপ সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছে প্রশান্ত, নিজেই সে উপলব্ধি করতে পারে

না; তাই সারা দিন সে অস্থির ভাবে প্রতীক্ষা করে—কতক্ষণে দিনের দীপ্তি নিবে যাবে, সন্ধ্যার মুখে বোগলা-ভবনে দেবীদর্শনের সুযোগ ঘটবে।

ড্রয়িং-রুমে মুখে পাইপ লাগিয়ে প্রশান্ত ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি দেখছিল। এ বাড়ির পরিজনদের ব্রোমাইড গ্রুপ ফটোখানার দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছবিতে কর্তা ও গৃহিণী পাশাপাশি উপবিষ্ট, তাঁদের দক্ষিণে দেবী, বামে রাণী। রাণীর ঠিক পিছনে অজিত এবং দেবীর পিছনে অরুণা দাঁড়িয়ে আছে। দেবীর ছবির দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মনে মনে সে ভাবল—হায় রে! ফটোখানা তোলবার সময় যদি থাকতাম, দেবীর পিছনে আমিও একটা পোজ নিয়ে দাঁড়াতাম—অজিত যেমন রাণীর পিছনে তার জায়গা করে নিয়েছে!

—নমস্কার!

পিছন থেকে নারীকণ্ঠের মিষ্ট স্বরে প্রশান্তর চিন্তা ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে মুখখানা ফিরিয়ে দেখল—কমনীয় করপল্লব দুটি যুক্ত করে কপাল ঠেকিয়ে দেবী দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তার স্নিগ্ধ হাসির রেখাটি ফুটি ফুটি করছে।

প্রশান্তকেও এ অবস্থায় মুখের পাইপটা সামলে হাত দু'খানা যুক্ত করে কপালের কাছে ঠেকিয়ে প্রতি-নমস্কার করতে হল। এর পরই ঈষৎ কৌতুক-ভঙ্গিতে বলল: আর একটু হলেই হাতখানা বাড়াচ্ছিলাম—আপনার হাত-খানা ধরবার জন্যে; অমনি ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল—আপনি সেকহ্যাণ্ড পছন্দ করেন না, তখন আবার আপনাকে ফলো করলাম। একেই বলে—অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত জোরে হেসে উঠল; দেবীও হেসে ফেলল। প্রশান্তর মনে হল, তার অদৃষ্টাকাশে বিনা মেঘে আজ বিদ্যুতের স্নিগ্ধ ঝলক খেলে গেল। তাই মনের আনন্দে বলে ফেলল: আজ দেখছি খুব শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলাম।

কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে শান্ত কণ্ঠে দেবী শুধাল: কেন?

প্রশান্ত পরিপূর্ণ দৃষ্টি দেবীর মুখে নিবদ্ধ করে উত্তর দিল: কথাটার মানে বুঝতে পারেন নি ত? আচ্ছা, আরো কতদিন এখানে এসেছি, বাড়ির

আর সকলের সঙ্গে আপনাকেও দেখিছি, কথাও শুনিছি, কিন্তু বলুন ত— আর কোন দিন এমন করে হেসেছিলেন কি? শুভক্ষণে বেরিয়েছিলাম বলেই-না এই দুর্লভ বস্তুটি দেখতে পেলাম।

এমন চটুল ভঙ্গি করে প্রশান্ত কথাগুলি বলল যে, শুনতে শুনতেই দেবীর মুখখানা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা নত করে অহেতুক হাসিটার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকেই বুঝি সে অপরাধী সাব্যস্ত করল। মনে পড়ল মায়ের কথা, তিনি বলেন—পুরুষদের সামনে মুখ খুলে কখ্‌খনো হাসবে না। আজ বুঝল সে, মা যে কথা বলেছিলেন— কত দামী।

দেবীর দিকে একই ভাবে চেয়ে ছিল প্রশান্ত; হঠাৎ তার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানার পরিবর্তন দেখে বুঝল যে, তার কথাতেই এ অনর্থ ঘটেছে। ব্যাপারটাকে সামলে নেবার উদ্দেশ্যে সে একটু নরম সুরেই অনুরোধ করল: দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন!

দেবীও কোমল কণ্ঠে বলল: অভ্যাগত হয়েও আপনি যদি দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি কি বসতে পারি?

প্রশান্ত বলল: আমি ত এতক্ষণ বসেই ছিলাম, হঠাৎ আপনাদের এই গ্রুপ ছবিখানি চোখে পড়তে উঠে গিয়ে দেখছিলাম। আচ্ছা, আমি বসছি— আপনিও দয়া করে আমাকে ফলো করুন।

কথাগুলো বলতে বলতেই প্রশান্ত একখানা বড় সোফার উপর বসে পড়েই খানিকটা সরে গিয়ে এমন ভঙ্গিতে দেবীকে বসবার কথা বলল, সে যেন সেই সোফারই অপরাংশের শোভাবর্ধন করে। দেবী কিন্তু মধ্যে খানিকটা ব্যবধান রেখে একখানি একানে সোফার উপর বসে নিশ্চিন্ত হল। পুনরায় তার মায়ের কথাগুলি মনে পড়ল:

এখন থেকে নিজেই বিচার করে, নিজের ক্ষমতার দিকে চেয়ে কাজ করবে, লোকের সঙ্গে মিশবে। এ-ও তোমার পরীক্ষা!

দেবী ভাবে—পরীক্ষাই বটে! মায়ের কথায় যে অভ্যাগতকে আপ্যায়ন করতে একাই সে এদিকে এসেছে, সে ব্যক্তির ভাবভঙ্গি, দৃষ্টি ও কথা

প্রত্যেকটি যেন তার সান্নিধ্যই শুধু কামনা করছে। সেই কামনাটিকে দাবিয়ে রাখা চাই ; এইখানেই তার পরীক্ষা।

প্রশান্তও বুঝল, বৃথা তার চেষ্টা! এ মেয়ে তার চেয়েও বেশী চতুরা। তাই সে মুখখানা একটু ভার করে বলল: ছুঁৎমার্গটাকে এখনো আঁকড়ে ধরে রেখেছেন দেখছি।

দেবী ধীরে ধীরে বলল: যে বস্তু আজো টিকে আছে, আর থাকবে, তাকে ধরে থাকা কি অন্যায় বলতে চান?

সেই জন্যেই বুঝি সেকহ্যাণ্ড করেন না—এক সঙ্গে এক আসনে বসেন না?

যেমন শিক্ষা পেয়েছি—তেমনি করে থাক, আর জানি—এই ঠিক।

সহসা সোজা হয়ে বসে কণ্ঠে জোর দিয়ে প্রশান্ত বলল: কিন্তু আপনার ভগিনী রাণী দেবী ঠিক এর উল্টো।

দেবীও সংযত স্বরে বলল: সে-ও যেমন শিক্ষা পেয়েছে, তেমনি করছে। বরাবর সে স্কটিশচার্চে পড়েছে ছেলেদের সঙ্গে মিশে। আর আমি পড়ি উইমেনস্ কলেজে—যেখানে ছেলেদের নেওয়া হয় না!

তাই বুঝি ঐ ছবিতে রাণী দেবীর পিছনে অজিত স্থান পেয়েছে, আর আপনার পিছনে দাঁড়িয়েছে তারই ভগিনী অরুণা?

দেবী স্থির দৃষ্টিতে প্রশান্তর দিকে চেয়ে সংযত কণ্ঠে উত্তর করল: হ্যাঁ। অজিত বাবুর সঙ্গে রাণীর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে কি না, তাই তিনি ওর পিছনে দাঁড়িয়েছেন।

ক্ষুব্ধ স্বরে প্রশান্ত বলে উঠল: আমার কি দুর্ভাগ্য দেখুন, ছবি যখন তোলা হয়, আমি ছিলাম না।

দেবী জিজ্ঞাসা করল: থাকলে কি হোত?

কথার উপর জোর দিয়ে প্রশান্ত বলল: অরুণাকে সরিয়ে দিয়ে ঐ জায়গাটা আমিই দখল করে নিতাম।

কথাটা শুনেই দেবী চমকে উঠল। সে তখন গুলিয়ে না ভেবেই প্রশ্নটা তুলেছিল। এখন বুঝল, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুবার জো হয়েছে, তাই এ সম্পর্কে আর কোন কথা না বলেই মুখখানা নত করল। কিন্তু

'কমলী নঁহি ছোড়তা'—প্রশান্তই পরের কথাটা তুলে দেবীকে রীতিমত বিব্রত করল। সে বলল: চুপ করলেন যে? জিজ্ঞাসা করলেন না তো, কোন্ অধিকারে জায়গাটা আমি দখল করতাম ?

দেবী তেমনি নীরবে বসে রইল, কোন কথাই বলল না। প্রশান্ত পুনরায় বলল: আপনি মুখে না বললেও কথাটা বুঝেছেন, আর আপনার বাবার প্রস্তাবটাও এই ঘরে বসেই যে নিজের কানে শুনেছেন, তা'ও আমি জানি। অজিত বিলেত থেকে ফিরে এলেই এক সঙ্গে এক জোড়া শুভ কাজ শেষ করে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান। আরো স্পষ্ট করে বলব কি ?

মুখখানা কঠিন করে দেবী উত্তর করল: না। ও সব কথা নিয়ে জল্পনা করবার ইচ্ছা আমার নেই—শুনতেও চাইনে, আপনি থামুন।

সুলোচনা দেবী এই সময় এক ডিস খাবার ও জলের গ্লাস নিয়ে ড্রয়িং-রুমে ঢুকতেই প্রশান্ত থতমত হবার মতন ভঙ্গিতে বলে উঠল: একি কাকীমা, আপনি নিজে এ সব—

দেবী তাড়াতাড়ি মায়ের হাত থেকে জলের গ্লাসটি নিয়ে টিপয়ের উপর রাখল। সুলোচনা দেবী মৃদু হেসে বললেন: ছেলের জন্যে জলখাবার ঝি চাকরদের হাতে না পাঠিয়ে নিজে এনেছি—দোষ তো কিছু করিনি বাবা!

প্রশান্ত অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে এবার বলল: না, না, দোষের কথা ত আমি বলিনি, তবে আপনি নিজে কষ্ট করে—

তেমনি হেসে সুলোচনা দেবী বললেন: এ আবার কষ্ট কি বাবা? নিজের হাতে খাবার তৈরি করে খেতে দেওয়ায় যে কি আনন্দ, সেটা মেয়েরাই বোঝে। খাও বাবা! তুমি বাড়ির তৈরি কচুরী খেতে ভালবাসো বলে, আমি তাড়াতাড়ি ভেজে এনেছি।

শুভ্র পরিচ্ছন্ন রেকাবখানির উপর সাজানো সদ্যপ্রস্তুত খাদ্যবস্তুগুলির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে প্রশান্ত অনুরোধের সুরে বলল: তাহলে দেবীকেও বলুন না কাকীমা, এ থেকে নিতে—একসঙ্গেই দু'জনে—

কথাটা শেষ করবার আগেই দৃঢ় অথচ সংযত কণ্ঠে সুলোচনা দেবী বললেন: রাণী কলেজ থেকে ফিরলে ওরা দু' বোন একসঙ্গেই খাবে'খন—

ওদের এই অভ্যাস। আর, পুরুষদের সঙ্গে বা সামনে বসে মেয়েদের খাওয়া আমি পছন্দ করিনে বাবা! তুমি খাও।

এর পর প্রশান্তকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই সুলোচনা দেবী কন্যাকে উদ্দেশ করে বললেন: দেবী, চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি, তুমি গিয়ে তাড়াতাড়ি চা'-টা তৈরি করে নিয়ে এস।

খুবই অস্বস্তিবোধ করছিল দেবী, মায়ের উপস্থিতি এবং তারপর এই আদেশ শোনবামাত্রই দ্রুতপদে ভিতরে চলে গেল। সুলোচনা দেবী টিপয়টির পাশে দাঁড়িয়ে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশান্তকে খাদ্যগুলির সদ্ব্যবহারে প্ররোচিত করতে লাগলেন। একটু পরেই দেবী চায়ের পেয়ালা নিয়ে পুনঃপ্রবেশ করল ড্রয়িংরুমে, তারপর নীরবেই টিপয়ের উপর রেকাবটির পাশে পেয়ালাটি সন্তর্পণে রাখল।

প্রশান্ত এই সুযোগে আর একবার শেষ চেষ্টা করল। দেবীকে অপাঙ্গে দেখেই পরক্ষণে সে-দৃষ্টি সুলোচনা দেবীর মুখে নিবদ্ধ করে জিজ্ঞাসা করল: আপনি যদি বলেন কাকীমা, দেবীকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে করে ভিক্টোরিয়া পার্কটা ঘুরে আসি—আমার এখনো ওটা দেখা হয়নি।

মুখে কোন পরিবর্তনের ভাব না এনেই সুলোচনা দেবী তেমনি সংযত স্বরে বললেন: তবেই হয়েছে! ও কি রাণী—যে বাইরে যাবার নামেই নেচে উঠবে! গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট ছাড়া কোথাও ওকে কেউ নিয়ে যেতে পেরেছে? কলেজে যাবে, তাও গাড়ির জানালায় পরদা ফেলে। নামেই ও শহুরে-মেয়ে বাবা, কারও সঙ্গে বেড়াতে যাবার নামেই ওর গায়ে জ্বর আসে।

দেবীর দিকে চেয়ে প্রশান্ত বলল: এত বড় নিন্দা আপনি ত দিব্যি মুখ বুজিয়ে শুনছেন! বাইরে বেড়াতে যেতে আপনার ইচ্ছে হয় না?

ঘাড় নেড়ে দেবী মায়ের কথাটাই সমর্থন করল। সুলোচনা দেবী বললেন: বামুনদি কচুরী ভাজছে, গরম গরম দেখে খান কয়েক আন ত মা!

কিন্তু প্রশান্ত তীব্রভাবে বাধা দিয়ে দেবীর যাওয়া বন্ধ করে দিল। বলল: না, না, না, আর আমার লাগবে না—আপনি যাবেন না!

এই সময় বগলাপদ ও রাণীকে একসঙ্গেই ড্রয়িংরুমে ঢুকতে দেখা গেল। গৃহিণী নিজে প্রশান্তকে খাওয়াচ্ছেন, দেবীও উপস্থিত—দৃশ্যটা গৃহস্বামীর খুবই প্রীতিকর হল, প্রফুল্লমুখে বললেন: কতক্ষণ এসেছ?

রাণীও বলল: আমি আজ খুব লেট করে ফিরেছি—কলেজে ডিবেটিং ছিল কি না!

প্রশান্ত উভয়েরই মান রাখতে বলল: আমি কিন্তু আজ একটু আগেই এসে পড়ি—এপারে এসে খবর দিতেই কাকীমার এই সব কাণ্ড! চায়ের সঙ্গে এক রাশ খাবার।

বগলা একখানা সোফার উপর বসেই বললেন: বিলক্ষণ! তোমাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ—খাওয়া-দাওয়া ত কিছুই করা হয়নি! আর করব কোথা থেকে—যে সব ঝঞ্ঝাট গেল, দু'দুটো ইন্দ্রপাত! এখন তোমার মুখ চেয়ে বরং একটু শান্তি পাই। অজিত থাকতে কত কি হোত; অরুণাটাও চলে গেল! এখন তুমিই আমাদের আশা আনন্দ উৎসাহ সব!

রাণী বলল: যেমন আপনি এসেছেন, তেমনি কিন্তু লেট করে যেতে হবে—বলে রাখছি।

প্রশান্ত বলল: রাজী আছি—যদি গান শোনাবার আশ্বাস পাই।

হাঁ করে গৃহস্বামী বলে উঠলেন: তাতে কি হয়েছে, হামেশা ত গায় ওরা, নিশ্চয়ই তোমাকে গান শোনাবে। হ্যাঁ, প্রশান্ত আজ আমাদের সঙ্গেই তাহলে ডিন্যার করবে। তোমাদের যা যা ব্যবস্থা করবার করতে পার—আবদুলের খানা ত আছেই।

গৃহিণী এই সময় নিরুত্তরে উঠে গেলেন, দেবীও মায়ের পিছু পিছু চলে গেল। রাণী বলল: আপনি বাবার সঙ্গে একটু গল্প করুন, আমি কাপড় ছেড়ে এখুনি আসছি।

প্রশান্তকে উপলক্ষ করে সে রাত্রে রাণীর গান যেমন জমে উঠল, ঘরের ও বাইরের বাবুর্চিখানার মুখরোচক খাদ্যগুলিও তেমনি তাকে প্রচুর তৃপ্তি দিল। কিন্তু গানের বা ভোজের আসরে দেবী রইল আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো

ভাবে। গানে সে যোগ দিল না, যেহেতু কিছু দিন ধরেই কণ্ঠনালিতে একটা ব্যথাবোধ করছে; আর ভোজের টেবিলেও বসল না—ছেলেবেলা থেকেই বাড়ির সবার খাবার পর, মায়ের সঙ্গেই সে খেতে অভ্যস্ত, এই অজুহাতে।

এদিনের আদর আপ্যায়ন এবং দেবীর সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তায় এই ভরসাটুকু পাথেয় করে প্রশান্ত বিদায় নিল যে—'আজি না পেলেও সব—পেতে পারি কাল'।

এই 'কালে'র প্রতীক্ষায় অতঃপর এ বাড়িতে প্রতি সায়াহ্নে এবং ছুটি-ছাটার দিন মধ্যাহ্নেও নিয়মিত ভাবে প্রশান্তর যাতায়াত চলতে লাগল। এভাবে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে—এবং গৃহস্বামীর কাছে প্রশ্রয় পেয়ে দেবী ও রাণীর প্রতি সম্ভ্রমটুকুও সংকোচমুক্ত ও সহজ করে 'তুমি' -তে নামিয়ে দিল।

এর ফলে, এ বাড়িতে তার নিত্যকার গতিবিধি, অবাধ মেলামেশা, গৃহস্বামীর আন্তরিকতা ও অতিরিক্ত প্রশ্রয় ক্রমে এমন এক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করল যে, দেবীর পক্ষেও এই দারুন জেদী ছেলেটির প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন হয়ে উঠল। এমন কি, দেবীর পাঠাগারে সংগোপনে গিয়ে প্রশান্ত তার হাতে-আঁকা ছবির তলায় এবং কলেজের নোট-লেখা খাতায় কবিতা লিখে তাকে হতচকিত করে দেয়। অপরাধী কে—জেনেও পিতার ভয়ে সে নীরব থাকে। গানের আসরেও এখন আর মুখ বুজিয়ে থাকা বা প্রশান্তর অনুরোধ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রশান্ত ভাবে, আর কি—পাথরকে সে রসিয়েছে, এখন কোন সূত্রে একবার যদি তাকে মোটরে তুলতে পারে, তাহলে মা ও মেয়ের পূর্বের সেই ব্যবহারগুলোর সঙ্গে একবার রীতিমত বোঝাপাড়াও হয়ে যাবে।

কথায় আছে—দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। মামার পারলৌকিক কাজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানটিকে উপলক্ষ করে প্রশান্ত এক ভোজের আয়োজন করল। বগলাকে জানাল: প্রত্যহ এ বাড়িতে এসে কত উপদ্রব ত করি, কাকীমার পাকশালা, আর বাইরে কাকাবাবুর বাবুর্চিখানা সমান ভাবে আমাকে রাজভোগে আনন্দ দেয়, আমারও কিছু কর্তব্য আছে ত! তাই

গঙ্গার ধারে মামাবাবুর বাগানবাড়িতে তাঁর পারলৌকিক কাজটাকে উপলক্ষ করে আমিও একটি ভোজের ব্যবস্থা করেছি—আপনাদের যাওয়া চাই।

কথাটা তুলতেই বগলাপদ সানন্দে বলে ওঠেন: নিশ্চয়ই যাব, এ ত আমাদেরই কাজ বাবা!

অতঃপর এ সম্পর্কে নানারূপ জল্পনা চলতে থাকে। কাজটির কয়েক দিন আগে স্থির হয় যে, সুলোচনা দেবী বাড়িতে থাকবেন; কর্তা দুই মেয়েকে নিয়ে প্রশান্তর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন।

এ ব্যবস্থায় প্রশান্ত আরও সন্তুষ্ট হল। রাণীকে সে জানিয়ে রাখল, তাদের বাগান থেকে খানিকটা দূরেই বোটানিকাল গার্ডেন, ভোজের পরই সেখানে একটা ট্রিপ দেওয়া যাবে।

২১

দেবীকে কেন্দ্র করে কিন্তু প্রশান্তর এত উদ্যোগ, উদ্যম ও পরিকল্পনা হঠাৎ ভেঙে গেল। এবং এমন ভাবে ভাঙল যে, যোড়াতাড়ার কোন উপায়ও দেখা গেল না।

গঙ্গার ওপারে বাগানবাড়ির ভোজে যাওয়ায় প্রশান্ত সেদিন যোগলা-ভিলায় অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু সেই দিনই শান্তিনিকেতন থেকে রাণীর নামে উপর্যুপরি কতিপয় টেলিগ্রাম এসে ভিলাকে সরগরম করে তুলল। সেখানে বর্ষা-উৎসব আরম্ভ হতে আর বিলম্ব নেই। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা গীতি-নাট্যের অভিনয় করবেন—অরুণাকেও তাতে যোগ দিতে হবে। তার একান্ত ইচ্ছা—রাণী এই সময় শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থেকে আগাগোড়া উৎসবটা দেখে। উৎসবের পর তারা একসঙ্গেই কলকাতায় ফিরে আসবে। এর জন্য বাড়ির কর্তা ও গৃহিণীকে চিঠির বদলে আলাদা আলাদা টেলিগ্রাম

করেছে সে, আর এমন ভাবে আগ্রহের সঙ্গে মিনতি জানিয়েছে যে, তাঁকে সম্মতি না দিয়ে উপায়ও নেই। কাজেই, রাণীর যাওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেল।

যাবার আয়োজন করতে করতে রাণী বাবা ও মাকে উদ্দেশ করে বলল: প্রশান্ত বাবু কিন্তু আমার যাওয়ার কথা শুনে খুবই ঘাবড়ে যাবেন; মায়ের কাজটাকে উপলক্ষ করে ওপারে বাগানবাড়িতে খাওয়া দাওয়া এর উদ্যোগ আয়োজন করছেন বেচারী!

বগলাপদ বললেন: তাতে হয়েছে কি, তুমি বাইরে যাচ্ছ বলে কি তার কাজ হবে না—আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ থাকবে? প্রশান্ত ঘাবড়াবার ছেলে নয়।

সুলোচনা দেবী বললেন: কিন্তু মুস্কিল হবে আমার। তুই থাকলে আমি নিশ্চিন্তি হয়ে দেবীকে ওখানে ছেড়ে দিতুম, এখন আমাকেও ছুটতে হবে।

বগলাপদ বললেন: ছুটলেই বা, বাগানবাড়িতে খাওয়া-দাওয়া এর ব্যবস্থা করছে বলে ভয় পাবারই বা কি আছে? না হয় তাকে বলে দেব—তোমাদের জন্যে খাবার মেনু আলাদা করতে—যাতে জাত না যায়!

বিরক্তির ভঙ্গিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সুলোচনা দেবী প্রতিবাদ করলেন: আহা, আমি ঐ কথা বলছিলুম কি না! আমার মুশকিল যে কোথায়, তুমি তার কি বুঝবে?

এর পর আর কথা না বাড়িয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। রাণী মৃদু হেসে বলল: মার যত ভয় দিদিকে নিয়ে! কথা পড়তেই আমি বুঝেছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন: কি জন্যে ভয়টা শুনি?

রাণী বলল: প্রশান্ত বাবু বলে রেখেছেন, খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের দুই বোনকে বোটানিকাল গার্ডেন দেখাতে নিয়ে যাবেন।

বগলাপদ বললেন: সে ত ভাল কথা, এতে ভয়টা আসে কোথা থেকে?

রাণী বলল: বুঝলেন না—আসলে ভয় দিদি। মা'র কিছুতেই ইচ্ছে নয়, দিদি একলা প্রশান্ত বাবুর সঙ্গে কোথাও যায়! আর দিদির সঙ্গে আলাপ হয়ে অবধি প্রশান্ত বাবুর মাথায় কি যে ঝোঁক চেপেছে—দিদিকে নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াবার, সে আর কি বলব? মা'রও কোট—কিছুতেই দিদিকে ওঁর সঙ্গে বেরুতে দেবেন না।

মুখখানা ঈষৎ ভার করে বগলাপদ বললেন: এটা ওঁর বড্ড বাড়াবাড়ি মনে হয়। যখন প্রশান্তর হাতেই দেবী পড়বে, তার সঙ্গে কোথাও কোনোই একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। এ কিন্তু ভাল নয়।

রাণী বলল: আমারো তাই মনে হয়। বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে গেছে, আর দেশের বাড়িতে ছেলেবেলায় বিয়ের যে কথা হয়েছিল, এত দিনে যখন সে সব চাপা পড়েছে, তখন আর ধরাকাট করে লাভ কি?

হঠাৎ বগলাপদ গম্ভীর হয়ে বললেন: আমি ওঁর মনের ভাবটা বুঝি। দেশের কথা চাপা পড়লেও উনি এখনো এক যুগ আগেকার ব্যাপারটা ওঁর মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। আচ্ছা, সে ছেলেটার কথা তোমার এখন মনে পড়ে রাণী? সেই যে—পশুপতি পণ্ডিতের ছেলে, কলকাতায় এসে দেবীও যার জন্যে প্রথম প্রথম খুব কেঁদিয়েছিল?

রাণী একটু থেমে অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির সূত্রটি যেন মনে মনে টেনে অস্পষ্ট ভাবে জানাল: সে ত মনে পড়বার কথা নয় বাবা, কত দিনের কথা—ভুলেই ত' গিয়েছিলুম। তবে এর মাঝে এক দিন মায়ের সঙ্গে আপনার এই নিয়ে বচসা হ'তে, আড়াল থেকে আমি সব শুনি। তখন ভাবতে ভাবতে একটু একটু করে মনে পড়তে থাকে। আর আমরা-তখন খুব ছোট ছিলুম, কি করে সব কথা মনে থাকবে বলুন?

বগলাপদ পুনরায় প্রশ্ন করলেন: দেবীর কিছু মনে আছে বলতে পার? সে সব কথা তোলে কখনো? কিম্বা তোমাকে কিছু বলে?

গম্ভীর হয়ে রাণী উত্তর করল: না বাবা!

বগলাপদ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ও কথা শোনবার পর তুমি কিছু বলেছিলে দেবীকে?

রাণী বলল: হয়ত বলতুম, জানতে চাইতুম—ছেলেবেলাকার সে সব কথা তার মনে আছে কি না? কিন্তু আড়াল থেকে যেমন ও-কথা সেই প্রথম শুনি, তখনি সঙ্গে সঙ্গে আপনি মাকে বারণ করে দিলেন—দিদির কানে যেন

কথাটা তোলা না হয়! তাতেই বুঝেছিলাম, দেশের সঙ্গে আপনি সম্বন্ধ রাখতে চান না। তাই আমাকেও সব চেপে যেতে হয়েছিল।

কন্যার মাথার উপর হাতখানি রেখে, ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে প্রসন্ন মুখে বগলাপদ বললেন: তুমি মা খুব বুদ্ধিমতী, অবস্থা বুঝে ঠিক সেই মত ব্যবস্থা করতে জানো; একেই বলে—উচ্চ-শিক্ষার গুণ! তোমার বোকা দিদির কানে পুরানো কথাগুলো না তুলে আমার মনের ইচ্ছাটারই প্রসার করেছ তুমি। আর, তোমার মা যখন আমাকে কথা দিয়েছেন, নিজে থেকে দেবীকে কোন কথাই জানাবেন না—তাঁর সে কথা যে বজায় থাকবে, আমার সে বিশ্বাস আছে। তুমিও মা, এ সম্বন্ধে সতর্ক থেকো। এমন কি, প্রশান্তর কানেও যাতে কথাটা না ওঠে, সে-দিক দিয়েও সাবধান থেকো।

রাণী বলল: দিদির জন্য এত ভাববারই বা কি আছে? আপনাদেব মুখেই শুনেছি—দেশ থেকে কলকাতায় আসার পর শক্ত অসুখে ভুগে ভুগে সেরে ওঠার পর আগের কথা সবই ভুলে যায়। আপনি বাইরে বাইরে ঘুরতেন ব'লে, আপনাকেও নাকি প্রথমে চিনতে পারেনি দিদি! এখন এক একটা ক'রে সে-সব কথা ধরিয়ে না দিলে ওর মনে পড়বে কি করে? তবে একবার যদি কেউ বলে দেয়, তাহলে ইলেকট্রিকের ঐ সুইচটা টেপার মতন মনের অন্ধকার কেটে আলো ফুটে উঠবে। এই যেমন আমি—আপনাদের কথা শুনে অবধি মনে মনে ভেবে ভেবে ছেলেবেলার কিছু কিছু জেনেছি বৈ কি! আচ্ছা বাবা, দেশে যে-ছেলেটির সঙ্গে দিদির খুব ভাব হয়েছিল—তার খবর কিছু পান? কি করে সে?

প্রশ্নটি শুনেই বগলাপদ মুখখানা বিকৃত করে বললেন: পাগলামী করে বেড়াচ্ছে, আর করবে কি!

সবিস্ময়ে রাণী বলল: সে কি?

বগলাপদ বললেন: তাহলে শোন বলি, ছোকরার বাবাকে লিখেছিলুম, ভাল ভাবে পড়াশোনা যাতে করে—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। তার জবাবে আমাকে জানায়, কাশীতে ছেলেকে পাঠিয়েছে—সেখানে সংস্কৃত কলেজে পড়ে পণ্ডিত যাতে হয়, সেই দিকে তাঁর লক্ষ্য।

কৌতূহলী হয়ে রাণী জিজ্ঞাসা করল: ও বাবা, পণ্ডিত্ত ক্ষ্যাপাই হয়েছেন তাহলে?

ছাই হয়েছে! তোমার মায়ের ওদিকে ঝোঁক দেখে ছেলেটার খবর নিতে মাঝে ইচ্ছে হয়। আমার এক বন্ধু সে-সময় কাশীতে যান, তাঁকে সব খবর দিয়ে ছেলেটার সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট পাঠাতে বলি। তিনি আর সেখান থেকে লিখে পাঠাননি, ফিরে এসে নিজেই আফিসে দেখা করে যা বলেছেন—সে একটা খবর বটে!

কি বলেছেন তিনি?

বগলাপদ একটু থেমে সিগারের পাইপটায় অগ্নি সংযোগ করে তিক্ত স্বরে বললেন: একেবারে স্পয়েল হয়ে গেছে ছোকরা। যে মেসে থাকে, সেখানে গিয়ে তিনি সন্ধান নিতে, ছেলেরা তাঁকে বলে—ছোকরার মাথার স্ক্রুগুলো সব ঢিলে; ছেলেবেলায় একটা মেয়ের সঙ্গে বোধ হয় ভাব-সাব হয়েছিল, তার একখানি ফটো নিয়ে কি পাগলামী! তাকে শ্লোক শোনায়, তার সঙ্গে কথা কয়। ছেলেরা সেই জন্তে তাকে 'ওমর খৈয়াম' বলে ক্ষেপায়।

রাণী শুনতে শুনতে উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করল: উনি কি নিজে তাকে দেখেছিলেন?

বগলাপদ বললেন: না। সে তখন তল্পীতল্পা নিয়ে দেশে চলে গেছে। এখন আমার মনে হচ্ছে, পশুপতি ছেলের মতি-গতি দেখেই আমাকে আর কিছু লেখেনি।

রাণী জিজ্ঞাসা করল: মাকে এ কথা বলেছেন?

বগলাপদ বললেন: না—এখনো বলিনি। প্রশান্তর ব্যাপারে ওঁর অভিমত এখন ফিরে গেছে মনে হচ্ছে। সেই জন্তে আর ঘাঁটাইনি। খবরটা শুনলে আরো মুসড়ে পড়বেন। যাক—তুমি তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে ফেল, দেবীরও সময় হয়ে এলো ফেরবার। প্রশান্তর সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেলেই ভাল হোত, কিন্তু সে চান্স নেই যখন—

রাণী আপন মনেই বলে উঠল: বাগানবাড়ি চুণকাম করিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে

তবে ফিরবেন বলে গেছেন, সে ত দুটো দিনের ধাক্কা! ওদিকে অরুণার যা তাড়া—

বগলাপদ ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন : না, না, আজই তোমাকে রওনা হতে হবে। আমি ক্লার্ককে বলে দিয়েছি—বার্থ রিজার্ভ করেই বোলপুরে একটা এক্সপ্রেস্ তার করে দেবে।

এই সময় বাইরে মোটরের হর্ণ শুনেই রাণী বলল : ঐ দিদি এসে পড়েছে। আমি পড়ার ঘরেই ওকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিইগে।

বলতে বলতে রাণী দেবীর উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। বগলাপদ আরাম কেদারায় দেহখানা ছড়িয়ে দিয়ে নিবিষ্ট মনে পাইপ টানতে লাগলেন। এমনি সময় বেয়ারা এসে বগলাপদর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। ডাকঘরের ছাপ দেওয়া লেফাফা—দেখেই তিনি বুঝলেন, বিকেলের ডাকে ডেলিভারি হয়েছে এবং চিঠির প্রেরক হচ্ছেন পশুপতি পণ্ডিত—হরগৌরীপুর থেকে চিঠিখানা গৃহিণী সুলোচনাকে লিখেছেন। খামের উপর লেখা আছে—মাননীয়া শ্রীমতী সুলোচনা দেবী, শুচিস্মিতাসু।

বগলার মনে পড়ল, কয়েক মাস আগেও পশুপতি তাঁকে অতিক্রম করে গৃহিণীর নামে এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বগলাকে উপরি উপরি লেখা কয়েকখানা চিঠির জবাব না পেয়ে পশুপতি শেষে এই মতলব করেন, অর্থাৎ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বগলা সে চিঠি পড়েছিলেন—সেই সব পুরাতন একঘেয়ে মামুলি ভাবে ভ্যাজর ভ্যাজর! খানিক পড়েই চিঠিখানা ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, চিঠির প্রসঙ্গটা স্ত্রীর কাছে প্রচ্ছন্নই থাকে। এ দিনের চিঠিখানার শিরোনামাটিও এক নজরে দেখেই ভ্রূকুঞ্চিত করে বিনা দ্বিধায় খুলে ফেললেন। পশুপতি পণ্ডিত খুব সংক্ষেপে কতিপয় ছত্রে সুলোচনা দেবীকে লিখেছেন—

দীর্ঘকাল যাবৎ আপনাদের কোনও সমাচার না পাইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন আছি। বগলাকে পর পর অনেকগুলি পত্র লিখিয়াও উত্তর না পাওয়ায় অবশেষে কয়েক মাস পূর্বে আপনার বরাবর এক লিপি পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহারও কোন উত্তর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। ইহাতে উদ্বেগ অধিকতর

বর্ধিত হইয়াছে। শ্রীমান ললিতমোহন বাবাজীবনের উচ্চ শিক্ষা সমাপ্তির পথে—শীঘ্রই কৃতবিদ্য হইয়া শ্রীমান্ দেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। তৎকালে হরগৌরী-মন্দিরে আপনাদের উভয় বান্ধবীর প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আলোচনা ও বিবেচনার প্রয়োজন হইবে। এমত অবস্থায় সত্বর আমাদিগের সাক্ষাৎকার আবশ্যক বিধায় অত্র পত্রদ্বারা নিবেদন করিতেছি যে, যত শীঘ্র সম্ভব স্বয়ং কলিকাতায় রওয়ানার জন্য অভিলাষী হইয়াছি। সাক্ষাতে বিস্তারিত বলিবার বাসনা রহিল। ইতি—

একান্ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীপশুপতি দেবশর্মণঃ

পত্রখানা এক নিশ্বাসে পড়েই বগলাপদ তাড়াতাড়ি খামের মধ্যে ভরে পকেটে রেখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে কতকগুলো কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল: হুঁ! বেড়ালের মতন নরম মাটি আঁচড়াবার জন্যে নুলো বাড়াতে শুরু করেছে পণ্ডিত! ছেলে ওঁর কৃতবিদ্য হয়ে ফিরছেন···লিখতে লজ্জা হলো না? ফিলজফার হয়ে আসছেন—হামবাগ! চিঠিতে কিছু হচ্ছে না দেখে নিজেই আসছেন খাতির জমাতে—চিঠির কোনো জবাবের তোয়াক্কা না রেখেই!

এমনি নিজের মনেই কথাগুলো ছকে নিয়ে বগলা স্তব্ধ ভাবে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। পণ্ডিতের চিঠিখানা তাঁর মনের পাতায় রেখাপাত করেছে মনে হলো। এখন ছাড়াছাড়ি হলেও, এক কালে পরস্পরের মনের গতি কারও কাছে অজ্ঞাত ছিল না। পণ্ডিতের সম্বন্ধে এ ধারণা বগলার সুস্পষ্ট ছিল যে, তিনি চিরদিনই সত্যাশ্রয়ী—অসত্য বা অন্যায়কে প্রশ্রয় কখনো দেননি। সুতরাং সেই পণ্ডিত পত্রে লিখেছেন—তাঁর পুত্র কৃতবিদ্য হয়ে দেশে ফিরেছে। অথচ, বগলাপদর বিশ্বস্ত বন্ধু কাশী থেকে সঠিক খবর সংগ্রহ করে এনে তাঁকে বলেছেন—ছেলেটা মাথা-পাগলা, ছেলেবেলায় যে মেয়েটার সঙ্গে খেলা করত, তার ছবি নিয়ে যে সব পাগলামী করে, তাতে ছেলেরা কত কথা বলে! ছাত্রমহলে ওর খেতাব হয়েছে—ওমর খৈয়াম! বন্ধুর মুখে শোনা এ-সব কথাও মিথ্যা হতে পারে না, কেন না—তাঁর মেয়ে দেবীর ছবি কলকাতায় এসেই

তিনি পাঠিয়েছিলেন এবং পণ্ডিতের পত্রেও জেনেছিলেন, ছবি নিয়ে সে সময় যে সব কাণ্ড করত! ছেলেবেলার খেলা ভেবে তখন হয়ত আনন্দ হত, কিন্তু বড় হয়েও যদি সে অভ্যাস ভুলতে না পারে, লোকে ত মাথার দোষ দেবেই। বগলা স্থির করতে পারেন না, কোন্ কথাটা সত্য!

আসলে পণ্ডিতের পুত্র ললিতের পাণ্ডিত্য বা মস্তিষ্ক বিকৃতির সত্যাসত্য বগলার মনে সমস্যার সৃষ্টি করেনি, ললিতের অস্তিত্বই তিনি এখন সহ্য করতে পারছেন না এবং এই জন্যই নিজে ও-পক্ষের সঙ্গে সম্বন্ধটা আগেই ছেদন করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাঁর ধারণা, চিঠির পর চিঠি পেয়েও নীরব থাকার অর্থই হচ্ছে সম্পর্ক কাটিয়ে ফেলা। পশুপতির মত পণ্ডিতের পক্ষে এরূপ উপেক্ষা বা তূষ্ণীভাব থেকেই উপলব্ধি করা উচিত—এ পক্ষ আর যোগাযোগ রাখতে চান না। সুতরাং তাঁরও উচিত নীরব থাকা। কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে পণ্ডিত যে বন্ধুপত্নীকে পত্রাঘাত করে তাড়া দেবেন—তাঁর জিজ্ঞাসার ব্যাপারে এভাবে নতুন রাস্তা ধরবেন, তিনি সেটা ভাবেন নি। তবে পত্নীকে লিখলেও চিঠি স্বামীর হাতে এসে পড়ায় সেই চিন্তার মধ্যেও তিনি এই ভেবে আশ্বস্ত হন যে, আগেকার মত নীরব থাকলেই পণ্ডিত নিশ্চয়ই অবস্থাটা বুঝতে পারবে। স্বামী জবাব দিলেন না কোন চিঠির, স্ত্রীও একই ভাবে নীরব! এর পরের অবস্থা এ যুগের কোন বুদ্ধিমানকে কি বুঝিয়ে দিতে হবে?

ওদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যখন তিনি প্রশান্তকে নিয়ে পড়েছেন, নানা ভাবে তার তোয়াজ করে চলেছেন, আবার সেই সময় বন্ধুর সাহায্যে কাশী থেকে ললিতমোহনের সম্বন্ধে যে খবর সংগ্রহ করে তীক্ষ্ণ শরের মত মনের তূণীরে সঞ্চয় করে রেখেছেন, তারও সার্থকতা আছে বৈ কি। প্রশান্তর সঙ্গে দেবীর বিবাহ সম্পর্কে যদি পত্নীর কাছ থেকে অতীতের কথা ধরে কোন আপত্তি ওঠে, তৎক্ষণাৎ তূণীর থেকে উক্ত সঞ্চিত শরটি প্রয়োগ করে সে সমস্যাটিও তিনি নস্যাৎ করে দেবেন।

কিন্তু এত দিন পরে হঠাৎ পণ্ডিত এ ভাবে পত্র লিখবেন এবং পত্রের কোন উত্তর প্রতীক্ষা না করেই এখানে সশরীরে হাজির হবার কথা জানাবেন, বগলা বুঝি ধারণাই করেন নি। তিনিও যে পাল্টা জবাবে তাঁকে আসতে

নিষেধ করবেন, তারও উপায় নেই—কারণ, তিনি এ-বাড়ির গৃহিণীকে পত্র লিখেছেন। তাঁর দ্বারা জবাব দিতে হলে সবই ফাঁস হয়ে যায়! কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব নয়। দেশের ব্যাপারে তিনি গৃহিণীকে আগাগোড়া অন্ধকারে রাখতে চান, এক্ষেত্রে ললিতের সম্পর্কে বন্ধুর বিবৃতি—যে তথ্যগুলি তিনি পত্রাকারে লিখিয়ে নিয়েছেন, সেইটিই তাঁর পক্ষে এক বলিষ্ঠ অবলম্বন।

এই ভাবে মনে মনে বিস্তর আলোচনার পর শেষে এই সাব্যস্ত করলেন যে, তাঁর পত্নীর জবানীতেই হরগৌরীপুরে একখানা টেলিগ্রাম পাঠাবেন। সুলোচনা দেবীই যেন বিশেষ কোন কারণে তাঁকে এখন কলকাতায় আসতে নিষেধ করে পরবর্তী টেলিগ্রামে বিস্তারিত জ্ঞাত হবার কথা জানাচ্ছেন। তারপর প্রথম টেলিগ্রামে তাঁর আসাটা বন্ধ করে, পরের টেলিগ্রামে জানালেই হবে যে, ঘটনাচক্রে দেবীর বিবাহের কথা অন্যত্র স্থির হয়ে গেছে; ব্যবসায় সূত্রে অর্থ-নৈতিক কারণে তিনি তাঁরই এক বিশিষ্ট সহকর্মীর পুত্রের হাতে দেবীকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

নিজের মতলবে নিজেই মুগ্ধ হলেন। চিঠির বদলে তারের খবরেই এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটির মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বাজী মাত করবেন। হরগৌরীপুরে পণ্ডিত যেমন জানবেন—বহু আগের একটা ছেলে-খেলার ব্যাপার নিয়ে পুতুর গুলিয়ে তিনি মস্ত ভুল করেছেন, এ যুগে ও সব চলে না; আর, সেই ললিত ছোকরাও বুঝবে—ছেলেবেলায় যেটি খুব সুলভ থাকে, বড় হলে তাই দুর্লভ হয়ে নাগালের বাইরে যায়। অতএব তাকে পাবার আশা করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

২২

পরদিন।

বোগলা-ভিলার বাইরের বড় ঘড়িতে এগারোটার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একখানা ঘোড়ার গাড়ী দেউড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। এক মাত্র আরোহী—সঙ্গে আনা মালপত্রের মধ্যে ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ, আর প্রকাণ্ড একটা ছাতা নিয়ে গাড়ী থেকে নামলেন। ছাতার বাঁটটি সেকেলে, বেতের মত সরু বাঁশের তৈরী—বাঁকানো, ছাতার গায়ের কালো কাপড়ের উপর সাদা নয়ানসুকের ঘেরাটোপ।

লোকটির পরনে সাদা থান, গায়ে সাদা দড়ির গিঁট-দেওয়া মেরজাই—কোমর পর্যন্ত লম্বা, কাঁধে এণ্ডির একখানা চাদর পাট করে ফেলা, পায়ে পেনেলা জুতো, তাতে কালো রবারের বক্লা আঁটা, মাথার চুলগুলি খুব ছোট ছোট করে কাটা, তার মধ্যে টিকিটি পিছনে মাথার এলাকা পেরিয়ে ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। টিকির অনুপাতে গোঁফজোড়াটিও পরিপুষ্ট। চুলে অবশ্য পাক ধরেছে, অর্থাৎ সাদায়-কালোয় মেশামেশি অবস্থা। দাঁতগুলিও সব বজায় আছে—একটিও পড়েনি, মুক্তার মত ধব-ধব করছে। দেহ ঋজু, বাঁধুনি বলিষ্ঠ ও সৌষ্ঠবান্বিত, চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ—তারা দু'টি বড় বড়। এমন বাহ্যিক অবয়ব দেখে বয়স অনুমান করা কঠিন। সাধারণতঃ প্রবীণের পর্যায়ে পঞ্চাশের বেশী মনে হয় না, কিন্তু হিসাব করলে জানা যায়—ষাটের সীমারেখা পেরিয়ে এসেও সুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য অনুমানকে ভুল করে দেয়। ইনিই হরগৌরী গ্রামের পশুপতি হালদার।

জামার পকেট থেকে একটি থলি বার করলেন পশুপতি। তার ভিতর থেকে দু'টি টাকা নিয়ে গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দরজার সামনে এগিয়ে এলেন; তখনই দারোয়ান ডান হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে

তাকাল আগন্তুকের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে পশুপতি জিজ্ঞাসা করলেন: বগলা সাহেবের এই বাড়ী ত?

'জী, হুজৌর!' বলে দারোয়ান পুনরায় তসলিম জানিয়ে তাঁকে সসম্ভ্রমে লাল কাঁকর খচিত রাস্তার সামনে গাড়ী-বারাণ্ডার দিকটা দেখিয়ে দিল। সাধারণতঃ যাঁরা গাড়ী করে এ বাড়ীতে আসেন, গাড়ী দেউড়ীর ভিতর ঢুকে এই লাল রাস্তা দিয়ে গাড়ী-বারাণ্ডার সামনে এসে দাঁড়ায়। পশুপতি পণ্ডিতের জানা নেই, ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ানও এ সব বিষয়ে অজ্ঞ; তাই দেউড়ীর সামনেই গাড়ী থামিয়েছিল।

ভিতরের গাড়ী-বারাণ্ডার মুখেই সাজানো অলিন্দ। সেখানে সারি সারি কেদারা সাজানো আছে—আগন্তুকদের জন্য। অপরিচিতের পক্ষে এখানে অপেক্ষা করবার রীতি, সেজন্ত বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। পশুপতিকে একখানা কেদারায় বসিয়ে সেখানকার সংযোগকারী জিজ্ঞাসা করল: আপনার কার্ড আছে?

বড়লোকের বাড়ীর কায়দা-কানুন দেখে পশুপতি মনে মনে কৌতুক বোধ করছিলেন। কেবলই তাঁর মনে পড়ছিল—সেই বগলা, গাঁয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বিছানো মাদুরে বসে যার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো, আজ সহরে বাড়ী করে এই সব কায়দা-কানুন করেছে!

কার্ডের কথা শুনে পশুপতি বললেন: না বাপু, এ সব নেই, আর আমার খবর দেবার জন্তে ওর দরকারও হবে না। তুমি বগলা সাহেবকে বল গে—

সে ব্যক্তি বলল: আজ্ঞে, সাহেব ত কুঠীতে নেই, খানিক আগে বেরিয়ে গেছেন।

পশুপতি বললেন: সাহেবের মেম আছেন ত' গো? দেবীর মা—বুঝেছ আমার কথা?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি ভিতর মহলে আছেন।

"বাস্—তাহলেই হবে। তাঁকে বলগে—দেশ থেকে ললিতের বাবা এসেছেন। এই বলেই, আর কিছু বলতে হবে না।

খবর নিয়ে সে লোক চলে গেল। পশুপতি পণ্ডিত পুনরায় অতীতের স্মরণে যেন ফিরে গেলেন। এক যুগ আগের কত কথাই মনে পড়তে লাগল, যেন তারা সব দল বেঁধে এসে ভীড় জমালো।

সেদিন নূতন একটা ব্যাপার সম্পর্কে জন দুই বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলোচনার কথা থাকায়, দশটার মধ্যেই আহারাদি সেরে বগলা আফিসে গিয়েছেন। দেবীও কলেজে। রাণী আগের দিন রাতের ট্রেণে বোলপুরে রওয়ানা হয়েছে। সুলোচনা দেবী বাড়ীতে একা, পরিচারিকারা ছাড়া সংসারের কেউ নেই। তাঁর একটু বেলাতেই খাওয়া অভ্যাস। সংসারে তিনি গৃহিণী, এগারোটার মধ্যে খাওয়ার পাট সেরে ফেলা তিনি পছন্দ করেন না, তাঁর মতে সেটা উচিতও নয়। ভিতর মহলে বসবার ঘরে মেঝের উপর একখানা সতরঞ্চি বিছিয়ে তিনি সংসারের কতকগুলি হিসাবপত্র দেখছিলেন। এমন সময়, সুখদা নামে যে পরিচারিকাটির উপর বাইরের কোন খবর ভিতরে আনবার ভার দেওয়া আছে, সে তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল: মা, দেশ থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান।

খবর শুনেই কাজ ছেড়ে সুলোচনা দেবী সোজা হয়ে বসে সাগ্রহে শুধালেন: দেশ থেকে এসেছেন? নাম বলেন নি?

সুখদা বলল: নাম বলেন নি, আপনাকেই বলতে বলেছেন—দেশ থেকে ললিতের বাবা এসেছেন—বললেই...

সুখদাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়েই সুলোচনা দেবী বিপুল ব্যগ্র ভাবে উঠে পড়ে বললেন: যা, যা, এখনি তাঁকে এখানে নিয়ে আয়, আর ঝি-গুলোকে বলে দে—শীগ্‌গির যেন এখানে আসে।

সুখদা দ্রুতপদে বাইরে চলে গেল। সুলোচনা দেবীও দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে সমস্ত অন্তর আর চোখের দৃষ্টি প্রখর করে ললিতের বাবার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। পশুপতির মত এখানেও এই মনস্বিনী মহিলাটির মনে হতে লাগল—এক যুগ আগের ফেলে-আসা পল্লীর বহু পরিচিত বহু বহু ঘটনাঘেরা পল্লী-লক্ষ্মীর শোভাময় আঙিনায় যেন আবার ফিরে গেছেন।

সেই চণ্ডীমণ্ডপ, ছেলে-মেয়েদের সাধের খেলাঘর, গ্রামের সেই পুকুরঘাট— পরস্পরের মধ্যে সুখ-দুঃখ, হাসি-খুশি, কত রকমের কত কথা! এ সব যেন এতদিন স্বপ্নের মত অবাস্তব ছিল। কি ক্ষণেই তাঁর কানের মধ্যে অভিবাহিত কথাগুলি সুমিষ্টস্বরে বাজলো—দেশ থেকে ললিতের বাবা এসেছেন! কত লোকই ত' এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করে থাকেন; কিন্তু আসার সঙ্গেই আগন্তুকের নামটি শুনে এমন করে ত' মনের মধ্যে উল্লাসের ঝড় বয়নি কোন দিন!

কিছুক্ষণ পরেই সৌম্যমূর্তি আগন্তুক ব্যক্তিটিকে সামনে দেখেই সুলোচনা দেবী আর আপনাকে সামলাতে না পেরে সেই পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পদতলে বসে পড়ে আর্তস্বরে বলে উঠলেন: আমার সইকে কোথায় রেখে এলেন পণ্ডিতমশাই? আমি যে—

অশ্রুর আবেগে স্বর তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেল। পশুপতিও তৎক্ষণাৎ আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাতখানি তুলে গাঢ় স্বরে বললেন: আমি জানতুম, আপনি মা হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করতে পারবেন না। আজ আপনার সই যদি আমার সংসার আলো করে থাকতেন, আমাকে এ ভাবে এখানে আসতেও হত না। সে যাই হোক, স্থির হন!

আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে সুলোচনা দেবী উঠে দাঁড়ালেন। সুখদা পীড়াপীড়ি করে পণ্ডিতের ব্যাগটি নিজেই হাতে নিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। সুলোচনা তাকে বললেন: ও ঘরে ওঁর জিনিসপত্তর সব রেখে এসো।

পশুপতিকে অনুরোধ করলেন: পথে কত কষ্ট হয়েছে, আগে হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

এই সময় বাড়ির অন্যান্য পরিচারিকারাও এসে পড়েছে। তাদের উদ্দেশ করে সুলোচনা বললেন: ওঁর হাত-মুখ ধোয়া, তারপর,—আহারের সব ব্যবস্থা করে রাখ।

বসবার ঘরের পাশেই একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। এক দিকে বসবার ব্যবস্থা, অন্য দিকে খাটের উপর পরিপাটি শয্যা। সুলোচনা স্বয়ং পশুপতিকে

সেই ঘরের মধ্যে এনে একখানা আরাম কেদারায় বসালেন। ঘরের বাইরে টানা দালানে পিতলের বড় বড় পাত্রে-ভরা জল এবং প্রাসঙ্গিক দ্রব্যাদি এসে পড়ল। অবাক-বিস্ময়ে পশুপতি দেখতে লাগলেন। বগলার বাড়-বাড়ন্ত অবস্থার সঙ্গে তাঁর পত্নীর এখনো পূর্ববৎ সহৃদয়তা তাঁকে অভিভূত করল।

বাড়ির দেউড়িতে ঢুকেই 'বগলা সাহেব'এর আদব-কায়দার ঘটা দেখে পশুপতি যে ভাবে হতচকিত হন, ভিতর মহলে উপস্থিত হবামাত্র বাড়ির গৃহিণীর আন্তরিকতাপূর্ণ আদর-আপ্যায়নে সে ভাবটা কেটে যায়। তিনি তখন এইটুকু জেনেই আশ্বস্ত হলেন যে, অবস্থার কল্পনাতীত পরিবর্তন হলেও, অন্ততঃ বগলার গৃহিণীর প্রকৃতি আগেকার মত তেমনি আছে—একটুও বদলায় নি। বিপত্নীক পশুপতিকে প্রথম দেখেই তাঁর পত্নীশোকে যেভাবে বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন, সেটি কৃত্রিম যে নয়—পল্লীঅঞ্চল সুলভ স্বাভাবিক, পশুপতির মত পণ্ডিত ব্যক্তি সেটি উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। তারপর, পরমাত্মীয়ের আকস্মিক উপস্থিতিজনিত আত্মতৃপ্তির আবেগে ব্যগ্র ভাবে তাঁর প্রাথমিক পরিচর্যার জন্য যেরূপ ব্যস্ত হয়ে উঠেন, অন্তঃপুর-সংলগ্ন সুসজ্জিত কক্ষে আরাম কেদারায় তাঁকে বসিয়ে, দাসদাসীদের উদ্দেশে হাঁক-ডাক শুরু করে দেন, তদ্দৃষ্টে পশুপতির মনে সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়—তবে কি তাঁর সেদিনের পত্র এঁদের হস্তগত হয় নি? কারণ, অতিথি-সৎকারে গৃহিণীর ব্যগ্রতায় একটা অতিত্বরিত চাঞ্চল্যের আভাস পেয়ে, পশুপতির পক্ষেও এভাবে সন্দিগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু গৃহিণী ব্যস্ততার মধ্যেই একটু সুযোগ করে নিয়ে নিজেই নিকটে এসে পশুপতিকে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন: বিশ্বাস করুন পণ্ডিত মশাই, অন্য সময় না হোক—পুজোর ঘরে সেঁধুলে, এমন দিন নেই—আপনার কথা, সইয়ের কথা, ললিতের কথা না ভেবেছি। পূজার পর দেবীকে রাণীকে যেমন নিত্যই আশীর্বাদ করি, ললিতকেও ভুলি না। অথচ, এমনি আশ্চর্য যে, খবর নেওয়া হয়ে ওঠে না; আর উনি মুখ বুজিয়ে থাকেন ব'লে, আপনিও খোঁজখবর নেন না, দোষ অবিশ্যি আমাদের, তাই আপনাকে এর জন্যে—

পশুপতি শুনতে শুনতেই চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। এখন সুলোচনা দেবীর কথায় বাধা দিয়ে বললেন: বিলক্ষণ! আমি খোঁজখবর নিইনি—বললেন কেন

বুঝলুম না ত'? পর পর অনেকগুলো চিঠি আমি লিখেছি বগলাকে, খামে লেখা চিঠি—নিজের হাতে ডাকবাক্সে ফেলেছি। কোন চিঠির জবাব না পেয়ে, মাস কয়েক আগে আপনার নামেও সব কথা লিখে এক চিঠি পাঠাই—

সুলোচনা দেবী গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন: আমার নামে চিঠি পাঠিয়েছিলেন—বলেন কি?

মুখখানা একটু কঠিন করে পশুপতি বললেন: আমি যে মিথ্যা বলি না, সে ত' আপনি জানেন দেবীর মা! এখন বুঝছি, আমার সে চিঠি তবে পান নি। আচ্ছা, সে যেন গেল—কিন্তু হালে, কলকাতায় রওয়ানা হবার দু'দিন আগেও আমি আর এক চিঠি পাঠিয়েছি—আপনারই নামে। তাতে আমার আসবার কথাটাই বড় করে লিখেছিলুম। তবে কি—

সুলোচনা দেবীর সুন্দর মুখখানা পলকে বিবর্ণ হয়ে গেল, চোখ দুটো কপালে তুলে এক মর্মন্তুদ ভঙ্গিতে বললেন: আমি যে আকাশ থেকে পড়ছি পণ্ডিত মশাই?

একটা নিশ্বাস ফেলে পশুপতি বললেন: আপনি যে এ চিঠিও পাননি, এখানে আমি আসতেই আপনাদের ব্যস্ততা দেখে আমার মনে সে সন্দেহ হয়েছিল। যাক, তা হলে বোঝা যাচ্ছে, ঠিক ঠিকানাতে পাঠানো সত্ত্বেও চিঠিগুলো সব মারা গেছে। যাক্ গে! এর জন্তে একটা দিক ভেবে আমি এই আনন্দ পাচ্ছি—চিঠির জবাব না পেয়ে মনে মনে যে সন্দেহটা জেগে উঠছিল, সেটা ভুয়ো। আসুক বগলা, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই বোঝা যাবে, কেন চিঠিগুলো এখানে আসেনি!

সুলোচনা দেবীর বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। আশ্চর্য, এই ভদ্রলোক বরাবর চিঠি পাঠাচ্ছেন, তাঁর নামেও দু'-দু'খানা চিঠি লিখেছেন—একখানাও পাওয়া গেছে বলে তিনি কর্তার কাছ থেকে শোনেননি! দেশের সম্বন্ধে, এঁদের সম্বন্ধে, তাঁর এখন যে রকম মতিগতি সে ত' সুলোচনা দেবীর অজ্ঞাত নয়—ইদানীং প্রশান্তর উপর ঝুঁকে তিনি যে আগেকার কথা চাপা দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন, তার জন্তে মিথ্যারও আশ্রয় নিয়ে থাকেন, সুলোচনা দেবী তারও অনেক প্রমাণ পেয়েছেন। এ অবস্থায় পণ্ডিত মশাইয়ের চিঠিগুলি

এখানে এলেও চেপে রাখা তাঁর পক্ষে এখন কিছুমাত্র বিস্ময়ের কথা নয়। নীরবে মুখ, চোখ ও ভঙ্গিতে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতেই, পশুপতি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন : আমি দেখছি, এসেই আপনাকে ভাবিয়ে তুললাম। ছেড়ে দিন ও কথা, আমি বেশ জেনেছি, চিঠি আপনি পাননি। আসুন, এখন আর সব কথা শুনি, লম্বা বারোটা বছরের কথা, কত জানবার আছে। ভালো কথা—মেয়েরা কোথায়, তাদের কাউকে দেখছি না ত' ?

সুলোচনা দেবী মৃদুস্বরে রাণীর শান্তিনিকেতনে যাবার কথা বলেই তারপর দেবীর কথা তুললেন। তার ছেলেবেলার অসুখ, আর সে অসুখ যে ললিতের জন্তে ভেবে ও কেঁদিয়ে হয়েছিল, সে কথাও বললেন। আরও বললেন যে, ছেলে-বেলায় দেবী যেমন চটপটে আর চালাক চতুর ছিল, এখন হয়েছে তার উল্টো—ঐ অসুখের পরই এটা হয়েছে ; শুনে অবাক হবেন—আগেকার কিছুই মনে করতে পারে না। রাণী লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে গেছে, গ্রাজুয়েট হয়ে এম, এ পড়ছে। দেবীর ত' পড়াশোনা বন্ধই হয়, আমি ওকে রামায়ণ মহাভারত দেবীপুরাণ ভাগবত এই সব পড়াতে থাকি ; পড়তে পড়তে ক্রমে ক্রমে মাথা একটু একটু খুলতে থাকে ; এরপর বাড়িতে পড়েই প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে। আমার ইচ্ছা ছিল না আর বেশী এগোয় ; কিন্তু উনি দেবীকে মেয়েদের কলেজে ভর্তি করে দেন ; সেখানে আই, এ পড়ছে। খেয়ে দেয়ে কলেজে গেছে দেবী।

খুব সংক্ষেপে মেয়েদের কথা, বিশেষ করে দেবীর কথা পশুপতিকে শুনিয়ে দিলেন সুলোচনা দেবী। কিন্তু এ সময় মুখের ভাব জোর করে চেপে রেখে বুকের ভিতর সঞ্চিত দুশ্চিন্তার ঝঞ্ঝাবেগকে তিনি যে সবলে ঠেকাচ্ছিলেন, সামনে থেকেও পশুপতি কিছুতেই ধরতে পারেননি। দেবীর সম্বন্ধে স্বামীর মনোভাব ও সিদ্ধান্ত তাঁর ত' অবিদিত নয়। অথচ স্পষ্ট করে সে-কথা এখনো পর্যন্ত তিনি এই নিরীহ অদৃষ্টবিশ্বাসী ঋষিকল্প পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে জানানোও প্রয়োজন বোধ করেননি। স্বামী যে এ-হেন নির্ভরশীল মানুষের চিঠিগুলিও আত্মসাৎ করে নিশ্চিন্ত রয়েছেন—বিবেকের শাসনে চক্ষুলজ্জার আবরণটি উদ্‌ঘাটিত করতেও সঙ্কুচিত, কাজি কলঙ্কে সেই লজ্জা-

ভক্তের খোষপাটি চিঠির কাগজে ফুটিয়ে তুলতেও যাঁর হাতখানা কোন দিন আড়ষ্টতা কাটাবার মত শক্তি পায়নি, আজ এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে কি করে তিনি সেই অবাঞ্ছিত মানুষটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখের পরদা খুলে ফেলবেন—এই চিন্তাই এখন সুলোচনা দেবীকে ক্লিষ্ট করতে লাগল। এরই মধ্যে তিনি ইষ্টদেবীকে উদ্দেশ করে মনে মনে মিনতি জানালেন—এ সঙ্কটে তুমিই মুখ রেখো মা আমাদের প্রত্যেকের, ধর্ম ন্যায় ও সত্যের খাতিরে। এ সঙ্কটে আজ আমার মত অভাগীকেও বড় দুঃখেই বলতে হচ্ছে মা—যেখানে ধর্ম, সেখানে ন্যায়, সেইখানেই সত্য—এরাই জয়ী হোক।

সহসা আত্মস্থা হয়ে, নিজেকে সামলে নিয়ে সুলোচনা দেবী বললেন: ললিতের কথা বলুন। আগেই আমার উচিত ছিল তার কথা তোলা। কিন্তু সে ত দু' কথায় হবে না! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবই যে আমাকে শুনতে হবে—কেমন আছে, মায়ের যে বড় ন্যাওটো ছিল সে; শুনিছি কাশীতে পাঠিয়েছেন বাছাকে, সেখানে কে দেখাশোনা করছে, পড়াশোনায় কত দূর এগোলো, আমি সব শুনব গোড়া থেকে। আগে আপনার খাবার ঠাঁই করে দিই। খেতে খেতে আপনাকে বলতে হবে পণ্ডিত মশাই! ঐ সঙ্গে দেশের কথাও সব শোনবার জন্যে আমার মনে যে কি হচ্ছে, সে মুখে বলতে পারব না।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সুলোচনা দেবী শুদ্ধাচারী আত্মীয়কল্প অতিথির জন্য আহার্যের যে আয়োজন করেছেন, সেটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। স্নানান্তে পশুপতি পণ্ডিতের সামনে তাঁর নিত্যকার প্রিয় জলখাবার—বাড়িতে কাটানো ছানা ও চিনি এবং দু'-চারটি বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন রূপার রেকাবে সাজিয়ে দিয়ে বললেন—অনেক দিন পরে হলেও আপনি খেতে যা-যা ভালবাসতেন, আমার মনে আছে। রান্নাও আমি নিজের হাতে করছি; কাউকে হাত দিতে দিইনি। দেবীও রান্না-বান্না শিখেছে; ওবেলা আপনার জন্যে মোহনভোগ আর কচুরী তৈরি করবে।

এত বেলায় জলযোগে অনিচ্ছা জানালেন পশুপতি। কিন্তু সুলোচনা দেবী পীড়াপীড়ি করায় বিশেষতঃ তাঁর সাধের খাস্ত ছানাটুকুও স্বহস্তে তৈরি

করে আনায় তিনি অভিভূত হয়ে বললেন : তাহলে আর আলাদা নয়—অন্ন-ভোগের সঙ্গেই এগুলো উপভোগ করা যাবে।

একটু পরে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন দেখে সবিস্ময়ে বললেন : করেছেন কি—এ যে রাজভোগ! আমার চেনা খাদ্যগুলি ত আছেই, তার ওপর যে সব দেখছি, চিনিনা, নামও জানি না—কখনো খেয়েছি বলে মনে হয় না; এত সব খাওয়া কি আমার সাধ্য?

সুলোচনা দেবী আন্তরিকতার সঙ্গে জানালেন : তাড়াতাড়ি করে যা পেরেছি করেছি। মায়ের দয়ায় আজ কত কাল পরে আপনার জন্যে রাঁধবার সৌভাগ্য হয়েছে। তাড়া ত নেই, আপনি আস্তে আস্তে খান, আর খেতে খেতে সব বলুন—আমি শুনি।

রূপার মত শুভ্র কাঁসার থালায় পরিপাটি ভাবে বিন্যস্ত চাঁদির কণার মত সুদৃশ্য সুগন্ধি অন্নের সঙ্গে চার পাশে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নের পাত্রগুলির উপর মুগ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করেই পশুপতি ভাবার্দ্র স্বরে বললেন : আপনার সইয়ের পরলোকগমনের পর এত দরদ দিয়ে আর কেউ এ অভাগাকে খাবার জন্য সাধাসাধি করেছেন বলে মনে পড়ে না। জন্মতিথি, আর পাল-পার্বণে তিনিই এমনি করে সব সাজিয়ে কাছে বসে খাওয়াতেন। আপনার যত্ন দেখে আনন্দে আমার চোখ দুটো ভরে যাচ্ছে। এখন আশা হচ্ছে—দেবী বধূরূপে গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসে হয়ত এমনি আনন্দই দেবেন। অন্তরের কথাই আপনাকে বলছি, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমার জন্য যে আয়োজন করেছেন, যে সব আহার্য বাটি ভরে চার পাশে সাজিয়ে দিয়েছেন, আমার পক্ষে এ সব এখন সত্যই দুর্লভ। তাহলেও বলব—এদের চেয়ে আপনার যত্ন আমাকে বেশী মুগ্ধ করেছে। যাক, এখন আপনার কথাই রাখছি; দেশের কথা সব আপনি জিজ্ঞাসা করতে থাকুন, আমিও খেতে খেতে বলে চলি।

এর পর সুলোচনা দেবী যদিও প্রথমে তাঁর সইয়ের প্রসঙ্গে কথা তুলে ললিতের পড়াশোনা ও মতিগতির খবর সব জেনে নিলেন, কিন্তু হরগৌরীপুর থেকে চলে আসার পর আগাগোড়া তাঁর জানা ও চেনা ঘরগুলির প্রত্যেকের কথা এর পর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, জবাব

দিতে দিতে কেবলই পশুপতির মনে হতে লাগল—এক যুগ কাল গ্রামের সংস্পর্শ ছেড়ে এলেও এই মহীয়সী মহিলাটির মানস-চক্ষুর উপর সারা গ্রাম-খানি যেন আরও খাড়া হয়ে আছে!

পশুপতির ভোজন সাঙ্গ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুলোচনা দেবীর প্রশ্নের ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেল। কিন্তু এই সংলাপ থেকেই তিনি অনেক দিন আগে ছেড়ে-আসা গ্রামখানির পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি দিব্যদৃষ্টিতে আগাগোড়া দেখে এই উপলব্ধি করলেন যে, এই কয় বছরে কলকাতা শহর যে ভাবে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে তুলনায় তাঁদের সেই পরিচিত গ্রাম-খানি বিবিধ প্রাকৃতিক শোভা ও পণ্যসম্ভারের উৎপন্ন ক্ষেত্র হয়েও আধুনিকতার দিক দিয়ে তেমনি পিছিয়েই আছে। শহর থেকে গ্রামখানির দূরত্ব খুব বেশী না হলেও, আধুনিক দ্রুতগতি যানবাহনের অভাব তার অগ্রগতির পথ বিঘ্নিত করে রেখেছে। শিক্ষার পথ কিছুটা উন্মুক্ত হলেও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নয়—আরও শ্রীবৃদ্ধির অপেক্ষা রাখে। গ্রামের মধ্যে যাঁরা সৌভাগ্য বশতঃ সঙ্গতিপন্ন হয়ে উঠেছেন, তাঁরাই তাঁর স্বামীর দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে গ্রামের সংস্পর্শ কাটিয়ে শহরে আস্তানা পেতেছেন, এতে গ্রাম কি করে উন্নত হবে? তবে একটা বিষয়ে সুলোচনা দেবী এমন কিছু খবর পেলেন, তাঁর পক্ষে বর্তমানে সেটি যেমন অভিনব, তেমনি ভাববার মত। এই দীর্ঘকাল ধরে যে ব্যাপারটি দারুণ এক সমস্যার মত তাঁর সমস্ত নারীঅন্তরে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়—জাগরণে, চিন্তায়, নিদ্রায়, স্বপনে যেটি তাঁকে নিবিড়ভাবে ঘিরে রেখেছে—ঠাকুরঘরেও দেবার্চনায় সময় ধ্যানের সঙ্গে মূর্ত হয়ে ওঠে, অনেক—অনেক আগে গ্রামের হরগৌরী-মন্দিরে নীলের উৎসব-সন্ধ্যায়-দেখা সেই শিশু হর-গৌরীর যুগল মূর্তি, আর খেলার ছলে দুই শিশুর সেদিনের মিলনকে সার্থক করবার জন্য দেবতার স্থানে তাদের মাতৃদ্বয়ের প্রতিশ্রুতির সেই স্মৃতি এখনো পর্যন্ত অমর হয়ে সেদিনের সাক্ষী স্বরূপা গ্রামের মায়েদের মনগুলি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আজ অকস্মাৎ পশুপতি পণ্ডিতের আবির্ভাব-সূত্রে তাঁর সঙ্গে সময়োচিত সংলাপ সহসা যেন ভবিতব্যের ইচ্ছাতেই একটা দিকের পর্দাখানা হঠাৎ সরিয়ে দিতেই

তারই ভিতর থেকে অতীতের অসংখ্য স্মৃতি যেন কিলবিল করে বেরিয়ে এসে সুলোচনা দেবীকে ছেঁকে ধরেছে। বালিকা দেবীর ছবি নিয়ে ললিতের বাল্যলীলায় গভীর ভাবোন্মাদনা, কৈশোর থেকে এখন পর্যন্ত অধ্যয়নের সঙ্গে একই ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে তার আলেখ্য-সাধনা—রাধার মুখে শোনা কথাগুলি পণ্ডিত মশাই এমন ভাবে আগ্রহশীলা শ্রোত্রীকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, শুনতে শুনতে তাঁর মনে হতে থাকে যেন নিজেই কাছে থেকে ভাবার্দ্র দৃষ্টিতে প্রতিটি বস্তু প্রত্যক্ষ করছেন। এখন এই আকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে কি ভাবে অতিক্রম করবেন তিনি এবং এই মিলন সম্পর্কে একান্ত অনিচ্ছুক তাঁর সঙ্কল্পদৃঢ় স্বামী! কেমন করে তিনি তাঁর গৃহাগত সেদিনের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদটিকে প্রত্যাখ্যান করবেন—কোন ভাষায় তাঁর মুখের প্রতি-শ্রুতিকে প্রত্যাহার করে বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততাকে চরম আঘাত দেবেন? তার পর, এই অপ্রীতিকর অবস্থার প্রতিক্রিয়া যদি দেবীর অবচেতন মনের দরজা সবলে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় এবং অতীতের লুপ্তস্মৃতি যদি সেখানে সংজ্ঞার আলোকপাত করে, তখন কি হবে? কল্পনাকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে, সবলে তার গতিপথ রুদ্ধ করে সুলোচনা দেবী সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তির কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন। এ ভিন্ন তাঁর আর উপায়ই বা কি!

২৩

বগলাপদ এদিন খুবই ব্যস্ত। স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে এ বয়সেও তিনি কঠোর পরিশ্রমে কুণ্ঠিত নন। সতীনাথ রায় ও শরদিন্দু চক্রবর্তী নামে দুই জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সঙ্গে অফিসে ব্যবসায়-সম্পর্কে আলোচনার কথা থাকায়, বেলা দশটার আগেই আহারাদি সেরে বগলাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। সেখানেই কথা-বার্তায় প্রকাশ পায়, আগন্তুকরা প্রশান্তর মাতুল অরবিন্দ বাবুর আত্মীয়স্থানীয় বিশিষ্ট বান্ধব। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি বগলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর কন্যা দেবীর সঙ্গে ভাগিনেয় প্রশান্তর বিবাহের প্রসঙ্গও পত্রযোগে এঁদের দুজনকেই জানিয়েছিলেন। সে-সময় গুর্জর প্রদেশে ইতিহাস-বিশ্রুত সোমনাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে-সব বিরাটায়তনের হর্ম্যাদির নির্মাণকার্য চলছিল, এঁরাও কনট্রাক্টর রূপে সেই বিরাট ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উভয়েই দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থপতি-বিজ্ঞানে শিক্ষিতপটু বিচক্ষণ ব্যক্তি। আত্মীয়-বন্ধু অরবিন্দ বাবুর পারিবারিক দুর্ঘটনা ও অবশেষে তাঁরও আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁরা যেমন আঘাতপ্রাপ্ত হন, পক্ষান্তরে বোগলা সাহেবের মত ভাগ্যবান ও সম্ভ্রান্ত শিল্পপতি প্রশান্তর শ্বশুর ও অভিভাবক হবেন জেনে বিশেষ উৎফুল্ল ও আশান্বিত হয়ে ওঠেন। অরবিন্দ বাবু যে ভাগিনেয় প্রশান্তকে বিলাতে শিক্ষার্থী-রূপে স্থপতি-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিয়েছিলেন—কলকাতায় স্থপতি শিল্পায়ন সম্পর্কে একটা বড় রকমের প্রতিষ্ঠান গঠনের আশা পোষণ করেই, এবং সে-সম্পর্কে আত্মীয়স্থানীয় দুই অভিজ্ঞ বন্ধুর সহযোগিতা-প্রাপ্তি সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত ছিলেন—তাঁরই লিখিত পত্রগুলি পাঠ করে বগলাপদ শুধু যে নিঃসন্দেহ হলেন, তা নয়, এ হেন কৃতবিদ্য, কর্মসিদ্ধ ও অর্থশালী শিল্পপতিদের সহযোগিতায় সেই প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির গঠন-ব্যাপারে

আগ্রহান্বিত হয়ে নিজেই প্রস্তাব করলেন: তাহলে আসুন, আমরা চার-জনে মিলে প্রতিষ্ঠানটির পত্তন করি। প্রশান্ত ফিরে এলেই কাজটা শুরু করা যাবে। উপস্থিত আমরা তিন জনে মিলেই খসড়াটা তৈরি করে ফেলি।

সতীনাথ ও শরদিন্দু সম্মত হয়ে বললেন: তাহলে শুভস্য শীঘ্রম্—পরিকল্পনার কাজটা আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক।

অফিসে বসেই তিন অভিজ্ঞ শিল্পপতি বহুক্ষণ ধরে যুক্তি-পরামর্শের পর মূল পরিকল্পনাটির তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করলেন। আফিসেই কাজের মধ্যে বৈকালী চা ও জলযোগের প্রথম পর্ব শেষ হলো বোগলা সাহেবের সুব্যবস্থায়। এর পর আরো কিছুক্ষণ ধরে খসড়ার অবশিষ্ট সূত্রগুলি সংগ্রহের কাজ শেষ হতেই ঘড়িতে তিনটে বাজল। বগলাপদ সচকিত ভাবে বললেন: অনেক দিন একাসনে বসে একনাগাড়ে এ ভাবে কাজ করিনি। দেহ মন শ্রান্ত হলেও ভারি আনন্দ পাওয়া গেল। এখন গা তোলা যাক—খসড়াটা বাড়িতে আমার প্রাইভেট চেম্বারেই টাইপ করা হবে। তার পরেই কুটুম্বিতা—

সতীনাথ বাবু সহাস্যে বললেন: তার মানে?

বগলাপদ জানালেন: এতক্ষণ ত বিজনেস অর্থাৎ নতুন বাণিজ্যের গোড়া-পত্তন হলো। কিন্তু যে মধুর সম্বন্ধটাকে উপলক্ষ করে বাণিজ্যের ভিত তৈরি করা গেলো, সে দিকটা চোখেও দেখেননি। তাহলে বলি শুনুন—মিষ্টি-মুখের পরেই আপনাদের ভাবী বধূর মুখখানাও দেখতে হবে। ততক্ষণে কলেজ থেকে সে ফিরে আসবে। আপনারা দু'জনেই যখন অরবিন্দদা'র পরমাত্মীয়, এরপর প্রশান্তর পক্ষ থেকে আমার কন্যা দেবীকে আপনারাই পাকা দেখার দিন আশীর্বাদ করবেন।

উভয়েই প্রসন্নমনে কথাগুলি শুনলেন। শরদিন্দু বাবু হাসতে হাসতে বললেন: খুব ভালো কথা, যদি দয়া করে ও-ভার দেন, আমরা সত্যই ভারি আনন্দ পাব।

বগলাপদ বললেন: দেখুন, এ দিকটা মনে হলে বড়ই কষ্ট পেতাম। যখনই ভাবতাম, প্রশান্তর পক্ষে বরকর্তা হয়ে দাঁড়াতে কেউ নেই, নিজেই সে

ঘর, নিজেই বাড়ির কর্তা—এটা তখন বড় দৃষ্টিকটু ঠেকত। কিন্তু আমার সেই দুঃখ বুঝেই ভগবান ঠিক সময়ে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটালেন। আমরাও দু'ঘর বড় রকমের কুটুম্ব পেলাম।

সতীনাথ বাবু বললেন: অর্থের দিক দিয়ে অরবিন্দ মস্ত ভাগ্যবান হলেও সাংসারিক ব্যাপারে তার দুঃখের কথা ভাবলে বুকখানা সত্যই দমে যায়। অন্তর্যামী সেটা বুঝেছিলেন, তাই তাঁরই উত্তরাধিকারীর পিছনে আমাদের টেনে এনে দাঁড করিয়ে দিয়েছেন।

এই ভাবে আলোচনা করতে করতেই সকলে উঠে পড়লেন। সোফার গাড়ি বার করে প্রতীক্ষা করছিল, তিন জনেই উঠে বসলেন। বোগলা ভিলা লক্ষ্য করে গাড়ি ছুটল।

দেউড়ির ভিতর দিয়ে গাড়ি বাড়ির বারাণ্ডার নীচে থামতেই উর্দীপরা চাপরাশি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে গাড়ির দরজা খুলে দিল। গাড়ি থেকেই বগলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: বড় দিদিমণি কলেজ থেকে ফিরেছে?

চাপরাশি পুনরায় অভিবাদন করে বলল: না হুজুর, এখনো তিনি ফেরেননি।

বন্ধুদের অভ্যর্থনা করে বগলা সোপান-পথে উপরে উঠতে লাগলেন। উপরের বেয়ারা তাঁকে দেখেই ছুটে এসে অভিবাদন করতেই বগলা তাকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি ফরমাস করলেন আবদুলের উদ্দেশে। আর এক দফা অভিবাদন করে সে বাবুর্চিখানার দিকে ছুটল। নিজের চেম্বারে সবান্ধব প্রবেশ করে এবং উভয়কে বসিয়ে বগলা তাঁর রিভলভিং কেদারায় বসতে বসতে বললেন: লোকজন আসবার আগেই আমরা খসড়ার কাজটা সেরে ফেলব।

সতীনাথ ফাইলটা খুলতে খুলতে বললেন: পয়েন্টস্‌গুলো আইটেম বাই আইটেম টাইপ করতে পারলে—

এখনি সে ব্যবস্থা করছি।—বলেই বগলা কলিং বেল টিপে দিলেন।

পরক্ষণে পাশের কামরা থেকে তাঁর কেরাণী অবনী ছুটে এসে মাথা নীচু করে বলল: ইয়েস স্যার!

বগলা সতীনাথ বাবুর কাছ থেকে প্রাপ্ত লেখা কাগজগুলি অবনীকে দিয়ে

বললেন : শীগ্‌গির টাইপ করে আনো। এর পর একটা প্রসপেক্টাস্ টাইপ করতে হবে।

মাথা নীচু করে সম্মতি জানিয়ে কাগজগুলি নিয়ে অবনী পাশের ঘরে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটিং মেশিনের শব্দে পাশাপাশি নিস্তব্ধ ঘর দু'টি মুখর হয়ে উঠল।

বগলাপদর এই খাস কামরাটি আধুনিক কায়দায় পরিপাটী রূপে সাজানো। এক দিকে রিভলভিং চেয়ার ও মেহাগনি কাঠের পালিশ করা দামী টেবল— বগলার বসবার স্থান। টেবিলের দু' পাশে চারখানা করে সুশ্রী হাতল দেওয়া কেদারা। একটু তফাতে শুভ্র আস্তরণ দেওয়া একখানা গোল টেবিল, তার উপরে ফুলদানি—সব সময় কোন না কোন মরশুমি ফুলের গুচ্ছে ভরা থাকে। এই টেবিলের চার দিকে এক একখানি একানে সোফা। কাজের সুবিধার জন্য বগলাপদ বন্ধুদের নিয়ে আগের আসন ছেড়ে এদিকে এসে বসলেন। এবং টেবিলের উপর তাঁদের পরিকল্পনার পাণ্ডুলিপি রেখে পাশে টাইপ সম্পর্কে নির্দেশগুলি রঙিন পেনসিল দিয়ে টুকে দিতে লাগলেন।

খানিক পরেই বাবুর্চি আবদুল আর একটি ছেলেকে নিয়ে চপ কাটলেট ডিমের পোচ প্রভৃতি আনুসঙ্গ উপকরণ সহ ডিসে ডিসে সাজিয়ে এনে গোল টেবিলে প্রত্যেকের কাছে কাছে এগিয়ে দিল। হঠাৎ এ ভাবে প্রচুর আহার্য দেখে দুই বন্ধু চমকে উঠে মৃদুস্বরে আপত্তিও তুললেন : এ কি কাণ্ড! এত সব কেন?

বগলা বললেন : কি আর এমন! সারা দিনটা ধরে খাটুনি গেছে, শরীরটাকে চাঙ্গা না করলে মাথা খুলবে কেন? চলুক—

কথাগুলি বলতে বলতে আবদুলের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বললেন : সোডা বরফ আর—

কেতা দুরস্ত ভাবে সেলাম করে আবদুল বলল : এখনি হাজির করছি হুজুর!

হুজুরের ইশারা বুঝেই সেই ভাবে জবাব দিয়ে আবদুল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই সোডা, বরফ ও গ্লাসগুলি একটা কিনারা উঁচু

ট্রের উপর সাজিয়ে দু' হাতে ধরে বিশেষ সন্তর্পণে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করল। সোডার বোতল ও গেলাসগুলির মাঝখানে বিশেষ ধরণের আর একটি বোতলের মাথার দিকটা অনেকখানি উঁচু হয়ে যেন সগর্বে আত্ম পরিচয় দিয়ে দুই বন্ধুর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

সতীনাথ সহাস্যে বললেন: কিছুই বাকী রাখেন নি দেখছি!

শরদিন্দুবাবুও স্মিতমুখে বললেন: সন্ধ্যের পরে হলেই ঠিক হোত—

বগলাপদ বললেন: সন্ধ্যার পরের ব্যবস্থাও আছে—আর একটা নতুন কোয়ালিটির চীজ! ওয়ারের পর এই প্রথম এসেছে।

আবদুলকে ইশারা করতেই লম্বা বোতলটির ছিপিটা সশব্দে খুলে ফেলে ভিতরের তরল পদার্থ গেলাসে গেলাসে ঢেলে দিতে আরম্ভ করল। সঙ্গের ছেলেটাও সোডার জল ও বরফ যোগান দিল। ডিসের ওপর কাঁটা চামচগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠল—সুপাচ্য আহার্য সম্ভারের সুবাসের সঙ্গে গ্লাসের তরল পদার্থের ঝাঁঝালো তীব্র গন্ধে ঘরখানা ভরে গেল।

ঠিক এই সময় রুদ্ধ কক্ষটির দরজা দু'টি সবলে ঠেলে দিয়ে প্রবেশ করলেন পশুপতি। খালি গা, পায়ে জুতা নেই, কাঁধে একখানা গামছা, মাথার পিছনে সুপুষ্ট এক গোছা শিখা, হাতে একখানা খবরের কাগজ।

স্বল্প দিবা নিদ্রার পরে বিছানায় উঠে বসে এদিনের কাগজখানি পড়ছিলেন তিনি। আহারাদির পরও কৈলাস নামে যে ভৃত্যটি তাঁর তদ্বির ও পরিচর্যা করে, পশুপতি তাকে বলেছিলেন যে, কর্তা বাবু বাইরে থেকে এলেই যেন তাঁকে খবর দেয়। নিদ্রা ভঙ্গের পর তিনিও গাত্রোত্থান করে সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করেছেন, এমন সময় কৈলাস তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল—'বাবু এসেছেন, বাইরের ঘরেই আছেন।'

খবরটা শুনেই পশুপতি সানন্দে উঠে পড়লেন। গায়ে জামাটা দিবার বা জুতা জোড়াটা খুঁজে নিয়ে পায়ে গলাবারও ফুরসদ পেলেন না। বগলা—এ বাড়ির কর্তা বগলা এসেছেন। বারো বছর পরে তার সঙ্গে এখনি দেখা হবে! এ কি বড় সাধারণ উল্লাসের কথা! মনে পড়ে গেল—গ্রামের চণ্ডী

মণ্ডপে সামনাসামনি মুখোমুখি বসে কত সুখ-দুঃখের কথা, কত গল্প গুজব, কত আলোচনা চলত দু'জনে। বারো বছর পরে আজ আবার—

সমস্ত অন্তরটা তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে—বগলা এসেছে! সেই বগলার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চলেছেন। তিনি যে এসেছেন, দিব্যি জমিয়ে নিয়েছেন, বগলা তার কিছুই জানে না, এখন তাকে দেখেই বিস্ময়ে-আনন্দে-হর্ষে সে একেবারে—

কৈলাস তফাত থেকে দরজাটি দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। পশুপতির মনেও তখন একটা কৌতূহল অদম্য হয়েছে যে, এই অবস্থায় তাঁকে অকস্মাৎ দেখে ও তাঁর মুখে সম্ভাষণ শুনে প্রিয় বন্ধু বগলাও কিভাবে হতচকিত হয়ে ওঠেন—সেটা দেখবার জন্যে। প্রায় এক যুগ পরে দেখা—একটা আনন্দময় পরিস্থিতির উদ্ভব হবারই কথা, এবং সেটি কি বড় সাধারণ উপভোগ্য বস্তু!

কিন্তু বগলার কক্ষে এভাবে প্রবেশ করে পশুপতিও হতচকিত হয়ে গেলেন—কেউ ত সেখানে নেই, আসনগুলি শূন্য অবস্থায় যেন তাঁকে ব্যঙ্গ করছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটা মিশ্র স্বর ও তীব্র গন্ধের আকর্ষণে অন্য দিকে দৃষ্টি পড়তেই বৈদেশিক পরিচ্ছদে পান-ভোজনে ব্যস্ত অবস্থায় যে তিন ব্যক্তির মূর্তি তাঁর চক্ষে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল—তন্মধ্যে বারো বছর পরেও বন্ধুবর বগলার মুখখানা তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারল না। এমন একটা অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেও তিনি অপ্রতিভ ভাবে অপহৃত না হয়ে পূর্বের পল্লীসুলভ অবাধ সৌহার্দ্যের মোহে একান্ত অসংকোচেই উচ্ছ্বসিত উল্লাসে সম্ভাষণ করলেন: এই যে বগলা—চিনতে পারছ হে?

বগলা তখন উপর্যুপরি কয়েক পাত্রের পর আর এক পাত্র পানীয় মুখ-সংলগ্ন করেছেন, সহযোগী বন্ধুদ্বয়েরও একই অবস্থা—এমনি সময় এই কাণ্ড। এক যুগ পূর্বের সম্বন্ধটাকে সহায় করে পল্লীগ্রামের সেই অবাঞ্ছিত লোকটাই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে অতি সাধারণ ও নিতান্ত বিশ্রী বেশে তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে পরমাত্মীয়ের মত সম্ভাষণ করছে। একেই তাঁর মস্তিষ্কের ভিতরটা তপ্ত হয়ে উঠেছে তখন এবং সেই প্রতপ্ত স্নায়ুপুঞ্জের মধ্যে বাণিজ্যগত পরিকল্পনার পটভূমিকায় পারিবারিক যে সম্ভাবনাটিও ফুটি ফুটি করছে—

উপস্থিত দুই বিশিষ্ট অতিথির রীতিমত সংযোগ রয়েছে তার সঙ্গে। অথচ একেবারে আসন্ন শুভ পরিস্থিতিটির একেবারে প্রতিকূল এই অবাঞ্ছিত অসভ্যটা অতীতের একটা সম্পর্কের ধুয়া ধরে দারুণ এক উপদ্রবের মত উপস্থিত! মানসিক এই উগ্র অবস্থায় বগলা আরো উগ্র ও উত্তেজিতভাবে এই আগন্তুক উপদ্রবটির অবসান ঘটাবার উদ্দেশে রূঢ় স্বরে বলে উঠলেন: যাও, যাও—বাইরে গিয়ে ব'স।

পশুপতির মনে হতে লাগল, তাঁর পায়ের তলা থেকে এত বড় ঘরখানার কার্পেটমণ্ডিত মেঝেটা বুঝি সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অতি কষ্টে নিজের বিক্ষুব্ধ চিত্তটাকে সামলে নিয়ে তিনি এবার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও উঁচু করে বললেন: বাইরে বসব! কাকে বলছ তুমি এ কথা? চিনেছ আমাকে—হরগৌরী-পুরের পশুপতি হালদার! চিনেছ?

হাতের পানীয় ভরা গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে বগলা তেমনি উপেক্ষা ও উদ্ধত স্বরে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ—চিনেছি বলেই ত' ও কথা বলতে হয়েছে। মরবার বয়স হতে চলল, অথচ এখনো এটিকেট শেখনি, আধুনিক হওনি। ভদ্রলোকের প্রাইভেট চেম্বারে খবর না দিয়ে হুট করে কোন আধুনিক ভদ্রলোক সেঁধোয় না—এ ভদ্রতা তোমার জানা নেই।

পশুপতির তখন সর্বাঙ্গ কাঁপছে, মাথার মধ্যে জ্বালা ধরেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কোনদিনই তাঁকে এমন এক কদর্য অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় নি; কেউ এমন উদ্ধত ভাবে তাঁর নিজস্ব ভদ্রতাবোধকে আঘাত দিয়ে অপদস্থ করতে সাহস পায়নি। মনে সংশয় জাগল, তিনি জেগে আছেন ত'? এ অবস্থায় কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ বিকৃত ও শ্লিষ্ট করেই তিনি পুনরায় বললেন: চমৎকার। গৃহাগত পূর্বপরিচিত আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি তোমার এই ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে, তুমি সত্যিই মিষ্টার বোগলা সাহেব—বগলা সমদ্দার নও। সে বগলা মরে গেছে, তুমি তার প্রেতাত্মা।

তর্জনের ভঙ্গিতে বগলা এবার হুমকী দিলেন: বাইরে যাও তুমি—তোমার বক্তৃতা শোনবার সময় নেই আমার! কে তোমাকে এখানে—বেয়ারা, বেয়ারা—

সে চীৎকারের ধ্বনি বায়ু তরঙ্গে মিশতে না মিশতেই পূর্বের সেই বেয়ারা কৈলাস ক্ষিপ্র পদে কক্ষে এসে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করতেই বোগলা সাহেব উগ্র স্বরে কৈফিয়ৎ চাইলেন : হুঁস নেই বেয়াদপ—বিনা এত্তেলায় পাড়াগেঁয়ে এই অসভ্যটাকে—

বগলার কথায় বাধা দিয়ে গর্জন করে উঠলেন পশুপতি হালদার। তাঁর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার এবং সেই সঙ্গে আচারনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী পরিশুদ্ধ অন্তরের অভিব্যক্তি যুগপৎ আগ্নেয়গিরির গলিত তপ্ত ধাতু নিঃস্রবের মত সবেগে নির্গত হলো : থাম। ওর কোন দোষ নেই আমিই জোর করে তোমার ঘরে আসি। ভেবেছিলুম—আমাকে দেখে তুমি বর্তে যাবে, আহ্লাদে ছুটে এসে—যাক্! এখন বুঝেছি, তোমার অন্তঃপুরে আর এই চেম্বারে কত ব্যবধান! সেখানে মা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হলেও, এখানে অনাচার, মিথ্যা আর শাঠ্য। আমাকে তুমি আধুনিকতার খোঁটা দিচ্ছ; কিন্তু আমি দেখছি—তোমার এই ঐশ্বর্য, নাম ডাক, এসবও—ময়ূরের পুচ্ছ পরে তুমি ঝুটো আধুনিক সেজে বসে আছ। ভুয়ো, এর তলায় শুধু বালি, বগলা সমদ্দারের যে মূলধনটুকু ছিল, তাও নেই—খুইয়ে ফেলেছ। তাই আমারো স্থান এখানে নেই।

কৈলাস বেচারী অবাক হয়ে গিয়েছিল, একই লোকের প্রতি বাড়ির গিন্নী ও কর্তার পৃথক ব্যবহার দেখে। তবে কি কসুর হয়েছে তার কাজে? পশুপতি সেটা বুঝতে পেরেই যেন তাকেও নিশ্চিন্ত করে দিলেন। সহসা তার দিকে চেয়ে কণ্ঠস্বর নরম করে বললেন : তুমি বাপু আমাকে বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দেবে চল।

পরক্ষণে রুদ্ধ দরজার হাতলটা টেনে নিজেই দরজা খুলে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কৈলাস প্রভুর দিকে একবার তাকাল, এবং তাঁর দৃষ্টিতে কোন ইঙ্গিত নেই বুঝে সেও বেরিয়ে গেল।

কক্ষের বাইরে এসে বেহারার সাহায্যে শয়ন কক্ষ থেকে নিজের জামা, চাদর, পাদুকা, ছাতা ও ব্যাগটি আনিয়ে পশুপতি নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। কৈলাস বেচারী এই মানুষটির প্রতি বাড়ির গৃহিণীর বিপুল শ্রদ্ধাভক্তির সমারোহ কাণ্ড লক্ষ্য করেছিল কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। অথচ

সাহেবের কামরায় সেই সম্মানিত মানুষটির লাঞ্ছনারও সে প্রত্যক্ষদর্শী। তথাপি এভাবে গৃহত্যাগের পূর্বে গৃহিণীর সঙ্গে তিনি যাতে আর একবার সাক্ষাৎ করেন, সে সম্বন্ধে কৈলাস খুব ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু এদিন অনেক বেলায় আহারাদির পাট শেষ হওয়ায় অনেকটা অ-বেলাতেই অভ্যাসমত গৃহিণী শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে যান। তখনও তাঁর কক্ষদ্বার রুদ্ধ দেখে কৈলাস বেচারী তাঁকে জাগ্রত করে খবরটা দিতে আর সাহস করে নি।

বগলার কক্ষে এভাবে যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হবে, পশুপতির পক্ষেও সেটা একেবারে কল্পনার অতীত। গৃহিণীর আদর আপ্যায়ন তাঁকে মুগ্ধ করে। বগলার কাছেও এমনি আত্মীয়সুলভ মধুর ব্যবহারই তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন। বহুকাল পরে আবার দুই বন্ধুর আলাপে অতীতের দিনগুলি এবং তাঁদের প্রতিশ্রুতি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সে সম্বন্ধে পশুপতির মনে সন্দেহের কোন প্রকার ছায়াই পড়ে নি। বগলার বড় মেয়ে, ললিতের উদ্দেশে বাগ্‌দত্তা—দেবীকে দেখবার জন্য তাঁর মনে কি গভীর আগ্রহ! কিন্তু এক মুহূর্তেই সবই ওলট পালট হয়ে গেল।

সিঁড়ি অতিক্রম করে নীচের গাড়িবারান্দার সামনে পশুপতি সবে মাত্র এসেছেন, ঠিক সেই সময় একখানি মোটর এসে সেখানে দাঁড়াল। সেখানকার পরিচারক গাড়ির দরজা খুলে দিতেই কয়েকখানি বাঁধানো বই ও খাতা হাতে করে দেবী নেমে এল। পশুপতিও গাড়িবারাণ্ডা থেকে নীচে নামছিলেন, কিন্তু এই অপরূপা মেয়েটিকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। দুজনেই প্রায় মুখোমুখী—উভয়েরই অপলক-দৃষ্টি যেন যুগপৎ আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ হলো।

পশুপতিই এ-অবস্থায় আগেই সস্নেহে শুধালেন: তুমি দেবী না?

দেবীর চোখের পাতাগুলি এই প্রশ্নে কেঁপে উঠল, সেই সঙ্গে ভিতরের দু'টি তারাও যেন বড় হয়ে এই স্নেহপরায়ণ সৌম্যমূর্তি মানুষটির আগা-গোড়া দেখে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে দেবী উত্তর করল: আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই দেবী।

মনের বিক্ষোভ বিস্মৃত হয়ে পশুপতি সহর্ষে বললেন: আমি তাহলে ঠিক ধরেছি। ও! কত ছোটটি তোমাকে দেখেছিলাম, আর এখন তুমি কত বড়টিই হয়েছ! আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছ না মা? আচ্ছা, মনে করে দেখ দেখি—খুব ছোটটি তখন তোমরা, এ রকম শহর নয়—অজ পাড়াগাঁ সেটা—যেখানে থাকতে আর খেলতে তোমরা! ললিত-কে তোমার মনে পড়ে মা—তোমার ললিতদা'-কে? আমি তার বাবা।

দেবী একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে। নতুন দেখা লোকটির কথাগুলি কি মিষ্টি! কানে যেন সুধা বর্ষণ করল! তারপর তিনি যেই বললেন—'তোমার ললিতদা'কে মনে পড়ে?' অমনি কে যেন কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি সুরে একটা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দিল তার দু'টি কানের উপর। দেবীর কান থেকে সেই নামটা মনের মধ্যেও যেন জায়গা করে নিল—'ললিত দা'—নামটি খুব মিষ্টি না? কিন্তু কে তিনি? মনে ত পড়ছে না?··· মনে মনেই ভাবতে থাকে বইখানি হাতে করে একই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে সেখানে। কিন্তু তার মুখ থেকে একটি কথাও বেরিয়ে আসে না, কোন প্রশ্নও ওঠে না। আর, কি প্রশ্নই বা সে করবে? যা দেখছে, যা শুনছে—সবই যে নতুন! তার ত কিছুই জানা নেই, সে কি বলবে?

একইভাবে দেবীকে তাঁরই দিকে ভাবার্দ্র দৃষ্টিতে চেয়ে বিচিত্র এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, পশুপতিও ভাবলেন—মেয়েটার কি আগেকার কথা কিছুই মনে নেই, না—লজ্জায় চুপ করে আছে? সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনে বললেন—আমিও যেমন, আবার মিছিমিছি মায়া বাড়াচ্ছি! পরক্ষণেই একটু শক্ত হয়ে দেবীকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি তোমাদের বাড়িতেই এসেছিলুম, তোমার মা'র কাছেই সব শুনবে। তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা যত্ন করেছেন। তাতে আশা করেছিলাম মা···কিন্তু তার পর তোমার বাবার কাছে যে ব্যবহার পেলাম—যাক্ সে কথা। হ্যাঁ, তোমার মা'কে ব'লো যে, আমি বড় আঘাত পেয়েই চলে যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও পারলাম না—তবুও মনের এই অবস্থায় তোমাকে মা, দেখতে পেয়ে, আর তুমি দেবী জেনে, বড় আনন্দই পেলাম। হ্যাঁ, মাকে বলবে—আমি চিঠিতে সব জানাব।

উপরের বারাণ্ডা থেকে এই সময় কর্কশ কণ্ঠের একটা স্বর উঠল : দেবী, দেবী, কোথায় দেবী ?

কার কণ্ঠস্বর সেটা চিনতে কারো বিলম্ব হলো না। পশুপতি তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে নীরবে দেউড়ির দিকে চললেন। দেবীও ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

ওদিকে নিজের চেম্বারে পান-ভোজনের সময় পূর্বোক্ত অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বগলা পশুপতির সম্বন্ধে একটা কল্পিত উপাখ্যান শুনিয়ে দুই বন্ধুর কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন বটে, কিন্তু নিজের মনে শান্তি পেলেন না। এর পর পূর্বোদ্যমে টাইপের কাজ চলতে থাকে পাশের ঘরে, টাইপিষ্টকে স্থান বিশেষে নির্দেশ দেবার জন্য দুই বন্ধুও পাশের ঘরে গেলেন। বগলাও এই অবসরে হঠাৎ নিঃশব্দে উঠে পড়লেন। পল্লী-অঞ্চলের এককালের দরদী বন্ধু, নিরীহ মানুষটির প্রতি উত্তেজিত অবস্থায় কঠিন ব্যবহারের স্মৃতিটা তাঁকে তখন অস্থির করে তুলেছে।

বাহিরে এসে কৈলাসের মুখেই শুনলেন, পশুপতি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছেন। এই সময় নীচে থেকে আর এক জন ভৃত্য এসে খবর দিল : বড়দিদিমণি গাড়ি থেকে নামতেই সেই ঠাকুর মশাই তেনারে শুধাতে লেগেছেন হুজুর !

বগলাপদর মস্তিষ্কের রক্ত পুনরায় উষ্ণ হয়ে উঠল। তবে আরো কোন অপ্রীতিকর অবস্থা-সৃষ্টির দিকে না ঝুঁকে উষ্ণ প্রবৃত্তিকে সংযত করে সেখান থেকেই উচ্চকণ্ঠে দেবীর নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগলেন। তাঁর এ চাল সার্থক হলো। পশুপতি চলে গেলেন, দেবীও উপরে এসে বগলাপদর সামনে দাঁড়াল।

কন্যার কাছে একান্ত অপরিচিত ব্যক্তিটি সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে তিনি তাকাতেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কন্যাই নিজে জিজ্ঞাসা করল : উনি কে বাবা ? আপনি ওঁকে—

দেবীর মুখে কথাটা আটকে গেল। বগলা তার কথাটার অর্থ তৎক্ষণাৎ

বুঝেই বললেন : তাড়িয়ে দিয়েছি আমার চেম্বার থেকে। লোকটা স্রেফ পাগল। কবে কোন কালে গাঁয়ে কি কথা হয়েছিল, তাই মনে করে আকাশে প্রাসাদ তৈরি করেছে। খবর না দিয়েই আমার ঘরে গিয়ে—

কিন্তু এ পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন বগলা ; হঠাৎ মাথায় এল, এর পরের কথা কন্যাকে বলার অর্থই আসল কথাটা জানিয়ে দেওয়া। তাই কথাটা চাপা দিলেন, শেষ না করেই। এর পরই কন্যার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন : তুমি ভিতরে যাও মা, ও সব কথা নিয়ে আলোচনা করবে না। ভাল কথা, প্রশান্তর জন দুই আত্মীয় এসেছেন, খুব সম্ভ্রান্ত আর বড় লোক। তাঁরা তোমাকে আজ দেখবেন। আমিও একটু পরে ভিতরে যাচ্ছি।

নীরবেই দেবী ভিতরে চলে গেল।

অবেলায় শয্যার আশ্রয় নিতেই সুলোচনা দেবী ঘুমিয়ে পড়েন। উঠেই তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে বৈকালী জলখাবার সাজাতে বসেছেন তখন। তাঁর ধারণা, ললিতের বাবা এখনো শুয়ে আছেন ; দেবী এলে তাকে দিয়েই জলখাবার পাঠাবেন। বাইরের গোলযোগের কোন কথাই ভিতরে আসেনি ; সুতরাং তিনি সে সম্বন্ধে অন্ধকারেই রয়েছেন এ পর্যন্ত।

দেবী উপরে এসে পড়ার ঘরে বই-খাতা রেখে হাতমুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। খাবারগুলি সাজাতে সাজাতেই মা লক্ষ্য করলেন মেয়েকে। মেয়ের মুখখানা কেমন ভার, ভার। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করে সহজ ভাবেই বললেন : তোমার এক জ্যেঠামণি এখানে আজ এসেছেন পাড়াগাঁ থেকে। ও-ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন, বোধ হয় এতক্ষণ উঠেছেন ; তুমিই তাঁর খাবারটা নিজে নিয়ে যাও, আমিও যাচ্ছি। তোমাকে দেখলে ভারি খুশি হবেন। হ্যাঁ, খাবারের ডিস আর জল রেখেই গড় করো তাঁকে। আমিও তখনি গিয়ে পড়ছি :

মায়ের কথাগুলি থেকেই গাড়ি-বারাণ্ডার কাছে সেই সৌম্যমূর্তি লোকটির কথা দেবীর মনে আরো সুস্পষ্ট হলো। সে তৎক্ষণাৎ ভারাক্রান্ত মনেই জিজ্ঞাসা করল : তুমি দেখেছ মা, তিনি এখনো ঘুমাচ্ছেন ও ঘরে ?

কন্যার মুখের পানে অপাঙ্গে একটিবার চেয়ে মা বললেন : এ কথা জিজ্ঞাসা করলি যে বড় ?

দেবী বলল : আচ্ছা মা, যে-জ্যেঠামণির কথা বললে তাঁর মাথায় কি মস্ত একটা শিখা আছে, পণ্ডিতমশাইদের মতন জামা কাপড় পরেন, সঙ্গে আছে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, আর ছাতার ওপর শাদা কাপড়ের ঘেরাটোপ ?

সবিস্ময়ে মুখ তুলে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে গৃহিণী বললেন : ও ! তুই বুঝি তাহলে ও-ঘরে উঁকি দিয়ে তোর জ্যেঠামণিকে দেখে এসেছিস্ ? তাঁর ব্যাগ, ছাতি আর টিকিতেও নজর পড়েছে তাহলে ?

দেবী সহজ ভাবেই বলল : তুমি বলছ, তিনি এখনো ও ঘরে শুয়ে আছেন। কিন্তু আমি ত' গাড়ি থেকে নামবার সময় তাঁকে দেখিছি,—ব্যাগ আর ছাতি নিয়ে চলে যাচ্ছেন !

কথাটা শুনেই চমকে উঠে আহতকণ্ঠে গৃহিণী বলে উঠলেন : চলে যাচ্ছেন ! সে কি রে ? তুই ঠিক দেখিছিস ?

দেবী শান্ত কণ্ঠে বলল : হ্যাঁ মা, আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি দেবী না ? তার পর দুঃখ করে যে সব কথা বললেন, তাতে মনে হলো মা—বাবার সঙ্গে কি হয়েছে !

আর্তকণ্ঠে সুলোচনা দেবী আক্ষেপ করে উঠলেন : তবে বুঝি যে ভয় আমি করেছিলুম, তাই হয়েছে ! কাল হয়েছিল আমার ঘুমিয়ে পড়া। উনি ফিরেছেন শুনে, হয় ত নিজেই দেখা করতে যান, তাতেই—

দেবীর মুখের পানে চেয়ে সুলোচনা দেবী সহসা থেমে নিজেকে সামলে নিলেন। দেবীও, সেই নতুন ধরনের মানুষটির সঙ্গে দেখা ও তাঁর মুখের কথাগুলি শুনে অবধি মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ করছিল। এর পর সেই মানুষটির সম্বন্ধে পিতার কঠিন ও রূঢ় কথার আঘাতে তার সে অস্বস্তি হ্রাস পায়নি, বরং আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। সেই থেকেই দেবীর মুখখানা রীতিমত ভার-ভার হয়, আর সেই ভাবেই সে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। মায়ের কথাতেই সে বুঝতে পারে, তিনি যে লোকটির জন্য জল খাবার সাজাচ্ছেন, গাড়ি থেকে নেমেই সে তাঁরই সঙ্গে কথা বলেছে এবং অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ভাবেই

তাঁকে চলে যেতে দেখেছে। অথচ সেই লোকটির সম্বন্ধে সে এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে পড়ে আছে এবং সেই লোকটির সম্বন্ধে তার বাবার ধারনা খারাপ হলেও, মায়ের মনোভাব কিন্তু অন্য রকম। তাই তারই মুখে তাঁর চলে যাবার কথা শুনে ব্যথায় তিনি ভেঙে পড়েছেন। এ থেকেই দেবী বুঝতে পেরেছে যে, ঐ আশ্চর্য মানুষটির সম্বন্ধে তার মায়ের পক্ষেই এখন তার মনের অন্ধকার দিকটা আলোকিত করা সম্ভব।

দেবী লক্ষ্য করল, কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই সুলোচনা দেবী সহসা আঁচলের দিকটা টেনে নিয়ে উভয় চোখের উদ্‌গত অশ্রু মুছে ফেললেন। একটু পরেই ধরা গলায় বললেন: মনের কি ভ্রান্তি! হালদার মশাই একে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, তার ওপর অনেক বেলায় খাওয়া দাওয়ার পর অভ্যাসমত এখনো ঘুমুচ্ছেন ভেবে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর জন্যে জল খাবার সাজাচ্ছি, আর— এরই মধ্যে সব চুকে বুকে গেছে। তুই একবার কৈলেসকে ডেকে আনত মা, সে সব জানে, তাকে জিজ্ঞেস করি—কি হয়েছিল ?

দেবী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বার মহলে বগলার চেম্বারের দিকে গেল। কৈলাস নামক বিশ্বাসী ভৃত্যটিকে এইখানে উপস্থিত থেকে নবাগত ব্যক্তিদের সঙ্গে অন্দরমহলের গৃহিণী এবং বার মহলের সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হয়। এই কৈলাসই পশুপতিকে অন্দরমহলের পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে সুলোচনা দেবীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। গৃহিণীর প্রয়োজনে আহুত হলে কৈলাসের পক্ষে এ মহলে যেতে বাধা নেই। স্নানের সময় পশুপতির পরিচর্যার জন্যও কৈলাসকে ভিতর মহলে যেতে হয়েছিল, এবং সেই-জন্যই নবাগত নিষ্ঠাবান মানুষটিকে বিশেষ সম্মানীয় ভেবেই সে সাহেবের চেম্বারে বিনা এত্তেলায় প্রবেশ করবার সুযোগ দিয়েছিল। এই প্রবীণ পরিচারকটি বহুদিন ধরেই পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যরূপেই এ বাড়িতে বাহাল আছে।

বোগলা সাহেবের চেম্বারে তখন টাইপ করা পরিকল্পনাটি নিয়ে গভীর আলোচনা চলেছে। কৈলাসের এখন যথেষ্ট অবসর। তথাপি বাহিরের দিকে কান দুটিকে সতর্ক রেখে সে দেবীর সঙ্গে গৃহিণীর সম্বন্ধে এসে

মুখের প্রশ্নের উত্তরে পশুপতি সংক্রান্ত অপ্রিয় সংবাদগুলি সবই সবিনয়ে কথা প্রকাশ করল।

শুনতে শুনতেই ভাবাবেগে কপালে করাঘাত করে সুলোচনা দেবী আর্তস্বরে বলতে লাগলেন: কাল ঘুমই আমার এই সর্বনাশ ঘটাল যে! ঠিক করে রেখেছিলুম, কর্তাকে সব বলে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখনকার মত দু'দিক সামলে নেব, কিন্তু নিজের গড়িমিষিতেই অনর্থ হলো! এখন কি হবে? তিনি হয়ত—

দেবীর মনের মধ্যে কিন্তু সেই সৌম্যমূর্তি প্রবীণ মানুষটির মিষ্ট কথাগুলি এক একটা প্রশ্নের আকারে তাকে তখন অস্থির করে তুলছিল। তাই সে মায়ের কথার উপরেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মা, উনি যে বললেন—

চোখ তুলে মেয়ের দিকে চেয়ে মা শুধালেন: কি আবার বললেন?

দেবী বলল: বললেন—'ললিত দা'কে তোমার মনে পড়ে? আমি তার বাবা।' ললিত দা কে মা?

মেয়ের প্রশ্নে মায়ের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। হালদার মশাই তাহলে ললিতের কথাও বলেছেন! কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন? তাঁর মুখ যে বন্ধ! মনে মনে তিনি ইষ্টদেবীকে স্মরণ করলেন: এখন তুমিই মুখ রাখো মা!

কিন্তু মা নীরব থাকলেও দেবীর জিজ্ঞাসার জবাবটা দিতে দিতে ক্রুদ্ধভাবে বগলাপদই সেখানে এগিয়ে এলেন: সেই লোফারটা বুঝি তার ক্যাপা ছেলের কথা বলে তোমার মন ভারি করে গেছে? মুছে ফেল, মন থেকে সব মুছে ফেল মা—এই মাত্র ঐ গেঁয়ো ইতরটার মুখে যা কিছু শুনেছ!

মা ও মেয়ে উভয়েই বুঝলেন, এঁদের অগোচরে বাড়ির কর্তা নিজেই আড়াল থেকে কথাগুলো শুনেছেন, আর সেজন্য ক্রুদ্ধও হয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এ পর্যন্ত পিতার মুখের উপর তাঁর আপত্তি বা অনভিপ্রেত কোন কথাই যে-কন্যাটি কোন দিনই বলতে অভ্যস্ত ছিল না, আজকের অবস্থায় এই অশিষ্ট ও উদ্ধত কথাগুলির উত্তরে তাকেই অসঙ্কোচে

তিনি বলতে শুনলেন: কিন্তু ওঁর কথাগুলো যেন মন্ত্রের মতন আমার সঙ্গে মিশে গেছে বাবা—কিছুতেই যে মুছতে পারছি না!

এক নিশেসে কথাগুলি বলেই একরকম ছুটেই সে আরো ভিতরে ঠাকুর ঘরের উদ্দেশে চলে গেল।

সুলোচনা দেবী স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন: শুনলে ত' মেয়ের কথা! আর, বোধ হয় বুঝেছ—আমি ওকে ওখানকার সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। এর জন্যে তুমিই দায়ী।

বগলাপদ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন দেবীর মুখে এ রকম কথা শুনে। স্ত্রীর কাছেও কথার তীব্র আঘাত পেয়ে বললেন: হ্যাঁ, পাকে প্রকারে তাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে বটে! দেবীর সঙ্গে সেই হামবাগটার দেখা হবে ওভাবে, আর ঝাঁ করে ছেলের কথাটা বলবে, সে ত ভাবিনি। কিন্তু তুমিই ত গোড়াতে গোল পাকিয়ে রেখেছিলে!

শান্ত কণ্ঠে সুলোচনা দেবী বললেন: সংসারের গিন্নীর যা উচিত, আমি তাই করেছিলুম। দুপুর বেলায় বাড়িতে অতিথি এলে গৃহস্থ মাত্রই তাঁকে সৎকার করে। ভেবেছিলুম, তুমি ফিরে এলে পরামর্শ করে এমন ভাবে ওঁর সঙ্গে কথা বলব, যাতে কিছু মনে না করেন। কিন্তু তুমি নিজেই গোল পাকিয়েছ। এখন আবার আমাকে দোষ দিচ্ছ! যে ব্যাভার ওঁর সঙ্গে করেছ, সহজ অবস্থায় থাকলে কেউ সে কাজ করতে পারে না। আগেকার কথা সব ভুলে, তুমি কিনা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছ!

পত্নীর কথাগুলো তীক্ষ্ণ হলেও বগলাকে সহ্য করতে হলো; বুঝলেন, স্ত্রীর প্রতি কথাটিই সত্য। আস্তে আস্তে অপরাধীর মতই বললেন: হ্যাঁ—এখন ভাবছি, কাজটা ভাল করিনি। তবে কি জানো, লোকটা হঠাৎ ঘরে ঢুকে—তাও এলো গায়ে, খালি পায়ে, মাথায় একটা ইয়া টিকি নিয়ে—যে ভাবে কথা বলল, মেজাজটাকে আর ধরে রাখতে পারিনি। কিন্তু যা হবার, তা হয়ে গেছে এখন দেবী যাতে—

সুলোচনা দেবী একথা শুনে মুখখানা শক্ত করে বললেন: তুমি দেবীকে চেনো নি, ও তোমার রাণী নয়। ও-কথা যখনি শুনেছে, ওর মনের ভাব,

মুখের ভাব—সব বদলে গেছে। হোতে পারে ব্যামোর জন্যে আগের কথা ওর মনে নেই, কিন্তু ও মা মেয়ে, ওর নিজের মনের কাছ থেকেই সব কথা আদায় করে নেবে জেনো, আর—সেটা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই ও থামবে না। তার পর—যদি কোনরকমে জানতে পারে—

কিন্তু স্বামীর মুখ ও চক্ষুর রুক্ষ ভঙ্গি দেখে তিনি কথাটা না বলেই চুপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বগলাপদ ঝাঁঝিয়ে বললেন: ও জানবে কি করে, যদি না কেউ জানিয়ে দেয়! আমার শুধু ভয় তোমাকে—

এ কথা শুনেই সুলোচনা দেবীর দুই চক্ষুর তারা দুটোও জলে উঠল। প্রখর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন: তোমার মন দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, চোখের দৃষ্টিও কমে এসেছে, তাই আমাকে তুমি সন্দেহ করছ। কিন্তু যে কোন ঠাকুর-দেবতার নামে বলবে, আমি শপথ করে কথা দিতে প্রস্তুত আছি—তুমি বারণ করার পর, ও সম্বন্ধে দেবীকে আমি কোন কথাই বলিনি, আর সেও জানতে চায় নি। সেই অসুখ থেকে ও সেরে ওঠবার পর—ওর সেই ভাবের সমস্ত আবেগ মনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ তুমিই সেখানে ঘা দিয়েছ। এর পর দেবীর মনের ভাব যদি জেগে ওঠে, আমি যেমন একটুও আশ্চর্য হব না, তেমনি—এও তোমাকে বলছি, তার আগে আমার কাছ থেকে কিছুই ও জানতে পারবে না; ও সম্বন্ধে ওর কাছে আমি মুখে ছিপি এঁটে থাকব। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, মা আর মেয়ে দু'জনকেই তুমি দুটো আলাদা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখতে পার—কেউ তাতে আপত্তি করবে না, বাধাও দেবে না।

কথাগুলো বলেই সুলোচনা দেবীও ভিতরে চলে গেলেন। বগলাপদ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে তার পর বিকৃতকণ্ঠে বলে উঠলেন: হুঁ। ভাবের আবেগ…বিবেক…যতসব—আমি মানি না, বিশ্বাস করি না।

পরক্ষণেই তিনি বাইরের দিকে পদচালনা করলেন।

২৪

কলকাতায় আসার পর দ্রুতগতিতে ভাগ্যপরিবর্তনের তালে তালে বগলাপদর মতিগতিও যে আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হয়েছে, সে পরিচয় নানা সূত্রেই প্রকাশ পেয়েছে। অথচ, ভাগ্যোদয়ের পূর্বে এই মানুষটির মধ্যেই পল্লী-সমাজ-সুলভ বহু সদ্‌গুণের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু ভাগ্যপরিবর্তনের পর ধীরে ধীরে সেই গুণগুলির অবলুপ্তি ঘটে। এর কারণ হচ্ছে, শিক্ষা বা আত্মিক সাধনাসূত্রে হৃদয়বান বিজ্ঞ ব্যক্তি জীবনের সকল অবস্থাতেই চিত্তসংযমে অভ্যস্ত থাকেন, বগলাপদর জীবনে সে শিক্ষা বা সাধনার খুবই অভাব ছিল। যদি কোন কারণে তাঁকে দুর্গতির সম্মুখীন হতে হত, অর্থাৎ জীবনযাত্রায় ঘটত বিপর্যয়, তাহলেও তিনি স্বাভাবিক ধৈর্য, ঔদার্য, সরলতা ও সততা প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করে স্বার্থান্বেষী হতেন জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য। পক্ষান্তরে, অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর ভাগ্যোদয় এবং অবস্থার বিস্ময়কর পরিবর্তনও তাঁর প্রকৃতিমধ্যে এমন বিপর্যয় উপস্থিত করে যে, অতীত জীবনের সব কিছুই বগলাপদর স্বার্থাচ্ছন্ন চোখে ম্লান হয়ে যায়। কর্মক্ষেত্রে যাঁদের সহায়তা ও সাহচর্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়ে তিনি তাঁদেরই পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন, বর্তমান জীবনে তাঁরাই হয়েছেন আদর্শ। এর সূচনাতেও সেই স্বার্থ। প্রথম সহকর্মীর বিপুল ঐশ্বর্যপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে যোগসূত্র সংস্থানের উপলক্ষ হয়ে আছে কনিষ্ঠা কন্যা রাণী। কিন্তু জ্যেষ্ঠা দেবীর ব্যাপারে এক বিশ্রী বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে অতীত জীবনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক ঘটনা। তিনি যতই ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে অবলুপ্তির যবনিকা ফেলতে চান, তাতে এক দিকে নিজের স্ত্রীর উক্তি এবং অন্যদিকে অতীত জীবনের বন্ধু—বর্তমানে অস্পৃশ্যের শামিল—পশুপতি পণ্ডিতের চিঠিগুলির যুক্তি জাগিয়ে তুলেছে সমস্যা। এক্ষেত্রে তাঁকে অভিনেতার আদর্শে অভিনয় করতে হয় অবস্থা অনুসারে। কিন্তু দ্বিতীয়

সহকর্মীর উত্তরাধিকারী এবং স্বার্থগত নতুন সম্ভাবনার প্রতীকরূপে প্রশান্তকে প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এই সুসমৃদ্ধ গৃহস্থালীর পরিচালক ও পরিজনবর্গের অদ্বিতীয় প্রতিপালকরূপে প্রকাশ্যভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রশান্তকে সব দিক দিয়ে উপযুক্ত স্থির করে তারই হাতে দেবীকে সমর্পণ করবেন, কারও আপত্তি এখানে চলবে না। এখন সমস্যা পশুপতিকে নিয়ে। কিন্তু সেদিকটাও থামাতে করলেন এক অভিনয়, স্ত্রীর সঙ্গেও চাতুরি চালাতে পশ্চাদপদ্ হলেন না। বগলাকে চিঠির পর চিঠি লিখেও জবাব না পেয়ে পশুপতি পণ্ডিত তাঁর স্ত্রীকে ললিত ও দেবীকে নিয়ে দুই সইয়ের প্রতিশ্রুতি, ওদের ছেলে খেলা, তারপর ললিতের মনোভাব, দেবীর ছবি নিয়ে সাধনা প্রভৃতি সবই উল্লেখ করে জানালেন যে, গ্রামশুদ্ধ সকলে এদের মিলন প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু বগলাপদর হাতে চিঠিখানি পড়তেই, সন্তর্পণে খুলে কিছুটা পড়েই বিকৃত মুখে বলে ওঠেন—সেই পুরানো কাসুন্দিই চটকাতে বসেছে, বার বার এক কথা—ননসেন্স্! সঙ্গে সঙ্গে সেখানা বন্ধ করে কোটের পকেটে রেখে দেন। শীতকাল তখন, গরম কাপড়ের জামা পরেছিলেন বগলা। এক পক্ষ আগে পশুপতি তাঁকেও এক লম্বা চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে ললিতের ব্যাপারটা এত ফেনিয়ে লেখা ছিল না। সে চিঠিখানাও এই জামার পকেটে রেখেছিলেন। স্ত্রীর নামের চিঠি বাজেয়াপ্ত করা ঠিক নয় জেনেও তাঁকে দেননি, পাছে তাঁর মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়। আরও কয়েক মাস কেটে যায়। ওদিকে বগলার স্ত্রীর কাছ থেকেও সাড়া না পেয়ে পশুপতি পণ্ডিত ব্যাপারটার বোঝাপড়া বা হেস্তনেস্ত করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় ওঁদের বাড়িতে আসা সাব্যস্ত করে বগলার স্ত্রীকে সংক্ষেপে আর এক পত্রে জানালেন যে, কোন জবাব না পেয়ে দেবী ও ললিতের ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করবার জন্য তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন এবার। এ চিঠিও বগলার হাতে পড়ে এবং চিঠির বৃত্তান্ত জেনে তাঁর ত চক্ষুস্থির! তিনি তখন আর এক অভিনয় করলেন। দেশের ঠিকানায় 'তার' যোগে পশুপতিকে জানালেন—'কলকাতায় এসো না। কারণটা, পরের তারে জানাচ্ছি।' পরবর্তী তারে কারণটা খুলেই জানালেন—'আগের কথা সব ভুলে যাও।'

যেহেতু, যুদ্ধের সময় যে দুই মুরুব্বির সাহায্যে ভাগ্যোদয় হয়েছিল, তাঁরাও আমাদের পালটি ঘর, মস্ত বড় লোক; তাঁদেরই দুটি ছেলের সঙ্গে দেবী ও রাণীর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। আমার মেয়ে দেবী তোমার ছেলের কথা সব ভুলে গেছে। মোদ্দা কথা হোচ্ছে—যেহেতু আমার কন্যা শিক্ষিতা ও আধুনিকা, সুতরাং বহু পূর্বের একটা মৌখিক কথার উপর গুরুত্ব দিয়ে, অজ পাড়াগাঁয়ের একটা মাথাপাগল ছেলের হাতে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারবে না।

কিন্তু এখানেই যেন অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নিয়তির বিচিত্রনেমী বক্রগতিতে এমন একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয় যে, বগলাপদর সুপরিকল্পিত অভিনয়টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং এই সূত্রে আর এক নতুনতর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় অনাগত কালের পর্দায় সর্বসমক্ষে অনলোজ্জ্বল অক্ষরে একটা প্রশ্ন ফুটে ওঠে—ততঃ কিম্?

যাক্ সে কথা। এদিকে বগলাপদর অভিনয়টি গৃহিণীর অজ্ঞাত থাকায় তিনি পশুপতির সমক্ষে অসঙ্কোচেই বলতে বাধ্য হন যে, তাঁর চিঠিপত্র কিছুই তিনি পান নি। পর পর দুটো টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বগলাও নিশ্চিন্ত ছিলেন; কিন্তু পশুপতির আবির্ভাবেই তাঁর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। নিষেধ না মেনেও ইতরটা নির্লজ্জের মত সেই কলকাতায় হাজির হয়েছে, তারপর বিনা এত্তেলায় একেবারে এলো গায়ে তাঁর ঘরে উপস্থিত—যেখানে সম্ভ্রান্ত দুই কুটুম্বকে নিয়ে তিনি আনন্দ করছেন!

বিনা গোলযোগে চুপিসাড়ে বগলা যে সমস্যাটির সমাধান করতে পেরেছেন ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেইটিই সব দিক দিয়ে তাঁকে ভীষণ বিব্রত করে তুলল, তাঁরই সামান্য ত্রুটিতে। টেলিগ্রামটি পাঠাবার ব্যাপারে আর একটু তৎপর হলে এই বিশ্রী পরিস্থিতিটার উদ্ভব হোতনা, আর, ঐ লোকটা গোটাকতক কথা বলে হঠাৎ দেবীকেও উন্মনা করতে পারত না। কিন্তু বগলাও দমবার পাত্র নন। বাড়ির কর্তার কর্তৃত্ব কতখানি এবার তিনি আরো শক্ত হয়েই জানিয়ে দেবেন, এখন প্রশান্ত ফিরে এলেই সেটা সম্ভব হয়।

ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপারে বগলাপদর অপর এক প্রচ্ছন্ন অপকীর্তির

কথাও স্ত্রী-কন্যার কাছে ধরা পড়ে গেল এবং সেই সূত্রে দেবীর অতীত জীবনের বিস্মৃত দিকটাও তার অনন্যসাধারণ অনুসন্ধিৎসার আলোকপাতে উদ্‌ঘাটিত হলো।

পশুপতি পণ্ডিতের সেই কটি কথা—সেই থেকে দেবীর গবেষণার বিষয়-বস্তু হয়ে তাকে সর্বক্ষণই যেন একান্ত তন্ময় করে রেখেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঠাকুর ঘরে এই নিয়ে ধর্ণা দেয়, কখনো বা একাই পড়ার ঘরে বসে এই চিন্তা করে। এমনি সময় সেদিন বাসনা নামে এক তরুণী পরিচারিকা কয়েকখানা খামে ভরা পুরানো চিঠি, সেই সঙ্গে আরো কিছু কাগজপত্র এক সঙ্গে বেঁধে টেবিলে দেবীর সামনে রেখে বলল যে, সাহেবের শীতের জামার ভিতর থেকে, আর হালের জামা থেকে এ সব পাওয়া গেছে। দেবী জানে, রাণীই বাসনাকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছিল, জামার পকেটগুলো দেখে তবে যেন ধোলাইখানায় পাঠায়, পকেটে কাগজ পত্র থাকলে যেন তার কাছে জমা দেয়।

বাসনার দিকে চেয়ে দেবী বলল: তুমি যাও, আমি দেখব'খন কাজের কিছু আছে কি না। বাসনা চলে যেতে চিঠির তাড়াটি খুলে দেবী দেখল যে, চিঠি ও কাগজগুলি রাণীর নির্দেশমতই বাসনা পর পর সাজিয়ে রেখেছে। তাড়াটি খুলতেই প্রথমে দেখল, কতকগুলো ক্যাসমেমো, সিনেমার ব্যবহার করা টিকিট, প্রোগ্রাম, এর পর তিনখানা ডাকঘরের খামে মোড়া চিঠি, একখানা চিঠি খুব পাতলা অর্থাৎ হাল্কা, খামের উপরে তার মায়ের নাম লেখা। এই বাড়ির ঠিকানা এবং ডাকঘরের মোহরের ছাপ দেখে দেবী বুঝল, তারিখটা হালের। আর এক খানা—এর চেয়ে কিছু পুরু, তার উপরে বগলাপদর নাম ও ঠিকানা। শেষের খানাই বেশী পুরু, তাতেও মায়ের নাম ঠিকানা। দেবী মিলিয়ে দেখল, তিনখানি চিঠির ঠিকানা একই হাতের লেখা—কিন্তু অল্প পুরু ও বেশী পুরু চিঠি দুখানি থেকে সাত মাস আগে ডিসেম্বর মাসের তারিখটা অনেক কষ্টে উদ্ধার করল দেবী। বুঝল যে, শীতের জামার পকেটে থাকায়, আর এখন সে জামা ধোলাই-খানায় পাঠাবার প্রয়োজন হওয়ায় তার পকেট থেকে উদ্ধার করেছে বাসনা। দেবী আরো বুঝল, মায়ের

নামে লেখা চিঠি দুখানা খোলা অবিশ্যি হয়েছে, কিন্তু তাঁর হাতে পড়েনি। আর—সেদিন যে পণ্ডিত মানুষটি এ বাড়িতে এসেছিলেন, মা বলেছিলেন তার জ্যেঠামণি হন, আর বাবা বলেছিলেন তিনি লোফার—তিনিই এগুলির প্রেরক, খামগুলির একপাশে তাঁরও নাম ঠিকানা থাকায় বুঝতে পারে সে।

চিঠি তিন খানি হাতে নিয়ে দেবী ভাবতে বসল কি এখন তার কর্তব্য! তার অতীত জীবনের যে সব কথা জানবার জন্য সে এখন অধীর হয়ে উঠেছে, ঠাকুরের কাছে ধর্ণা দিয়েছে, নিজের অবচেতন মনেও চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, কিন্তু কিছুই জানতে পারেনি বলে অধীর হয়ে উঠেছে, হয়ত এই চিঠিগুলি থেকেই তার সমাধান হতে পারে। কিন্তু বাবা ও মায়ের চিঠি পড়া কি তার উচিত হবে?

সেদিনের নবাগত মানুষটির কথাকে কেন্দ্র করে সেই থেকে মনে মনে কত কল্পনাই করে এসেছে দেবী, কিন্তু কিছুই উদ্ভাবন করতে পারেনি এ পর্যন্ত। মা তাকে আগে থেকেই গভীর ব্যথার সঙ্গেই আর্ত স্বরে সতর্ক করে দিয়েছেন—'একটা কথা তোমাকে বলে রাখছি মা, ওদিনের ঘটনা থেকে যেটুকু জেনেছ, তার বেশী কিছু জানবার জন্যে ভুলেও যেন আমাকে জিজ্ঞাসা কর না মা! ওঁর কাছে আমি কথা দিয়েছি, ওখানকার ব্যাপারে কোন কথাই তোমাকে বলব না। তবে একথাও আমি বলছি, ঠাকুর ঘরে বসে মায়ের দয়ায় নিজে থেকে তুমি যদি ওখানকার কথা—তোমার ছেলেবেলার কথা সব জানতে পার, তাহলে আমার চেয়ে বেশী খুশী কেউ হবে না।'

মায়ের কথাগুলিও দেবীর মনের ভিতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—সেই সঙ্গে বাবার উপর একটা অভিমানও মনে মনে গুমরে উঠতে থাকে। তিনি মাকে নিশ্চয়ই নিষেধ করেছেন, তাকেও দাবিয়ে রেখেছেন, অথচ মায়ের নামের চিঠিগুলো মাকে দেওয়া প্রয়োজনবোধ করেন নি! দেবীর মুখখানা হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল, চিঠি ক'খানা হাতে চেপে ধরে অন্তর্দেবতাকে উদ্দেশ করে মনের ভাষাতেই জানিয়ে দিল—তোমাকেই সাক্ষী রেখে আমি এগুলো পড়ব, শুধু আমার অতীত জীবনের সত্যকে জানবার জন্য। হয় ত, এ তোমারই খেলা, নৈলে এ ভাবে এগুলো আমার হাতে আসবে কেন?

তারিখ মিলিয়ে—পর পর চিঠি তিন খানা সাজিয়ে, প্রথমেই সে [বগলার নামে লেখা চিঠিখানা রুদ্ধ নিশ্বাসেই পড়ে ফেলল। এ চিঠিতে কোন বাহুল্য না থাকলেও পড়তে পড়তেই দেবীর সমক্ষে এমন একটা বাস্তব আখ্যায়িকার কাঠামো সুস্পষ্ট হলো—যার মধ্যে, দুটি বাচ্ছা ছেলে মেয়েকে ঘিরে হরগৌরীর মন্দিরে একটা উৎসবের দিনে শিশুদের দুই মা,—দেবতা, পুরুত ও পাড়ার নানা বয়সের মেয়েদের সমক্ষে ভাবে গদ গদ হয়ে একটা অঙ্গীকার করছেন! কি আশ্চর্য্য! এত বড় একটা ঘটনা, পৌরাণিক কাহিনীর মত রোমাঞ্চকর ব্যাপার, জ্ঞানোদয়ের আগে থেকেই দুটি শিশুকে নিয়ে যার সূচনা—সেই শিশুর একটি সে নিজে, অথচ কিছুই জানেনা, কিছুই শোনেনি বা শোনানো হয় নি তাকে! আর, চিঠির ভাষা যেমন সংযত, তেমনি মার্জিত। লেখার মধ্যে ভিক্ষুকের মিনতি নেই, আছে কর্ত্তব্যের দিক দিয়ে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর আহ্বান।—'বারো বছর আগে হরগৌরী-মন্দিরে দেবতা পুরোহিত ও পল্লী-মহিলাদের সামনে আমাদের দুই বন্ধুর সহধর্মিনীদ্বয় তাঁদের শিশু সন্তান দুটি—ললিত ও দেবীকে উপলক্ষ করে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, আমরা এবং এ-অঞ্চলবাসীদেব কারও অবিদিত নেই। কালক্রমে ললিতের মা, তাঁর দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করে সতীধামে চলে গেছেন। অতীতের সেই ঘটনাটির যাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, তাঁরা সাগ্রহে ওদের মিলন-দিনটির প্রতীক্ষা করছেন। ললিতের মায়ের অবর্ত্তমানে আজ আমাকেই তাঁর স্থলে দাঁড়িয়ে সস্ত্রীক তোমাকে আহ্বান জানাতে হচ্ছে—সেদিনের সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য।' এই হোচ্ছে চিঠিখানির মোটামুটি মর্ম।

এর পর কম্পিত হস্তে দেবী মায়ের চিঠিখানা খুলে ফেলল। এ চিঠি আরম্ভ করতে আগের মত রাজ্যের বিস্ময় এসে তাকে ছেঁকে ধরে নি। বন্ধুকে লিখিত পত্রের কোন উত্তর না পেয়ে তিনি বন্ধু-পত্নীকে প্রথমে যে কথা জানিয়েছেন, আগের চিঠিতে লেখা অংশটিরই পুনরুক্তি সেই অংশটুকু। কিন্তু এর পর—সেই দুটি শিশুর বাল্যলীলার কাহিনীগুলি আগাগোড়া বর্ণনা করেছেন: গ্রাম ছেড়ে এঁদের কলকাতায় আসবার দিন খেলাঘরের রথের সামনে দুটি বালক-বালিকার ছলছল চোখে বিদায়কাল পর্যন্ত; তারপর—সেই

ললিত ছেলেটির একাই দেবীর ছবিকে নিয়ে খেলা করা, বই পড়ে শোনানো, বাপের বিরক্তি সত্ত্বেও মার কাছে প্রশ্রয়প্রাপ্তি, এবং সেই মায়ের মৃত্যু, মাতৃহারা সাথীহারা ভাবপ্রবণ বালকের অবস্থা, ওদিকে ললিতের জন্য হেদিয়ে দেবীর ব্যামো—তারই বাবার পত্রে জেনে তাঁর মনোবেদনা ও আশীর্বাদ, এর পর বন্ধুর নির্দেশে তূষ্ণীভাব, ললিতকে শিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠানো এবং শিক্ষার মধ্যেও দেবীকে বরাবর সমান ভাবে মনের মধ্যে রেখে দেবীর শৈশবের আলেখ্য নিয়ে অদ্ভুত সাধনা—কল্পনায় দেবীর অসংখ্য ছবি নিজে হাতে এঁকে শৈশব প্রিয়ার প্রতি যে ভাবে তার প্রেম নিবেদন করেছে—সে যে কি রকম কল্পনাতীত ব্যাপার, একটি একটি করে সেগুলি অল্প কথায় এমনভাবে চিঠিতে লিখেছেন পুত্রবৎসল পিতা, লেখাগুলি পড়তে পড়তেই দেবী অভিভূত হয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে পত্রের পাত্রপাত্রী দুটিও তার প্রখর কল্পনার আলোকে মূর্তি ধরে লিখিত ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

আগের পত্রে দুটি শিশুর প্রসঙ্গ-সূত্রে শিবমন্দিরে তাদের বাল্যলীলা ও তার পারিপার্শিক অবস্থা, প্রতিবেশী বালকবালিকাদের নামগুলিও প্রতিযোগিতার ব্যাপারে এমন করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারাও যেন দেবীর বলিষ্ঠ কল্পনায় মনের মধ্যে এক একটি রূপ ধরে স্থান ক'রে নিয়েছে। এর পরের পর্বে দেবীর সেই বাল্য সাথীটির সাময়িক ভাবে একক অবস্থার বেদনা এবং তার পরেই সাথীর ছবি নিয়ে তাকেই সাথী করে অপরূপ এক চিত্র-সাধনার দৃশ্যগুলিও পরপর দেবীর মনে রূপায়িত হতেই অনাস্বাদিত এক পুলকের আবেগে সর্বাঙ্গ তার রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণে আত্মসচেতন হয়ে দেবী তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খামের মধ্যে ভরে রেখে তৃতীয় চিঠিখানি নিয়ে পড়তে থাকে। এইখানিই সাম্প্রতিক পত্র—কলকাতা আসবার পূর্বে দেশ থেকে সেই ভদ্রলোক এই পত্রে লিখেছেন যে, পূর্ব পত্রের উত্তর না পেয়ে একটা বোঝাপড়ার জন্য তাঁকে রওনা হতে হচ্ছে। কিন্তু এখানিও যাঁর নামে এসেছিল, আগের পত্র-খানির মতই দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি তাঁর বাবা।

দেবীর মনে হতে থাকে—'তোমার ললিদাকে মনে পড়ে মা—আমি তার বাবা।'—এই কথাটিকে কেন্দ্র করে ক'দিন ধরে কত কথাই সে ভেবেছে; তার

অজানা অতীত সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ এই প্রথম জাগিয়ে দেয় মনে ঐ কটি কথা। এর ফলে নিজের আড়ষ্ট মনের প্রসার ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় নি। কিন্তু এখন সেই অতীতের রুদ্ধ দ্বার খুলে গেছে। ইচ্ছে করছে তার, পরমোল্লাসে খিল খিল করে হেসে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিলে, কেমন করে ছিলে, কেন আসোনি, কেন সাড়া দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দাও নি—উঃ! কি আনন্দ! তাহলে অতীত আমার ছিল, এত বড় অতীত, এত ঘটনা,—এ যে সত্যিই উপন্যাস!

ভাবতে ভাবতে অবচেতন মনের চিন্তা বুঝি অসতর্ক মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময় দেবীর সন্ধানে সুলোচনা দেবীও পড়ার ঘরে সবেমাত্র ঢুকেছেন। চাপাগলার অস্পষ্ট শব্দ শুনে শুধালেন: কি হয়েছে—নিজের মনে বিড় বিড় করে কি বকছিস্?

দেবীর বুঝি তন্দ্রা ভেঙে গেল মায়ের কথায়। কিন্তু তখনো ঠিক করতে পারেনি—কোথায় সে আছে। সেই অবস্থায় চিঠিগুলোর উপরে নজর পড়তেই সে আত্মস্থ হয়ে বুঝল ব্যাপারটা। তখনই তাড়াতাড়ি উঠে মায়ের নাম লেখা খাম দু'খানি বেছে নিয়ে চিঠিশুদ্ধ হাতখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল: তোমার চিঠি—বাবার জামার পকেটে ছিল।

চিঠি দু'খানা এক নজরে দেখেই মা বুঝলেন ব্যাপারটা। খামের একটা দিক কাঁচি দিয়ে কাটা। চিঠি পেয়েই বাড়ির মালিক খামের মুখ কেটে চিঠি পড়ে পকেটের মধ্যে রেখেছিলেন। তারপর ইচ্ছা করেই হোক বা ভুলবশতঃই হোক, চিঠির মালিককে আর দেওয়া হয় নি। মেয়ের দিকে একটি বার চেয়ে চিঠিখানা তিনি না পড়েই আঁচলের খুঁটে বেঁধে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন।

দেবীও সেটা দেখল, তারপর কি ভেবে বলল: এখানা বাবার চিঠি। আর এগুলো বাজে কাগজ—ক্যাসমেমো, সিনেমার টিকিট—

সুলোচনা দেবী বললেন: ওঁর চিঠি তুমি নিজেই ওঁকে দিও।

দেবী বলল: সেই জন্যেই ত আলাদা করে রেখেছি।

সুলোচনা দেবী বললেন: হ্যাঁ, ওঁকে ওগুলো দেবার সময় বলবে—আমার নামেও দু'খানা চিঠি ছিল, সে দুটো আমাকেই দিয়েছ।

প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সুলোচনা দেবী বললেন : অনেক রাত হয়েছে, খাবি আয়।

পরে চিঠি দু'খানা পড়তে অনেকখানি রাত হয়। তখন হাতে মুখে জল দিয়ে চিঠির কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সুলোচনা দেবী সবে মাত্র তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন, এমনি সময় পাশের ঘর থেকে দেবীর চীৎকারে তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল।

একখানা বড় ঘর—মাঝে দরজা। সুলোচনা দেবী এক ঘরে, অন্য ঘরে দেবী ও রাণী শয়ন করে। শয্যা থেকে দেবী বালিকার মত চপল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল : ললিত দা, ধরো—ধরো—পড়ে যাচ্ছি।

সুলোচনা দেবী ছুটে গিয়ে কন্যার গায়ে হাত দিয়ে শুধালেন : কি হয়েছে রে, অমন করে চেঁচিয়ে উঠলি যে ?

তখনো দেবীর ঘুমের ঘোর কাটেনি। সেই অবস্থায় বলে উঠল : দেখনা মা, ললিতদা'র কাণ্ড! আমাকে গাছে তুলে দিয়ে লুকিয়েছে! যদি পড়ে যাই—

সুলোচনা দেবী চিঠি দু'খানা পড়তে পড়তে ক্রমাগতই মুখ তুলে ভেবেছেন, দেবী কি পড়েছে এ চিঠি! এখন ঘুমন্ত কন্যার স্বপ্ন-দেখা, ও মনের কথা থেকেই তাঁর সে সন্দেহের সমাধান হয়ে গেল।

সকালে সুলোচনা দেবী লক্ষ্য করলেন, দেবীর মুখে কেমন একটা সপ্রতিভ ভাব, চোখ দুটোর দৃষ্টির ভঙ্গিও আর এক রকম। আগে যে মেয়েটির মুখে চোখ পড়লেই ভীরু, বোকা, সঙ্কোচে জড়সড় মনে হোত, এখন যেন মুখের ও চোখের সে ভাব একবারে বদলে গেছে, চোখে চোখে একটা সপ্রতিভ আভা যেন ঝলমল করছে, আগের সে জড়তা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, সারা মুখখানা দিয়ে উপস্থিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণ আলো বুঝি ঠিকরে বেরুচ্ছে—নেই শুধু রাণীর মত ব্যপকপনা ও অকারণ চাঞ্চল্য। সুলোচনা দেবী অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন কন্যাকে।

যগলাপদর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে যে মেয়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ত, কথা বলতে গিয়ে কাঁপত ভয়ে, রাণী খিল খিল করে হেসে ঠাট্টা করত, সেই দেবী এদিন অসংকোচে তাঁর টেবিলের উপর চিঠিখানা রেখে গম্ভীরমুখে সংযত স্বরে বললে : আপনার জামার পকেটে ছিল—বাসনা দিয়েছে।

এটা নতুন নয়, স্বামীরই ব্যবস্থা—বগলারও অবিদিত নয়। কিন্তু তিনি চিঠিখানা এভাবে দেখেই এমনভাবে চমকে উঠলেন, যেন কোন সাংঘাতিক বস্তু সেটা। নির্বাক ভঙ্গিতে ক্ষণকাল দেবীর মুখের দিকে চেয়ে থেকেই তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: আর কোন চিঠি ছিল পকেটে?

দেবী তৎক্ষণাৎ বলল: হ্যাঁ, মায়ের নামের দু'খানা চিঠি—তাঁকে দিয়েছি।

'ও! এরই মধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে তা'হলে?'—ভগ্নস্বরে কথাটা বলেই বগলা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু সুলোচনা দেবীও যে ইতিমধ্যে কক্ষ-দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কেউ লক্ষ্য করে নি। তিনি টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতেই দেবী ঝাঁ করে বেরিয়ে গেল। বগলা ম্লানদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন গৃহিণীর দিকে। সুলোচনা দেবী মৃদু স্বরে বললেন: চিঠি দু'খানা চেপে না রেখে ঠিক সময়ে আমাকে যদি দিতে, এ সব গণ্ডগোল আর হোত না।

শুষ্ক স্বরে বগলা বললেন: পশুপতির লেখা দেখেই খুলেছিলাম। তোমাকে আর দেওয়া হয়নি—পকেটেই রাখি; ভুল আর কি!

মৃদু হেসে সুলোচনা দেবী বললেন: দু'খানা চিঠিতেই একই ভুল! যদি শেষের চিঠিখানাও ঠিক সময়ে পেতাম, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই ওঁকে—

উত্তেজিত হয়ে বগলা বললেন: সাধে কি আমি চটে উঠি! ওর চিঠি পড়েইত আসতে মানা করে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। তবুও নির্লজ্জের মত—

গম্ভীর মুখে সুলোচনা বললেন: তুমি ভুল বুঝে মিছিমিছি আবার মাথা গরম করছ। যদি এমন কাজ করেও থাক, অর্থাৎ একদিনের বন্ধু—কতদিন পরে আসছেন জেনেও 'তার' করে যদি বারন করে থাক, নিশ্চয়ই সে 'তার' উনি পাননি। তা'হলে আমাকে বলতেন। হয়ত উনি চলে আসবার পর সেটা গেছে।

উপেক্ষার ভঙ্গিতে বগলাপদ বললেন: থাক্‌গে—ছেড়ে দাও ও-কথা। আমি এখন বুঝছি, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই। হয়েছেও তাই। সব ল্যাটা চুকে গেছে—আর কোন ভয় ভাবনা রইল না দেশের ব্যাপারে।

সুলোচনা দেবী সহসা মুখখানা শক্ত করে বললেন: আমি কিন্তু এর ঠিক উল্টো ভেবেছি।

কি রকম ?

একটা সোমত্ত মেয়েকে সামলে বেড়াচ্ছ—দেশের খবর তার কানে যাতে না আসে। কিন্তু তোমার ভুলের জন্যে, ঐ চিঠি থেকেই দেবী সব কিছু জেনেছে।

চমকিত ভাবে বগলা শুধালেন : বল কি ? দেবী তোমাকে দেবার আগে ও চিঠি পড়েছিল নাকি। জিজ্ঞাসা করেছ ?

শান্ত কণ্ঠে সুলোচনা দেবী বললেন : জিজ্ঞেস করতে হয়নি আমাকে। রাতে ঘুমের ঘোরে দেবীকে গ্রাম সম্পর্কে যে-সব কথা বলতে শুনেছি, তা থেকেই বুঝেছি, চিঠি না পড়লে ও-সব ওর মাথায় ঢুকত না। এখন ঈশ্বর কার দিক দিয়ে মঙ্গল করেছেন, ভেবে দেখ।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে সহসা বগলা গর্জন করে উঠলেন : তাহলে আমিও দেবীকে ডেকে স্পষ্ট করে বলে দেব—দেশের ব্যাপারে যা কিছু জেনেছে, কিছুতেই যেন প্রশ্রয় না দেয়, ও সব বাজে—ভুয়ো।

কিন্তু দেবীকে আর স্পষ্ট করে বলতে হলো না ; দরজার ও-পাশে দাঁড়িয়ে,—অনুচিত হলেও সে কান পেতে সব শুনছিল। তার বাবা জাঁক করে যখন তখন বলে থাকেন, তাঁর মেয়েরা শিক্ষিতা এবং আধুনিকা। তাই সেও এখন থেকে নিজেকে আধুনিকার পর্যায়ে তোলবার জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে—সমস্ত সঙ্কোচ, লজ্জা, ভয় ও আড়ষ্টতাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে।

পরদিন অপরাহ্নের দিকে সুলোচনা দেবী ভিতরের পড়ার ঘরে বসে রাণীকে চিঠি লিখছিলেন। বগলাপদ ডাকঘরের ছাপ দেওয়া খামে ভরা একখানা চিঠি হাতে করে এনেই সুলোচনা দেবীর সামনে তাচ্ছল্যভাবে নিক্ষেপ করে বললেন : তোমার সেই গেঁয়ো পণ্ডিত গাঁয়ে গিয়ে কি রকম কপচেছে পড়ে দেখ।

খামখানা তুলে নিয়ে সুলোচনা দেবী দেখলেন, তাঁরই নামে চিঠি, কাঁচি দিয়ে খামের একটা পাশ কাটা। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন : পড়া হয়ে গেছে আগেই !

নইলে কপচাবার কথা কি হাত-গুণে বলেছি ? পড়াটা হচ্ছে দস্তুর, হ্যাঁ—জানতো, সরকারও সন্দেহভাজনদের চিঠি পড়ে তবে বিলি করতে দেন।

স্বামীর কথা শুনে সুলোচনা দেবীর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কথার জবাব না

ছিঁড়ে চিঠিখানা খুলতে থাকেন। বগলা তিক্ত কণ্ঠে বললেন: কি দরকার ছিল ইতরটাকে খাতির করে উপরে আনিয়ে গুরুর আদরে তোয়াজ করবার। নীচের ঘরে বসালে ত আর এত কাণ্ড ঘটত না। আমরা কোন্ সোসাইটিতে আছি, আভিজাত্য কতখানি, এ-সব তো তুমি বুঝবে না!

স্বামীর এই সব অশিষ্ট কথার কোন উত্তর না দিয়ে সুলোচনা দেবী নীরবেই চিঠিখানা পড়ছিলেন। বগলাপদ অপাঙ্গে স্ত্রীর দিকে একটিবার চেয়ে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে একটা হুঙ্কার তুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চিঠিখানা পড়তে পড়তে পলকের মত একবার তাঁর সুন্দর মুখখানা প্রদীপ্ত হয়েই ক্রমশঃ ম্লান হয়ে এল। পত্রে পশুপতি প্রথমেই মুক্তকণ্ঠে আদর্শ গৃহিণী সুলোচনা দেবীর আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করে, পরে বেদনার সঙ্গে বাল্য বন্ধু ও গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপের প্রিয় সাথী বগলার চাতুরী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 'তার' যোগে তাঁর যাত্রা বন্ধ করবার চেষ্টা এবং পরবর্তী তারে তাঁকে নিরস্ত করবার যে কারণ দেখিয়েছিলেন, সেইটিই পশুপতিকে দারুণ বেদনা দিয়েছে। প্রথম কারণ—'যে বন্ধুদের সাহায্যে বগলা প্রতিষ্ঠাপন্ন, তাঁদেরই কৃতবিদ্য পুত্রদের সঙ্গে দেবী ও রাণীর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।' দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—'যেহেতু, আমার কন্যা দেবী শিক্ষিতা ও আধুনিকা, সেইহেতু বহু পূর্বের একটা মৌখিক কথার উপর গুরুত্ব দিয়ে—পাড়াগাঁয়ের সাধারণ ঘরের টোলে-পড়া এক মাথা-পাগল অমানুষকে স্বেচ্ছাবরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব।' এর পর পশুপতি চিঠিখানির উপসংহারে লিখেছেন: 'ইহা হইতেই সুস্পষ্টভাবে আমাদের উপলব্ধি হইয়াছে যে—আপনাদের উভয় বান্ধবীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই।'

চিঠির শেষ ছত্রটি পড়িবার পর সুলোচনা দেবীও বুঝি ভেঙে পড়লেন। তাঁর মনে হতে থাকে, নিজের বেদনাভরা অন্তরটি বুঝি বাতাসে ভর করে তৎক্ষণাৎ হরগৌরী মন্দিরে সেই উৎসবের দিনটিতে ফিরে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের ঘটনাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে কানে ঝঙ্কার দিচ্ছে সেই পরম দিনের প্রতিশ্রুতি।

খোলা চিঠিখানা হাতে করে অনেকখানি সময় একই ভাবে নীরবে বসে রইলেন সুলোচনা দেবী। এই সময় দেবী এসে পিছন থেকে ডাকল: মা?

স্থণ্ডিভুজের মত খড়মড় করে উঠে বললেন স্থলোচনা দেবী। চিঠিখানা আর গোপন করা হলো না, তাছাড়া এখন এ-চিঠি গোপন করেই বা কি হবে—সবই যখন জেনেছে সে, এখানার কথা জানাতেই বা বাধা কি?

দেবী জিজ্ঞাসা করল: কার চিঠি মা?

শান্ত কণ্ঠে স্থলোচনা দেবী বললেন: তোমার সেই জ্যেঠামণি দেশ থেকে লিখেছেন আমাকে, পড়ে দেখ, তোমাদের কথাও আছে।

এক নিঃশ্বাসেই বুঝি চিঠিখানা পড়ে ফেলল দেবী। তারপর নীরবে খামেভরে মায়ের সামনেই রাখল। স্থলোচনা দেবী লক্ষ্য করলেন, চিঠিখানা পড়ার পর মেয়ের স্থন্দর মুখখানিতে যেন সিঁদুরের মত একটি আভা পড়েছে।

চিঠি পড়ার আগেই দেবীর মুখে উত্তেজনার আভাস পেয়েছিলেন স্থলোচনা দেবী। হয়ত তাঁকে কিছু বলবার জন্তই এভাবে আসে, তারপর চিঠির প্রসঙ্গে সেটা চাপা পড়ে যায়। স্থলোচনা দেবী সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন কি না ভাবছেন, কিন্তু দেবী নিজেই উত্তেজিত স্বরে ব্যাপারটা জানাল: প্রশান্ত বাবু এসেছেন মা, আর—আসা মাত্র পড়ার ঘরে গিয়ে আমাকে একলা দেখে ইতরের মত ইয়ার্কি দিতে আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত অসহ্য হওয়ায়, তার গালে আমি ইয়া জোরে এক থাপ্পড় দিয়ে চলে এসেছি।

স্থলোচনা দেবী শিউরে উঠে বললেন: সে কিরে! তুই থাপড়া মেরেছিস্ প্রশান্তর গালে?

জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেবী বলল: উনি ভেবেছিলেন, আগেকার মতই বুঝি সেই গবেট দেবীই আছি! কিন্তু সে যে দানবী হতে পারে—পয়লা নম্বরেই সেটা টের পেয়েছে।

স্থলোচনা দেবী অবাক হয়ে বলেন: উনি যদি শোনেন, তুই ওকে থাপড়া মেরিছিস্? তাহলে—

দেবী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: সে ভয় নেই মা! শোন তবে বলি, গালে থাপড়া পড়তেই এমন শব্দ হলো যে, বাবা শুনতে পেয়েই, পড়ার ঘরে ছুটে আসেন। আর ঐ অনামুখোটা বাবাকে দেখেই গালে হাত বুলুতে বুলুতে বললে কি জানো—'দেবীকে একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছিলুম স্তার!' বাবা

জিজ্ঞাসা করলেন—'ম্যাজিক?' হতভাগা অমনি টেবিল থেকে খোলা তাসিগুলো খাঁ করে তুলে নিয়েই ফেঁৎে তাসে তাসে পিটে তেমনি একটা আওয়াজ তুলেই বলল: 'তাসের ম্যাজিক!' বাবা তখন কি ভেবে আর কি জন্যে কে জানে, চাপা গলায় বললেন:—'ওঘরে এস, কথা আছে।' কিন্তু আমি বলে রাখছি মা, যে কথাই থাকুক, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এলেই, হাড়ে হাড়ে তখন বুঝবেন বাবু সাহেব—দেবী কি চিজ।

দৃপ্তস্বরে কথাগুলো মাকে শুনিয়ে দিয়েই দেবী দ্রুতপদে চলে গেল। সুলোচনা দেবী নিষ্পলক নয়নে চেয়ে রইলেন। দেহ-মনে—আকারে প্রকারে, চোখে মুখে—ভঙ্গিতে উক্তিতে সেই গোবেচারী ভীরু লাজুক মেয়েটির এই আশ্চর্য পরিবর্তন যেদিন প্রথম তাঁর চোখ দুটোকে চমৎকৃত করে—সেই থেকে দিনে দিনে প্রহরে প্রহরে যেন তার ক্রমোৎকর্ষ লক্ষ্য করছেন তিনি! তাই মনে মনে ইষ্টদেবীকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে প্রণতি জানালেন।

২৫

পড়ার ঘরের প্রকৃত ব্যাপারটি প্রশান্ত চেপে গিয়ে ম্যাজিকের প্রসঙ্গ তুললেও, বগলাপদ তাঁর বাস্তব দৃষ্টিতে প্রকৃত তথ্যটি অনুমান করেছিলেন—প্রাইভেট চেম্বারে সামনাসামনি বসে আলাপের সময়। তিনি লক্ষ্য করেন, প্রশান্তর বাম গণ্ডটি ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং তার উপর দু'তিনটি আঙুলের ছাপও সুস্পষ্ট হচ্ছে। প্রশান্তও যে একটা জ্বালা বোধ করছে, গণ্ডের ঐ অংশে অনবরত তার বাম হাতখানা পৃষ্ট হওয়ায় সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। প্রশান্ত এই দিনই কলকাতায় ফিরেছিল এবং অফিসেই বগলাপদর সঙ্গে তার দেখা হওয়ায়, সেখানেই উভয় পক্ষের প্রাথমিক কথাবার্তার পর্বটি শেষ হয়। নতুন বিজনেসের কথা উঠতেই প্রশান্ত বগলার উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে প্রথম দফাতেই তাঁর সম্মতি আদায় করে নেয়। বাড়িখানা

সংস্কারের জন্ম মালপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে বাইরে যাওয়ায় তার ফিরতে এত বিলম্ব হয়েছে এবং দিন সাতেকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে—কুণ্ঠার সঙ্গে খবরটা দিতেই বগলা তখন রাণীর শান্তিনিকেতনে যাবার কথাটা তুলে বলেন যে, ভালই হয়েছে—এরই মধ্যে রাণীও এসে পড়বে। এ-খবরটা শুনে প্রশান্তকে মুসড়ে পড়তে দেখে বগলা তৎক্ষণাৎ তাঁর আসল সঙ্কল্পটা বলে ফেলেন, তাকে উৎফুল্ল করে তোলবার উদ্দেশ্যে: রাণী এখানে না থাকায় দেবীটা ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, আর জানো ত, মায়ের কাছে কি ভাবে ও আস্কারা পায়! তাই, ওর পাকা দেখাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তোমার আত্মীয় মামারাই আশীর্বাদ করবেন তোমার তরফ থেকে। এ উপলক্ষে আমাদের উৎসবটাই আসছে সপ্তায় হয়ে যাক, পরের হপ্তায় তোমার নতুন বাগান বাড়িতেই তুমি যে উৎসব করবে, ঐ দিনই আমরাও ওখানে তোমাকে আশীর্বাদ করে দিন স্থির করব। হ্যাঁ, আমাদের এ ব্যাপারে এইটিই নতুনত্ব যে,—মেয়ের আশীর্বাদটাই আগে হবে, তার পরে ছেলের। আর দুটো উৎসবেই তোমরা উপস্থিত থাকবে, কেননা—তুমি ত স্থির করেই রেখেছ—বাগানবাড়িতে সবাইকে নিয়ে গিয়ে আনন্দ করবে।

বগলার এহেন সুব্যবস্থায় প্রশান্ত সত্যই উল্লাসে যেন নেচে ওঠে। এত শীঘ্র যে তার অদৃষ্টে দেবী লাভ হবে, সেটা ধারণা করেনি। সে তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বগলার হাত ধরে তিন চারটে ঝাঁকি দিয়ে মনের উল্লাসটা জানিয়ে দেয়। বগলাও তাকে অপরাহ্নের দিকে বাড়িতে যাবার জন্ম নিমন্ত্রণ করে উঠে পড়েন। তার পরেই সেই বিশ্রী কাণ্ড। যাই হোক, বগলার বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, প্রশান্ত কীল খেলে কীল হজম করতে চায়! কিন্তু দেবীর এই স্পর্ধায় বগলা এত রুষ্ট ও বিরক্ত হন যে, তখনি দেবীর সম্বন্ধে প্রশান্তকে যেন 'পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্ণী' দিয়ে ফেললেন তাকে জব্দ করবার অভিপ্রায়ে। অর্থাৎ প্রশান্তকে বললেন: 'দেখ প্রশান্ত, একটা দামী কথা বলছি তোমাকে, সেটা মনে রাখবে।—এই, লড়াই আর প্রণয়, এ দুটোই সমান ভঙ্গ এবং এখানে জয়ী হতে হলে চাই—হিম্মৎ। এর মধ্যে ন্যায় অন্যায় সত্য

ধর্ম বলে কিছু নেই—ছলে বলে কৌশলে, কায়দা করে যে ভাবেই পারি—প্রণয়-পাত্রীকে জয় করা চাই। মারি অরি পারি যে কৌশলে। ইংরিজীতেও আছে—'নথিং বড্ ইন্ ওয়ার য়্যাণ্ড লাভ্'। এই পথে এগিয়ে চল তুমি, আমি তোমাকে পাশ পোর্ট দিলাম—'গো অ্যান্, মাই ব্রেভ বয়!' সঙ্গে সঙ্গে বগলা প্রশান্তর পীঠে ও হাতে নিজের বলিষ্ঠ হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে তার মাথাটাকেও বিগড়ে দিলেন।

গৃহস্বামীর কাছে তাঁর অনূঢ়া কন্যা দেবীকে বাধ্য, আয়ত্ত ও বশীভূত করবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাবার দিনটি থেকেই প্রশান্তর আস্পর্ধা ও অনধিকার অগ্রগতি বাধা মুক্ত হয়। এই সূত্রে একান্তে দেবী ও প্রশান্তর মধ্যে যে-সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, উভয়েই তাতে চমৎকৃত হয়ে পরস্পরকে আরো সুস্পষ্টভাবে চেনবার চেষ্টা করে। এমন কি, এর পর এই বোঝাপড়ার ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত যে প্রত্যক্ষসংগ্রাম বা 'ডাইরেক্ট য়্যাকশন' উভয়কেই অবাক করে দেয়—বিভিন্ন ঘটনাসূত্রে তার কাহিনীগুলি এমনি বিস্ময়াবহ যে, কোনও ভদ্রপরিবারের বয়স্থা কুমারী কন্যাকে পিত্রালয়ে স্থিতিশীলা অবস্থায় উপর্যুপরি এই ধরণের সংঘাতের সংস্পর্শে আসতে যেমন দেখা যায় নি, তেমনি কোনও ভদ্র ঘরের অবিবাহিত তরুণও অসঙ্কোচ-স্পর্ধায় শুদ্ধান্তের কোন কুলকন্যার প্রতি আঘাতের পর আঘাত হেনে এভাবে কু-দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেনি—যেমন এখানে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রশান্ত ভেবেছিল যে, তার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম ধাক্কাতেই দেবীর মত ঠাণ্ডাপ্রকৃতির লাজুক মেয়ের মনোবল ভেঙে পড়বে এবং একদিনেই তাকে জয় করা সহজ হবে। কিন্তু সংঘাত-সূত্রে পরে পরাজিতের মনোভাব নিয়ে সে এই দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে—মাত্র কটা দিনেই সেকালের মনোবৃত্তি-সম্পন্না শান্ত প্রকৃতির সেই শিষ্টা মেয়েটার দেহে ও মনে এমন দুর্বার শক্তি কোথা থেকে এল?

এ সম্পর্কে দেবীর সঙ্গে প্রশান্তর মনোবাদমূলক সংঘর্ষের অপ্রীতিকর বৃত্তান্ত-গুলি শান্তিনিকেতনে রাণীর উদ্দেশে লিখিত দেবীর এক বিশদ পত্রেই প্রকাশ পেল।

২৬

শান্তিনিকেতনে কয় দিন ধরে সাড়ম্বরে বর্ষা উৎসব চলছিল। এদিন শেষ হলো—ক্ষুদ্র একটি নৃত্যনাট্য অভিনয়ের পর। নাটিকাখানি রসোত্তীর্ণ হওয়ায় ছাত্রছাত্রী-মহলে আনন্দের অন্ত নেই। রাণীও অরুণার সঙ্গে উৎসবে যোগ দিয়েছিল।

উৎসবের পর আধুনিকা তরুণীর চটুল রূপ-সজ্জায় সজ্জিতা রাণী বিশ্রাম কক্ষে এসেই একখানি খামে মোড়া পত্র পেল। শিরোনামার হস্তাক্ষর দেখেই বুঝল দেবীর চিঠি। এত মোটা খামে দিদি কি লিখেছে! সেই অবস্থাতেই রাণী চিঠিখানা খুলে পড়তে বসল। দেবী লিখছে :

স্নেহের রাণী, সত্যই আজ দিদির যোগ্যতা নিয়ে তোকে এই চিঠি লিখছি। এতদিন আমি তোর দিদি হলেও চলার পথে অনেক সময় তোর দিকে চেয়েই আমাকে চলতে হয়েছিল। নিজের মনের জোর বা বুদ্ধি শুদ্ধির অভাব বুঝেই পদে পদে তোকেই অনুসরণ করতুম। নিজে কিছুই বুঝতুম না, জানতুম মাকে, তোকে, আর আমাদের পরিচারিকা কুসুমদিকে। তোর বোধ হয় মনে আছে, বাবা মফঃস্বল থেকে যখন আসেন—তাঁকেও প্রথম চিনতে পারি নি। জানবার কৌতূহলও হ'তনা—আরো আগের শৈশবের কথা কেন মনে নেই! তুই পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে লাগলি, আমার মাথায় ও-সব আসত না বলেই পড়া বন্ধ থাকে। মা কিন্তু আমাকে তখন পুরাণের গল্প সব শোনাতেন। ভারি ভাল লাগত। রামায়ন, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, দেবীপুরাণ—এ সবের গল্প। আরো বড় হলুম, নিজেদের বাড়ি হল; সবাই বলত—আমরা বড় লোক হয়েছি। মা কিন্তু আমাকে বোঝাতেন, টাকাকড়ি গাড়ি বাড়ি

থাকলেই বড় হওয়া যায় না, মন মেজাজ যার বড়—সেই বড়লোক। তুই কিন্তু বাবার আদুরে মেয়ে হয়ে ও-বাড়ির মেয়েদের মতন সেজেগুজে হল্লোড় করে বেড়াতিস্—বাবা তাতে আস্কারা দিতেন। আমাকেও বলতেন—তোর মত আধুনিকা সাজতে। কিন্তু মায়ের ওসব ভালো লাগত না বলে, আমাকে নিষেধ করতেন। মায়ের মত সাদাসিধে কাপড় চোপড় আমি পরতুম—ভালোও লাগত আমার। কিন্তু বাবা খিট্ খিট্ করতেন। তখন থেকেই আমি মায়ের কথা-মত চলতে শিখি। পুরাণের গল্প শুনতে শুনতে আমার মাথা আর বুদ্ধি একটু একটু খুলতে থাকে। তখন থেকে মা আমাকে নিজে পড়াতে আরম্ভ করেন। ওদিকে বাবাও তোকে বলেন, আমাকে ইংরেজি পড়াতে। ফলে, দোটানায় পড়ে আমার প্রাণ যায় আর কি! কিন্তু মা তোকেও তখন থেকে একটু একটু করে তাঁর দিকে টানতে থাকেন। তাঁর কথায় সপ্তাহে একটা দিন তুই ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে ডাকা শুরু করলি। মায়ের কাছে মোটামুটি লেখাপড়া যখন শিখে ফেলিছি, তখন বাবার হুকুম হল, প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হবে। তুই ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়িস তখন—নিজেও আমাকে পড়াতিস, তার ওপর ইংরেজির মাস্টার, অঙ্কের মাস্টার, সংস্কৃতের মাস্টার সব বাহাল হলেন। পরীক্ষায় পাসও করলুম। তারপর কলেজের পালা। মা কিছুতেই তোর মতন আমাকে ছেলেদের কলেজে যেতে দিলেন না, মেয়েদের কলেজেই ভর্তি হয়ে পড়তে থাকি, এখন আই-এ পাস করে বি, এ পড়ছি। এদিককার সব কথাই আমার মনে আছে। কিন্তু ক্রমশঃ বুঝতে পারি—খুব ছেলে বেলাকার কথা কিছুই মনে পড়ে না। এই সময় প্রশান্ত বাবুর শুভাগমন হল আমাদের বাড়িতে। আমি কিন্তু তোর মতন তাঁর সঙ্গে মিশতে পারি নি—যাকে বলে, আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব। অথচ তার ইচ্ছা, আমি তার সঙ্গে খুব মিশি। এখানেও মায়ের হুঁশিয়ারি আমাকে তফাতে রাখে। তার পর প্রশান্ত বাবু তাঁর বাগানবাড়ি সাজাতে যান—সেখানে একটা ভোজের আয়োজন করে আমাদেরও নিয়ে যাবেন। এমনি সময় তুই চলে গেলি শান্তিনিকেতনে; আর, এরই পরে আমার জীবনেই বল্, আর চলার পথেই বল্—একটা পরিবর্তন এসে আমাকেও

আগা-গোড়া বদলে দিল। যেন অদ্ভুত একটা আলোর ঝলকানি মাথায় পড়ল, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভিতরে যে অন্ধকার এত কাল জমাট বেঁধে ছিল—সব সরে গেল সুড় সুড় করে।

এর পর-পত্রে দেবী এ-বাড়িতে পশুপতি পণ্ডিতের আসা থেকে সমস্ত ঘটনাগুলির উল্লেখ করে রাণীকে উপলব্ধি করাতে গল্পের মত করে সাজিয়েগুছিয়ে পর পর লিখেছে—কেমন করে প্রতিটি ঘটনা তার অবচেতন মনের দরজাগুলিও খুলে দিয়ে তার আগেকার মনের জড়তা ঘুচিয়ে সেখানে অপরূপ একটা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার প্রবাহ সঞ্চারিত করে, কেমন করে তার শৈশব-সাথী চিত্রের সাধনায় চিত্র এঁকে তারও চিত্তে সাড়া জাগায়: 'এ থেকেই অন্যায়কে ঠেকাবার জন্য নৈতিক শক্তিকে জাগাতে শিখি। এ যে কত বড় শক্তি, তার কিছু কিছু আভাস তোকে দিচ্ছি।'

প্রথম দিন অপরাহ্নে পড়ার ঘরে প্রশান্তর উপস্থিত সূত্রে বাড়াবাড়ি ও অভদ্রতাকে প্রতিহত করবার কথা এখানে উল্লেখ করে দেবী। তার পরেই লিখেছে: কিন্তু ওতে তার শিক্ষা হয় নি দেখে অবাক হই। যেন সে আরও উদ্ধত ও বেপরোয়া। সেদিন খাবার ঘরে প্রশান্ত বাবু বাবার সঙ্গে বসে আছে জেনে মা আমাকেই পাঠালেন পরিবেষণ করতে—নইলে বাবা রেগে অস্থির হবেন। কিন্তু খাবারের ডিস এনে দেখি—বাবা উঠে গেছেন ঘর থেকে। ডিসখানা প্রশান্তর সামনে রাখবামাত্র ইতরটা করলে কি শুনবি? ঝাঁ করে ডিস থেকে কচুরিখানা ডান হাতে তুলে নিয়েই জোর করে আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলে, আর সেই সঙ্গে বাঁ হাতে আমার ঘাড়টা বেড় দিয়ে চেপে ধরলে। ধস্তাধস্তিতে ওর হাত থেকে কচুরিখানা পড়ে গেল, আর হাতের আঙুলটা পড়লো আমার মুখের মধ্যে। তখনি দাঁতে দাঁতে জোরে চেপে ধরতেই কচি ছেলের মত ককিয়ে উঠল সে, তার হাতখানাও খুলে গেল আমার গলা থেকে। আমিও আর এক দফা দাঁতে দাঁতে চাপ দিয়ে ওর আঙুলটাকে মুক্তি দিলাম, দেখলাম আঙুল কেটে রক্ত পড়ছে, আমার মুখ দিয়েও রক্ত গড়াচ্ছে বুঝে আঁচল দিয়ে মুখখানা মুচছি, এমনি সময় মা'ও আর খানকতক কচুরি ও চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ইতরটা আঙুলটা পকেটে ঢুকিয়ে হাতের যন্ত্রনা চেপে মাকে লক্ষ্য করে বলল: দেখুন দেখি

মা, দেবীকেও সাধছি খাবার জন্যে, কিছুতেই কথা রাখছে না! শুনে মা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—'জানো তো বাবা, পুরুষদের সঙ্গে বসে খাওয়ার অভ্যাস ওদের নেই, আর—সেটা উচিতও নয়।' কিন্তু এ থেকেও ঐ নির্লজ্জ বেহায়াটার আক্কেল হয়নি। এর পর হল কি, পড়ার ঘরে বসে লিখছি, এমন সময় চুপি চুপি একবারে পাশে এসেই ঝাঁ করে গলাটা আমার দুহাতে জড়িয়ে ধরল প্রশান্ত। হঠাৎ এ কাণ্ড হতেই প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়ি, সে তখন আমার মুখখানা জোর করে ধরে ওর মুখের কাছে টেনে তুলছে, নাক দুটোর তপ্ত নিশ্বাস আমার মুখখানাকে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ওর মুখখানা আমার মুখে পড়বার মুখেই হাতের কলমটা ওর নাকের মধ্যে দিলুম গুঁজে। তখনি চীৎকার করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। চেয়ে দেখি, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। এত জোরে চেঁচিয়েছিল প্রশান্ত, যে বাবা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে শুধালেন- -'কি ব্যাপার?' কিন্তু নাকের রক্ত দেখেই তাঁর চক্ষুস্থির! তবে প্রশান্তই মিথ্যা কবুল করল, 'পেন দিয়ে নাকটা খুঁটতে গিয়েই এ কাণ্ড বাধিয়েছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ এ বদ অভ্যাসটির নিন্দা করে নাকে আয়োডিন্ দেবার জন্যে তাকে নিয়ে গেলেন। আমি যোড়হাতে ঠাকুরের উদ্দেশে বললুম—'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।' এবার এল বারবার চার বারের পালা।—আমাকেও অগত্যা সংঘাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশলগুলি বই পড়ে শিখতে হয়—বইয়ে ছাপা ছবির সঙ্গে নির্দেশগুলি বন্ধ ঘরে পরীক্ষা করি। আমার অবস্থা যেন সসর্প গৃহে রাত্রিবাসের মত। সেদিন প্রশান্ত চুপি চুপি পড়বার ঘরে আগেই এসে দরজার পরদার আড়ালে এমন ভাবে লুকিয়েছিল, জানতে পারি নি। দরজা পেরিয়ে আমি চেয়ারখানার দিকে যাচ্ছি, এমনি সময় পিছন দিক থেকে আমাকে সবলে জড়িয়ে ধরল—আমার হাত দুখানা পর্যন্ত তার আবেষ্টনে আবদ্ধ। সেই অবস্থায় জয়ের গর্বে শাসালো—'আজ ত আর হাতে কলম নেই যে খোঁচা দেবে - এখন তোমাকে—' এই পর্যন্ত বলেই মাথার খোঁপাটার একাংশ দাঁত দিয়ে চেপে টেনে ধরল। এর উদ্দেশ্যটি বুঝেই আমিও মাথাটার উপর সমস্ত শক্তি দিয়ে উপরের দিকে একটা ঝাঁকুনি দিলুম। আমার মাথার উপর দিয়ে মাথাটি চালিয়ে ইতরটা

তখন মুখের উপর মুখখানা আনতে ক্ষেপে উঠেছে; কিন্তু যেমন আচম্বিতে আমাকে ধরেছিল, তেমনি আচম্বিতে মাথার ধাক্কাটা চিবুকের উপর পড়তেই চোখে তার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ; তাই আমাকে ছেড়ে দিয়েই দু'হাতে মুখখানা চেপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে গালচে পাতা মেঝেয় বসে পড়ে। দুর্ঘটনাটার সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একটা আর্তস্বর কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়েছিল। তাই শুনে, কিম্বা মাথা ঠোকার শব্দ কানে যেতে, বেয়ারা কৈলেস ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে। দাঁতে আঘাত লাগায় প্রশান্তর মুখ দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। কৈলেসকে দেখে সেই অবস্থাতেই প্রশান্ত বলল—'পা-টা স্লিপ করায় টেবিলের কোনাটা দাঁতে লেগেছে—তারই রক্ত, শীগগির এক গ্লাস জল আন, কিন্তু এই নিয়ে গোল করনা যেন।'

এই সব বিশ্রী কাণ্ড শুনে তুই হয়ত বলবি, 'বাবাকে কি মাকে কেন বলিনি ওর কথা—সহ্য করি কেন?' এর জবাব হচ্ছে—বাবা জানেন, প্রশান্তই তাঁর বড় জামাই, কাজেই তার সাত খুন মাপ! আর মা যদি শোনেন, কখনই প্রশান্তকে ক্ষমা করবেন না এটা ঠিক, কিন্তু এই নিয়ে বাবার সঙ্গে হয় ত কথা বন্ধ হবে। তাই আমি কাউকেই বলিনি। তারপর, বাইরের ছেলে প্রশান্ত— সে যদি আমাদের বাড়িতে এসে এ-ভাবে আমাকে অপমান করতে সাহস পায়, অথচ বিপাকে পড়লে আসল ব্যাপারটা চেপে গিয়ে অন্য কথা পাড়ে—নালিশ করে নিজেকে ছোট করতে চায় না, আমিই বা তাহলে কোন মুখে বাপ মা'র কাছে তার ইতরামির কথাগুলো তুলে বিচার চাইতে যাব? আমার বাড়িতে অপরে এসে জোর করে আমাকে জব্দ করতে চাইছে—এ অবস্থায় আমার কি উচিত নয় নিজেই তাকে রীতিমত জব্দ করে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া? আগে হয়ত এ সব চিন্তা আমার ধারণারও বাইরে ছিল। কিন্তু বলেছি ত, আমি এখন আলাদা মানুষ—আপনাকে চিনেছি, আত্মশক্তিকে জাগাবার মন্ত্র পেয়েছি। ঋষিরা বলেছেন, আপনাকে জানার নাম—আত্মানাং বিদ্ধি। আপনাকে জানলেই, নৈতিক শক্তি আপনি এসে দেহ ও মনকে এমন ভাবে শক্ত করে তোলে, মানুষের আঘাত তাকে টলাতে পারে না! যেমন, এমন মানুষও দেখা যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ছাপ পড়েনি তাঁর শিক্ষাজীবনে, অথচ তাঁর

পাণ্ডিত্য বিদ্যা প্রতিভা বিশ্বপণ্ডিতদের বিস্ময়। এরও কারণ—তিনি আপনাকে চিনে 'ধী-শক্তির' ভাণ্ডার আয়ত্ত করেছেন। আমিও ঠাকুরের কৃপায় ঐ ধী-শক্তি পেয়েই প্রশান্তর অসুর শক্তিকেও পদে পদে অপদস্ত করতে পেরেছি।

হাঁ, এখন আসল কথাটাই বলি :—'আসছে রবিবার এ বাড়িতে আমার পাকা দেখার ব্যাপারে এক উৎসব হবে। এর পর তুই ও অরুণা শান্তিনিকেতন থেকে এখানে এলেই প্রশান্তবাবুর বাগান-বাড়িতে আব এক উৎসব বসিয়ে কন্যার পক্ষ থেকে প্রশান্তকে পাকা দেখে আশীর্বাদ করবেন বাবা।

তুইত জানিস, আমাদের মনস্বিনী মা, তাঁর আগের প্রতিশ্রুতির উপর বাবার কাছেও বিপরীত প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। বাবা এখন কালাপাহাড়ের মত উদ্ধত, উদ্দাম। কিন্তু তুই যাকে জানতিস, অতীত ভুলে গিয়ে পড়ে আছে অন্ধকারে, এখন বাবারই ভুলের মাশুল স্বরূপ ঠাকুর তারই চোখে জাগৃতির আলো দিয়েছেন জেলে। সুতরাং এ উৎসবের ফলাফল আত্মবুদ্ধির আলোকে অনুমান কর্। অবিশ্যি প্রথম উৎসবটা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হল কি না, সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ বাবার কাছ থেকেই পাবি। তবে তোকে জানাতে বাধা নেই—উৎসব-সভায় সালঙ্করা সুসজ্জিতা কন্যার স্থলে হাজির হবে একখানি ক্ষুদ্র লিপি, তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা থাকবে সত্যের বাণী—প্রতিশ্রুতি রক্ষার এক স্মরণীয় অবদান। যথা :

পূজনীয় বাবা, সম্প্রতি আপনি আপনার বাল্য-বন্ধু ঋষিকল্প সুধী পশুপতি পণ্ডিত মহাশয়কে এই ভাষায় পত্রাঘাত করেছিলেন—'যে হেতু অধুনা আপনার কন্যা শিক্ষিতা ও আধুনিকা, সুতরাং বহু পূর্বের একটা মৌখিক কথার উপর গুরুত্ব দিয়ে, পাড়াগাঁয়ের একটা আধ-পাগল পাত্রের হাতে তাকে সম্প্রদান করতে পারেন না।' এখন, আপনার সেই বাগ্‌দত্তা কন্যার কথা হচ্ছে—'বহুকাল আগে দুই মহীয়সী মায়ের সেই মৌখিক কথাই পরম প্রতিশ্রুতির আকারে তার অন্তরে সত্যের আলোকপাত করায়, সে এই আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব থেকে বিদায় নিয়ে সেই আধ-পাগল ছেলেটিকেই অসাধারণ জেনে আত্মসমর্পণ করতে চলেছে। যেহেতু, আপনার কন্যা শুধু এ যুগের নয়—যুগে যুগে সমুৎপন্না যথার্থ—আধুনিকা!'

এখন আমি তোকে অনুরোধ করছি রাণী—আমাদের মায়ের কথাই খাঁটি ভেবে বিশ্বাস যদি করিস্—তাঁর কথা পুরোপুরি মেনেছিলুম বলেই আজ আমি জেগে উঠেছি, যদি বুঝে থাকিস্, তাহলে আমার এই জাগরণকেও অসাধারণ ভবে তুইও আমার মতন আধুনিকা হোতে চেষ্টা কর্। এটা যেন মনে থাকে—আধুনিকা শুধু এ-যুগেরই সৃষ্টি নয়, সত্য ত্রেতা দ্বাপরেও যে-সব মেয়ে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ বিধি ও অবৈধ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল—তাঁরাই আদর্শ আধুনিকারূপে আমাদের পথ-প্রদর্শিকা। মনে কর—সাবিত্রী, সুকন্যা, দময়ন্তী, সুভদ্রা, প্রমুখ বিদ্রোহিনী মেয়েদের কথা। ওখানে গিয়ে আমার সেই সাধক শিল্পীকে বলব—তার চিত্তের সাধনায় তোকেও যেন বদলে দেয়।

চিঠিখানা শেষ করেই রাণী চেঁচিয়ে উঠল : অরুণা, অরুণা, শীগগীর আয়!

পাশের ঘরে অরুণা কাপড় চোপড় বদলাচ্ছিল। ছুটে এসে বলল : কি ব্যাপার! হয়েছে কি? কার চিঠি?

রাণী বলল : দিদি লিখেছে চিঠি—পড়্!

অরুণা চিঠিখানা নিয়েই বলল : বাব্বা! চিঠি, না দলিল!

রাণী গম্ভীরমুখে জবাব দিল : দলিলের মতই মনের আইন রে—অর্থাৎ মনস্তত্ব। সে দিদি আর নেই—এখন হয়েছে তার আশ্চর্য পরিবর্তন। আগের জড়তা, লজ্জা, সঙ্কোচ, ভালোমানুষি কাটিয়ে সে হয়েছে—আধুনিকা।

চিঠি থেকে চোখ তুলে অরুণা প্রশ্ন করল : আধুনিকা?

রাণী বলল : হ্যাঁ—সত্যিকার আধুনিকা। দিদির মতে এর অর্থও আলাদা। কিন্তু এখনি আমাদের যেতে হবে অরুণা! এখন বোঝাপড়ার সমস্যাই যে আধুনিকা।

সমাপ্ত